জীবনের ঝরাপাতা

সরলা দেবী চৌধুরানী

১৩৫৭

প্রথম 'রূপা' সংস্করণঃ এক হাজার
আষাঢ়, ১৩৫৭ : জুলাই, ১৯৫০

প্রকাশক
ডি. মেহ্‌রা
রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট : কলকাতা ৭০০ ০১২
সাউথ মালাকা : এলাহাবাদ ২১১ ০০১
১০২ প্রসাদ চেম্বার্স : অপেরা হাউস : বোম্বাই ৪০০ ০০৪
৩৮৩১ পাতৌদি হাউস রোড : দরিয়াগঞ্জ : দিল্লী ১১০ ০০৬

মুদ্রক
মোহন মাখিজানি
রেখা প্রিন্টার্স
৫/৩৩ কীর্তিনগর : নতুন দিল্লী ১১০ ০১৫

মুখবন্ধ

স্বর্গতা সরলা দেবী তাঁর প্রাক-বিবাহ জীবনের আত্মকথা লিখে রেখে গিয়েছিলেন "জীবনের ঝরাপাতা" শিরোনামায়। তাঁর মৃত্যুর পর যখন বইখানা প্রকাশিত হয়, আমার স্বর্গত সুহৃৎ যোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয় তখন সরলা দেবীর বিবাহোত্তর জীবনের এবং গ্রন্থোক্ত ব্যক্তি ও বিষয়ের কিছু সংক্ষিপ্ত পরিচয়ও সংযোজন করে দিয়েছিলেন। সমসাময়িক ইতিহাসের দিক থেকে মূল্যবান, সুলিখিত ও সুপাঠ্য এই স্মৃতিচারণ গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ বহুদিন নিঃশেষিত হয়ে আছে ; সাম্প্রতিক পাঠকের নিকট গ্রন্থটি সেই হেতু একান্ত দুর্লভ। অনেকে হয়তো গ্রন্থটির পরিচয়ও জানেন না।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ গ্রন্থপ্রকাশ প্রতিষ্ঠান "রূপা" এই কারণেই এই দুর্লভ গ্রন্থটির নূতন একটি সংস্করণ প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছেন, এবং আমাকে অনুরোধ করেছেন গ্রন্থটির নবকলেবরের একটি মুখবন্ধ লিখে' দেবার জন্য। তাঁদের এই অনুরোধে আমি ধন্য ও কৃতার্থ বোধ করছি। কিন্তু কিছু সংকোচও যে বোধ করছিনে, এমন নয়। ভাবছি, স্বদেশপ্রাণা, কর্মব্রতচারিণী, জীবনজিজ্ঞাসু, স্বনামধন্যা সরলা দেবী চৌধুরানীর আত্মকথা কি কোনো ভূমিকা, মুখবন্ধ, পরিচিতি ইত্যাদির অপেক্ষা রাখে? সরলা দেবীর জীবনেতিহাস ভারতবর্ষের, বিশেষ করে বঙ্গদেশের, উনিশ শতকের শেষ দুই দশক ও বিশ শতকের প্রথম তিন দশকের ইতিহাসের সঙ্গে বিচিত্র টানাপোড়েনে জড়ানো; সুদীর্ঘ এই অর্দ্ধশতাব্দীর ইতিহাসের প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর জীবনে। এই অর্দ্ধশতাব্দীর ইতিহাস যাঁরা জানতে চান, বুঝতে চান, লিখতে চান তাঁরা কি কেউ পারবেন এই গ্রন্থটিকে অবহেলা বা অবজ্ঞায় একপাশে সরিয়ে রাখতে? এতে তো তাঁরাই ক্ষতিগ্রস্ত হ'বেন। শুধু তথ্যের দিক থেকেই নয়, সরলা দেবীর রচনা সাহিত্যগুণেও সমৃদ্ধ। জীবনী-সাহিত্যের যাঁরা অনুরাগী পাঠক তাঁরা এই রচনায় নূতন সাহিত্যরসেরও আস্বাদ পাবেন।

গ্রন্থটির পুনঃপ্রকাশে ব্যক্তিগতভাবে আমি আনন্দিত বোধ করছি। আশা করি, বাঙ্গালী পাঠকমাত্রই তা' করবেন। "রূপা"র কর্তৃপক্ষ যে গ্রন্থটির পুনঃপ্রকাশের ভার নিয়েছেন, এজন্য তাঁদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

নীহাররঞ্জন রায়

প্রকাশকের নিবেদন

সারা ভারত জুড়ে তখন উচ্চারিত হচ্ছে নব জাগরণের মন্ত্র। সেই কর্ম মহাযজ্ঞে বাঙালী নিয়েছে পৌরোহিত্যের ভার। দেশের মুক্তির জন্য বৈপ্লবিক সংগঠন, নারী জাগরণের কাজ চলেছে এগিয়ে। সভা সমিতি, মিলন মেলায় তখন এসেছে নতুন ভাবনার জোয়ার। সঙ্গীতে বাজছে দেশাত্মবোধের সুর। সেই মহালগ্নে প্রেরণার একটি উজ্জ্বল আলোক শিখার মত দেশবাসীর কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলেন সরলা দেবী চৌধুরানী।

ঋষি বঙ্কিমের উপন্যাস দেবী চৌধুরানীর বৈপ্লবিক ভাবমূর্তিটি যেন সেদিন সার্থক রূপ পরিগ্রহ করেছিল সরলা দেবীর মধ্যে।

ঠাকুরবাড়ীর গৌরবময় ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার ও স্বকীয় স্বাধীন ভাবনার উন্মেষ সরলা দেবীর জীবনকে করেছিল স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত। সঙ্গীতে সাহিত্যে কর্মে ধর্মে নিজেকে এমনভাবে তিনি নিয়োজিত করেছিলেন, যাতে সারা ভারতের প্রজ্ঞাবান মনীষীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল তাঁর প্রতি। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, মহাত্মা গান্ধী, তিলক, লালা লাজপত রায় প্রভৃতি মনীষীদের অন্তরের প্রীতি অভিষিঞ্চিত এই মহীয়সী নারী জীবনের সকল কর্মে নিজেকে বিকশিত করে তুলেছিলেন। শক্তি যখন অন্তরকে আশ্রয় করে তখন নানা কর্মোদ্যোগের মধ্যে তার প্রকাশ ঘটতে থাকে। সরলা দেবীর অফুরন্ত শক্তির প্রকাশ ঘটেছিল তাঁর বহুমুখী কর্ম প্রচেষ্টার মধ্যে। বিপ্লব-সাধনার অন্যতম উদ্গাতা, নবরূপে বীরাষ্টমীর প্রবর্তক, মহিলা শিল্প-মেলার কর্ণধার, খাদি প্রচারে মহাত্মাজীর সহযোগী এই প্রথম ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন কর্মপ্রাণা মহিলা সেদিনের বাঙালী তথা ভারতবাসীর অন্তরে গভীর শ্রদ্ধার আসন লাভ করেছিলেন। জাতীয় জাগরণের যুগে সর্ব কর্মে এমন সার্থক ও সক্রিয় সহযোগিতাদানের উদাহরণ একান্ত বিরল না হলেও সহজলভ্য ছিল না।

আজ যখন দীর্ঘ হতাশাক্লিষ্ট ভারতবাসী নবরূপে দেশগঠনের কাজে কৃতসংকল্প তখন এই কৃতকীর্তি মহিলার পবিত্র কর্মপ্রচেষ্টার সংগে নতুন করে দেশবাসীর পরিচয়-সাধনের উপযোগিতা বার বার আমরা অনুভব করছি।

"জীবনের ঝরাপাতা" সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় ১৩৫১ সনের ২৫শে কার্তিক সংখ্যা থেকে ১৩৫২ সনের ২৬শে জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা পর্যন্ত ধারা-বাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। সুপরিচিত প্রকাশক 'সাহিত্য সংসদ' এটি সর্বপ্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন।

'বিবাহোত্তর জীবন কথা' ও 'গ্রন্থোক্ত ব্যক্তি ও বিষয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয়' অংশ দুটি অধুনা স্বর্গত যোগেশচন্দ্র বাগল দ্বারা সঙ্কলিত হয়ে এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে সন্নিবিষ্ট হয়েছিল। বর্তমান সংস্করণে এই দুটি অংশের অতিরিক্ত স্বর্গতা সরলা দেবীর একটি সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্যও সংযোজিত হল।

সরলা দেবীর আত্মকাহিনী 'জীবনের ঝরাপাতা' গ্রন্থখানির পুনঃপ্রকাশ যদি একটি হৃদয়ের দীপকেও প্রজ্জ্বলিত করতে পারে তাহলে আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

॥ প্রকাশক ॥

ঝরে গেছে, ফুরিয়ে গেছে যা, তাদেরই কতকগুলি কুড়িয়ে বাড়িয়ে জড় করে একখানা মালা গাঁথা—এ হল আমার জীবনস্মৃতি, জীবনকাহিনী। ঝরা হলেও মরা হয়নি সে পাতাগুলি, মানবপ্রাণের সংস্পর্শে চিরপ্রাণবন্ত হয়ে আছে। আমার জীবনের দীর্ঘপথে দিকে দিকে পূর্বে পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণে—প্রভাতে সন্ধ্যায়, সজনে নির্জনে, দুঃখ দহনে, উৎসবে আনন্দে কত ঘটনা ও কত অঘটন ঘটেছে ঝরেছে সরেছে। পর পর যাঁদের সংযোগে মূল্যহীন জীবনের মূল্য, এ জীবনকাহিনীর পর্বে পর্বে তাঁরাই আছেন ফুটে।

একদিন ভাদ্রমাসে—ললিতা সপ্তমী তিথিতে মহর্ষির আর একটি দৌহিত্রীর আবির্ভাব হল বাড়ির সূতিকাগৃহে, বাড়ির ভিতরের তেতালার একটা রোদফাটা কাঠের ঘরে। তার দরুন বিশেষ কোন সাড়া পড়ল না মহলে মহলে। কারো না কারো জন্ম নিত্য ঘটনা এ বিরাট পরিবারে। নৈমিত্তিক আচরণ সকল বাঁধা দস্তুরমত অনুষ্ঠিত হতে থাকল। ব্রাহ্মধর্মের নূতন পদ্ধতিক্রমে "জাতকর্ম" সংস্কার ও উপাসনাদি হল, আবার আট-কৌড়েও হল, ঘরে ঘরে বণ্টিত খইমুড়ি বাতাসাসন্দেশ ও আনন্দ নাড়ুতে ছোট ছেলেমেয়েদের আনন্দধ্বনি নতুন শিশুটিকে স্বাগত করলে।

এদিকে সদ্যোজাত শিশুকে সনাতন সরষে তেলে জবজবে করে রোজ একবার সূতিকাগৃহের বাহিরে আঙ্গিনায় এনে রৌদ্রে রাখা হতে থাকল। যে উদ্দেশ্যে প্রতীচ্যের সৌখীন সাহেবমেমরা বৃহৎ তরণীযোগে সাত-সমুদ্রপারে দেশদেশান্তে উপনীত হয়ে রকমবেরকমের সুগন্ধি মিশ্র-তৈলসিক্ত দেহে sunbath বা রৌদ্রস্নান গ্রহণ করেন—সেই tanning বা ধূসরত্বকত্ব এই অতীব সহজ পন্থায় ভারতীয় শিশুর অনতিবিলম্বে লাভ হল।

সেকালের ধনিগৃহের আর একটি বাঁধা দস্তুর যোড়াসাঁকোয় চলিত ছিল—শিশুরা মাতৃস্তন্যের পরিবর্তে ধাত্রীস্তন্যে পালিত ও পুষ্ট হত। ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র মায়ের কোল-ছাড়া হয়ে তারা এক একটি দুগ্ধদাত্রী দাই ও এক একটি পর্যবেক্ষণকারিণী পরিচারিকার হস্তে ন্যস্ত হত, মায়ের সঙ্গে তাদের আর কোন সম্পর্ক থাকত না। আমারও রইল না।

বাড়ির বাঁধা নিয়মের একটির কিন্তু আমার মায়ের বেলায় ব্যতিক্রম হয়েছিল। তিনি ঘরজামাই-হওয়া স্বামিসহ পিতৃগৃহবাস করেননি। বিবাহের পূর্বে আমার পিতার সর্ত ছিল ঘরজামাই হয়ে শ্বশুরগৃহে থাকবেন না। কৃষ্ণনগরে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করতে যখন যান তখন মাতামহ

দেবেন্দ্রনাথের চোখে ইনি পড়েন। সুপুরুষ, সুশিক্ষিত, নদীয়া জেলার ব্রাহ্মণ জমিদারের পুত্র অথচ কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত উমেশ গুপ্তের সঙ্গগুণে অনেক পুরানো সংস্কার ছিন্ন করা এই ছেলেটিকে দেখে জামাই করার প্রবল ইচ্ছা হয় দাদামশায়ের। বড় মাসিমা সৌদামিনী দেবীর বিবাহ অনেককাল আগে সনাতনী রীতিতেই হয়ে গেছে, কিন্তু মেজ মাসিমা সুকুমারী দেবীর সময় থেকে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা দিয়ে জামাইদের বিবাহমন্ত্র উচ্চারণ করান হত, এবং পূর্বাপর প্রথামত কন্যাসহ জামাইরা শ্বশুর-গৃহেই স্থায়ী বাসিন্দা হতেন। আমার পিতা এই দুটি রীতিই মানতে অস্বীকৃত হলেন। দৃপ্তপুরুষ তিনি বল্লেন—ব্রাহ্মধর্ম ও হিন্দুধর্মে মূলগত কোন ভেদ নেই, নিরাকার বা সাকার ব্রহ্মের উপাসক—দুইই হিন্দু। সুতরাং আলাদা করে ব্রহ্মোপাসক বলে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নেওয়া অনাবশ্যক। দ্বিতীয়ত বিবাহের পর তিনি পত্নীকে স্বগৃহে নিয়ে যাবেন, শ্বশুরগৃহে থাকবেন না। দাদামহাশয় তাঁর এই দুই সর্তই মেনে নিলেন। যদিও মা তাঁর পরম আদরের মেয়ে ছিলেন তবু তাঁকে আলাদা বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার সম্মতি দিলেন। এদিকে আমার পিতৃদেব মহর্ষির কন্যাকে বিবাহ করায় তাঁর পিতা-কর্তৃক ত্যাজ্য হলেন। সে এক বিষম সমস্যা—পিতাপুত্রে দুইজনে সমান জিদ্দি, সমান ক্রোধালু। তাঁদের দেশে "ঘোষালে রাগ" বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। যেমন বীরপুরুষ তাঁরা ডাকাতদের সঙ্গে হাতাহাতি যুদ্ধ করতেন, তেমনি আপোষের রাগারাগিও সহজে মিটত না।

আমার পিতার জ্যেষ্ঠভ্রাতা থাকায় কনিষ্ঠ তাঁকে তাঁর প্রভূত সম্পত্তিশালী জ্যেষ্ঠতাতের দত্তক করে দেওয়া হয়। কিন্তু বালক জানকী-নাথ ছমাসের বেশি সেখানে রইলেন না। দত্তকপুত্র হওয়া অপমানজনক জ্ঞান করে একদিন কাউকে না বলে কয়ে সে গ্রাম থেকে পালিয়ে হেঁটে নিজেদের বাড়ি ফিরে এলেন। সেখানকার উত্তরাধিকার হারালেন। তাঁর দাদার অনপেক্ষিত হঠাৎ মৃত্যুতে জানকীনাথই পিতা জয়চন্দ্র ঘোষালের একমাত্র উত্তরাধিকারী হলেন। কিন্তু পিরালী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যাকে বিবাহ করে সে অধিকারও খোয়ালেন। আমার পিতামহ ক্রোধে ক্ষোভে জর্জরিত হয়ে দুহাতে তাঁর জমিদারী বিষয়সম্পত্তি নষ্ট করতে লাগলেন। যেন কপর্দকও ছেলের হাতে না পড়ে।

এই দুর্জয় ক্রোধ কালক্রমে কিরকমে শমিত হল, পিতাপুত্রে বিসম্বাদ যে কেমন করে মিটে গেল আমরা ছোটরা কিছুই জানি না। আমরা যখন

একটু একটু বড় হচ্ছি আমাদের স্নেহালু পিতামহের মধ্যে মধ্যে আমাদের গৃহে শুভাগমনে আমরা নানা রকমের আনন্দ-রসাস্বাদী হতে লাগলুম শুধু জানি।

বিয়ের পর মা-রা আলাদা বাড়িতে গিয়ে থাকায় আমার প্রায় পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত যোড়াসাঁকোর বাইরেই আমরা ভাইবোনেরা মানুষ হতে লাগলুম। কিন্তু যোড়াসাঁকোর সঙ্গে মাদের সংস্রব পুরোমাত্রাই রইল। এমন একটি দিন যেত না যেদিন হয় মা-বাবা যোড়াসাঁকোয় না যেতেন, কিম্বা যোড়াসাঁকোর লোকেরা আমাদের বাড়ি না আসতেন।

ছমাস বয়সে খুব ঘটা করে আমার অন্নপ্রাশন হল পেনেটির (পানিহাটির) বাগানবাড়িতে। গঙ্গাধারের সে বাগানবাড়ি তখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরেরই সম্পত্তি। সেবার যোড়াসাঁকোর বাড়িশুদ্ধ সকলের সেটা গ্রীষ্মনিবাস হয়। সে বাড়ির বর্তমান স্বত্বাধিকারী মৈমনসিং সেরপুরের জমিদার গোপালদাস চৌধুরী মহাশয়। তিনি ওটি একটি ট্রাস্টের হাতে সমর্পণ করে ওখানে নিজের মাতার নামে "গোবিন্দমোহিনী ভবন" বলে একটি অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছেন। কয়েক বৎসর পূর্বে তার দ্বারোদ্ঘাটন উপলক্ষ্যে নিমন্ত্রিত হয়ে মাতুল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমি এখানে আসি। নিজের স্মৃতিবহির্ভূত অন্নপ্রাশনের অর্ধশতাব্দীরও পরে এই প্রথম আমি জ্ঞানগোচরে আবার এ বাগানে এলুম। কি চমৎকার গঙ্গাধারের বাড়িখানি! কি সুন্দর ঘাট! ঘাটের উপরেই নহবৎখানা। কল্পনায় ছমাসের শিশু আমার লালচেলি পরা কপালে চন্দন মাখা চেহারা চোখে জাগল, কল্পনায় সেদিনকার সানাইয়ের বাঁশীর রব কানে শুনতে পেলুম। কিন্তু মাতুল রবীন্দ্রনাথের কল্পনাগত নয়, স্মৃতিগত ব্যাপার। আজ তাঁর হাত দিয়ে উদ্যোক্তারা যে বাড়ির একপ্রান্তে একটি আম্রবৃক্ষ রোপণ করালেন সেই মনোরম গঙ্গাধারের বাড়িতে তাঁর একাদশ-বর্ষীয় নিজের জীবনের বহু স্মৃতি উদ্বেল হয়ে উঠতে লাগল। কোথায় পড়ে রইল আজকের মেয়েদের আয়োজন, তাদের পড়া মানপত্র, আর তার বাঁধাগতের উত্তর তাঁর! সেই বাগানবাড়ির এক একটা ঘরে বা বাগানের এক একটা দিকে উঁকিঝুঁকি মারতে মারতে বালক নিজেকে যত খুঁজে পেতে থাকলেন সেদিনের ছমাসের যে শিশু-আত্মীয়া আজ পাকাচুল নিয়ে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে—তাঁর মনে ভরে ওঠা সেদিনের সব কথার একমাত্র দরদী শ্রোতা সেই হল।

অন্নপ্রাশনের ঘটনা প্রায় বিস্মৃতি-নিমগ্ন হলেও প্রায় আড়াই বছর মাত্র বয়সের দুটি ঘটনাকে স্মৃতি আমার মনের উপর আজও তুলে ধরে। দুটিতেই এসেছিল ভাবের চমক—একটা আনন্দের আর একটা ভয়ের। শেয়ালদা বৈঠকখানার যে বাড়িতে আমার মা-রা থাকতেন, সে বাড়ির আশেপাশে ফিরিঙ্গিদের বাস। সেখানে থাকতে একটি স্নানের ঘরের নর্দমার সামনে মেঝেতে উপুড় হয়ে নর্দমার ভিতর দিয়ে টেলিস্কোপের মত চোখ চালিয়ে দেখতুম, সামনের বাড়ির উঠানে একটা টিনের টবে সর্বাঙ্গে সাবান মাখান আমার চেয়েও ছোট একটি নগ্ন সাদা শিশু জলের ভিতর হাত-পা ছুঁড়ে কিলবিল করছে। তার এই কিলবিলনি দেখে কি পরম বিস্ময়কর আনন্দ লাভ করতুম বলা যায় না। কিন্তু এই মর্ত্য-জীবনের কোন আনন্দই যেমন অবাধ নয়, সেটাও অবাধ ছিল না। আমার রক্ষী পরিচারিকা আমাকে এইতে নিমগ্ন দেখলেই বকে-ঝকে টেনে হিঁচড়ে সেখান থেকে সরিয়ে আনত।

এই বৈঠকখানার বাড়িতে থাকতে থাকতেই—আরও কয়েক মাসের বড় হওয়া আমার জীবনের আর একটি ঘটনা আজও স্মৃতিনিবদ্ধ হয়ে আছে। মনে পড়ে তখন রোজ বিকেলে মুখ-হাত ধুইয়ে, ফরসা কাপড় পরিয়ে শেয়ালদা স্টেশনের বাহিরে রেললাইনের উপর আমাদের বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হত। তখনকার কালে আদত স্টেশনটি তেমন বড় ছিল না, স্টেশনের বাইরে বড় রাস্তার উপরই কতকগুলো রেল-লাইন পাতা ছিল, shunt-করা খানকতক গাড়ি সারি সারি দাঁড়িয়ে সেখানে বিশ্রাম করত, কখনো কখনো প্রয়োজনমত এদিক-উদিক চলত।

আমাদের দাসীদের সঙ্গে যে দরোয়ান যেত, সে অনেক সময় কিন্তু আমাদের একখানা রেলগাড়ির ভিতরেই বসিয়ে দিত। একদিন দিদি, দাদা ও আমি, তিন ভাইবোনে গাড়িতে বসে আছি, দরোয়ান ও দাসীরা রাস্তার উপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে, এমন সময় হঠাৎ গাড়ি shunt করতে লাগল। দিদি ত বিজ্ঞ আছেনই, দাদাও দিদির সামিল, কিচ্ছু ভীত হলেন না; আমি অজ্ঞের একশেষ, গাড়ি যেমন নড়ে উঠল, আর আমাদের নিয়ে চলে পড়ল, আমার বুকে একটা আকস্মিক ভয়ের ধাক্কা লাগল। একি? গাড়ি চলেছে? কোথায়? কোন্ বাড়ি-ছাড়া নিরুদ্দেশে? ঠিক এমনি নিরুদ্দেশ-ভীতির একটা ভাষাহীন অব্যক্ত ভাব শিশুর মনে স্পন্দিত হয়। আর সকলে আমার ভয় দেখে হাসতে লাগল। দরোয়ান হাসতে হাসতে গাড়িতে হাত রেখে গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকল। দু-মিনিটেই

গাড়ির চলা থেমে গেল, আমার ভয় তখনকার মত নিরস্ত হল; কিন্তু সেটা চিরদিনের জন্য মাথার স্মৃতি-কোটরে দাগ কেটে রইল।

বৈঠকখানা থেকে মা-রা সিমলার বাড়িতে উঠে যান। এখনকার মিনার্ভা থিয়েটারের পাশ দিয়ে একটা গলিতে সে বাড়ি। মনে পড়ে এই বাড়িতে থাকতে বছর চারেক বয়সে একদিন পা ফসকে ছাদের মার্বেল সিঁড়ি দিয়ে গড়াতে গড়াতে একেবারে নীচের তলায় পড়ে আমার সামনের দুটো দাঁত ভেঙে রক্তারক্তি হয়, হাতে-পায়েও চোট লাগে। কান্নাকাটি বেশি করতে সাহস পাইনি—আমার রক্ষিণী দাসীর ভয়ে। সে জোর গলায় প্রতিপন্ন করলে দোষ তার অমনোযোগের নয়, আমার অসাবধানতার। "আহা", "উহু" ত পেলুমই না কারো, উল্টে লাঞ্ছনার শেষ রইল না। দিদি খুব বিজ্ঞের মত শোনাতে লাগলেন চিরকাল ফোকলা হয়ে থাকব, লোকের সামনে বেরবার যোগ্য থাকব না। আমার ও দিদিদের দাসীবৃন্দ মিলিত হয়ে তার চেয়েও বড় রকম একটা সুনির্দিষ্ট বিভীষিকা খাড়া করলে—"বর এসে ফোকলা দাঁত দেখে ফিরে যাবে।" মা কোন সাড়াশব্দই করলেন না। বাবামশায় নীচে নেমে আর্নিকাদি লাগিয়ে দিলেন।

বলেছি ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকেই মায়ের সঙ্গে আমাদের আর সাক্ষাৎ-সম্পর্ক থাকত না। তিনি আমাদের অগম্য রাণীর মত দূরে দূরে থাকতেন। দাসীর কোলই আমাদের মায়ের কোল হত। মায়ের আদর কি তা জানিনে, মা কখনো চুমু খাননি, গায়ে হাত বোলাননি। মাসিদের ধাতেও এসব ছিল না। শুনেছি কর্তা-দিদিমার কাছ থেকেই তাঁরা এই ঔদাসীন্য উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন। বড়মানুষের মেয়েদের এই ছিল বনেদী পেট্রিশিয়ন চাল। গরীবের ঘর থেকে আসা ভাজেরা কিন্তু তাদের প্লিবিয়ানের হৃদয় সঙ্গে করে আনতেন—ছেলেমেয়ের সঙ্গে তাঁদের ব্যবহার আর এক রকমের দেখতুম। সে কথা পরে বলব।

পড়ে গিয়ে দাঁতভাঙার ব্যাপারে মা আতুপুতু না করার কোন অভাব অনুভব করলুম না, কারণ সেটা একেবারেই অপ্রত্যাশিত। কিন্তু আর এক দিনের বড় রকম এক ব্যাপারে মনের ভিতর দিয়ে বিচারের একটা খটকা বাজল বুকে। শিশুরা শুধু হাসে-কাঁদে না. তাদের মাথায় বিচার-অবিচার বোধের খেলাও অন্তঃসলিলভাবে অনেক সকাল সকালই চলতে আরম্ভ করে।

আমাদের সব ছোট বোন ঊর্মিলা তখনও জন্মায়নি। দিদি হিরন্ময়ী. দাদা জ্যোৎস্নানাথ ও আমি—এই তিনজনে আছি তখন। দিদি আমাদের

স্ব-নিয়োজিত সর্দার। একদিন সর্দারি করে বললেন,—"তোর চুল বড্ড বড় হয়েছে, আয় ছেঁটে দিই।" কোথা থেকে একটা বড় কাঁচি সংগ্রহ করে কচ্ কচ্ করে আমার মাথা-ভরা কোঁকড়া চুল কাটতে লাগলেন। উবরো-খুবরো যেমন-তেমন করে, মাথা প্রায় ন্যাড়া করে কাটা হল চুল। মা-বাবা বাড়ি ছিলেন না, ফিরে এসে যেমনি আমার চুলের দিকে দৃষ্টি পড়ল, বাবামশায় ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন—মা-ও তাতে অমত করলেন না—"আজ থেকে সাত দিন পর্যন্ত তোমার বাইরে যাওয়া বা বাড়িতে কেউ এলে তাদের সামনে বেরন বন্ধ। এমনি চুল নিয়ে লোকের সামনে বেরলে লোকে হাসবে।"

শিশু আমি লোকের হাসির মর্মান্তিকতা কিছু বুঝলুম না, কিন্তু একটি অবিচারবোধের তীব্র শেল আমার বুকের তলায় তলায় বিঁধতে লাগল। দিদি, যিনি আমার চুল বিশ্রী করে কাটলেন, আসল দোষ করলেন যিনি, তাঁর কোন শাস্তিই হল না। তিনি আগেকারই মত দিব্যি ফিটফাট হয়ে বুক ফুলিয়ে রোজ বিকেলে দাসীদের হাত ধরে হাওয়া খেতে যেতে লাগলেন। দাদাও তাঁর সঙ্গী হলেন—যদিও মা-বাবার বিনা অনুমতিতে দাদাও তাঁর চুলটা দিদির হাতে সমর্পণ করেছিলেন, দাদারও মাথায় দিদির হাতের কারিগরির নমুনা কিছু কিছু পরিদৃশ্যমান হয়েছিল। কিন্তু ব্যাটাছেলে তিনি, তাঁর চুল একটু-আধটু খারাপ দেখানতে আসে যায় না বোধ হয়, মেয়েদেরই শ্রীশালীনতার দিকে দৃষ্টি রাখার দরকার। তাই তিনজনের দোষের জন্য আমি একাই দায়ী হলুম। সাত দিন ধরে একলাটি ছাদের উপর একটা ঘরে আবদ্ধ রইলুম—একলা একলা সঙ্গিহীন, কাঁদিকাটি, কি করি সে আমিই জানি।

দিদি প্রথম সন্তান বলে মা-বাবার আদুরে মেয়ে, দাদা প্রথম পুত্র বলে আদুরে, আমি আর একটি অধিকন্তু অপ্রার্থিত মেয়ে মাত্র। তাই বৈদিক ঋষিকুমার শুনঃশেফের মত আমার জীবনের পৃষ্ঠপটে (back-ground-এ) একটা অনাদরের পরদা টানা। সে পরদাখানা উঠে গেল অল্পে অল্পে শুনঃশেফেরই মত বাইরের সংস্পর্শে।

শাসনে শাসনেই গড়ে উঠেছি আমি, আদরে স্নেহে নয়। কিন্তু সিমলে বাড়ির সঙ্গে শাসনাতিরিক্ত একটি সরস স্মৃতিও জড়িত আছে—সেটি আমাদের পিতামহ জয়চন্দ্র ঘোষালের স্মৃতি। বলেছি তিনি একজন প্রবল-প্রতাপী পল্লী-জমিদার। যখনই আসতেন আমাদের বাড়িতে, পাড়াগাঁয়ের একটা নূতন হাওয়া নিয়ে আসতেন। তাঁর আগমন

কদমা-কাসন্দী-কুলকুটো ও বিশেষ চাষের খাজা কাঁঠালের সহাগমন সূচনা করত, শীতকাল হলে খেজুর-গুড়ের পাটালী ও কলসী কলসী গুড়। তাঁর আগমন তৈলসিক্ত দেহে জলচৌকিতে বসে ঘরের বাইরে খোলা হাওয়ায় স্নানের দৃশ্য খুলে দিত। তাঁর আগমন বাড়ি ছেড়ে ডাকাতদের সম্মুখীন হয়ে যুদ্ধ-কাহিনীতে কর্ণকুহর ভরিয়ে দিত। তাঁর আগমন পুলিসের পেয়াদাকে ফাঁকি দিয়ে খাল-বিল থেকে খাল-বিলান্তরে নৌকাযোগে বিচরণ করে তাঁর জমিদারীতে খুনের মকদ্দমায় কাছারীতে হাজির হওয়ার সমন এড়ানর বিপুল বিস্ময়কর কথায় শরীরকে রোমাঞ্চিত করত। কিন্তু যেখানে সবচেয়ে বেশি তিনি আমাকে স্পর্শ করতেন, সেটি হচ্ছে আমার মর্মকোণের একটি শুষ্ক নিভৃতে। তাঁর স্নেহবিগলিত "দিদি, দিদি" সম্ভাষণটি সেইখানে ছুঁয়ে মধু-প্লাবন করত। বাড়ির মরু হাওয়ায় যেন একটি অদ্ভুত ওয়েসিসের সমাচার আনত। এখন চিরে চিরে বিশ্লেষণ করে বর্ণনা করছি। তখন কোনই বিশ্লেষণীশক্তি ছিল না—শুধু একটি স্নিগ্ধতার সরস অনুভূতি মাত্র ছিল।

আর একজন আত্মীয় আসতেন ঐ বাড়িতে—তিনি আমাদের পিসেমশায়—পরেশনাথ মুখোপাধ্যায়, ত্রিপুরা স্টেটের ডাক্তার। তাঁর সঙ্গে মধ্যে মধ্যে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায় আসতেন। এঁরই সঙ্গে দিদি হিরন্ময়ীর পরে বিবাহ হয়।

একবার পিসেমশায় আসার পর, আমি পাঁচ বছরে পড়তে আমার হাতেখড়ি হল। বাড়িতেই একজন পণ্ডিত থাকতেন, পিসেমশায়দের দেশেরই লোক, সতীশ মুখুয্যে। তাঁর কাছে একদিনেই আমার বর্ণ-পরিচয়ের প্রথমভাগ শেষ হয়ে গেল। পিসেমশায়ের হুঁকোর খোলের ভিতর পয়সা ও দু-আনা চার-আনার রেজকি ভরা থাকত। তার থেকে আমাদের প্রায়ই কিছু না কিছু বিতরণ করতেন। তাঁর এক-একগাছি পাকা চুল তুলে দিয়ে দিদি-দাদা দু-চার আনা পুরস্কার প্রায়ই অর্জন করতেন। আমার সে বিষয়ে পটুতা ছিল না, তাই সে রকম কিছু রোজগার হত না। কিন্তু সকাল থেকে বিকেলের মধ্যে প্রথমভাগখানা আদ্যোপান্ত শেষ করার খবরটা রটায় সেদিন পিসেমশায়ের হুঁকোর খোল খালি হয়ে আমার হাত বেশ খানিকটা ভরল। অর্থাৎ আমার দাসীর ভাগ্যি সেদিন খুলে গেল—এতদিন দিদি-দাদার দাসীরাই ভাগ্যিমন্ত হত। কেননা, আমাদের রোজগার আমাদের কোন কাজে লাগত না, তাদের দ্বারা বাজেয়াপ্ত হয়ে তাদেরই ভোগে আসত।

॥ দুই ॥

সিমলে বাড়িতে বাড়ির ভিতরের দিকের সিঁড়ি উঠেই মায়ের শোবার ঘর। ঘরে এক প্রকাণ্ড পালঙ্ক। সেই পালঙ্কের উপর যোড়াসাঁকো থেকে সমাগত মাসি, মামী ও দিদিদের প্রায় নিত্যই মধ্যাহ্ন থেকে গড়ান পার্টি জমত। তাসখেলার অবসরে কাঁচা সরষে তেল মাখা টাটকা মুড়ি, ফুলুরি ও বেগুনির রসাস্বাদন, বর্ষা হলে সাঁৎলাভাজি—এই ছিল পার্টির মূল প্রোগ্রাম। প্রোগ্রামে কোন কোন দিন একটু বৈচিত্র্য ঢোকান হত গানে বা মায়ের রচিত কবিতা আবৃত্তিতে। আমরা তিনটি ভাইবোন ঘুরে-ফিরে সেখানে ফস করে এক-একবার হাজির হতুম—যদি একমুঠো মুড়ি বা এক-আধটা ফুলুরি ভুলে আমাদের মুখে কেউ পুরে দেয়। কিন্তু আমরা তাঁদের গ্রাহ্যের মধ্যেই বড় একটা আসতুম না, বেশিক্ষণ দাঁড়াবার হুকুমও ছিল না, চকিতেই সরে পড়তে হত। বড়দের মজলিসে ছোটদের দখল দেওয়া নিয়মবহির্ভূত ছিল।

এই পালঙ্ক সম্মিলনী দেখে আমার মনে মনে একটা ধারণা বসে গিয়েছিল পালঙ্কই হল প্রত্যেক মায়ের স্বাভাবিক বসবার জায়গা, মায়েরা কখনো মাটিতে বসে না। আমাদের দাসীরা যখন তাদের দেশে তাদের মায়ের কথা বলত, আমি কল্পনার চক্ষে দেখতুম, মেমারি গ্রামে বা বঁইচিতে বা গুপ্তিপাড়ায় তাদের মায়েরাও এই রকম বৃহৎ পালঙ্কে পা ছড়িয়ে বসে আছে। মা বলতে আমারও যেমন মা, ওদেরও তেমনি মা। রূপকথার রাজকন্যা বা তাদের রাজরাণী মায়ের ত কথাই নেই।

গরীব দুঃখী সব মাকেই পালঙ্কে জোর করে বসানর উদ্ভ্রান্ত কল্পনা ছেড়ে দিলেও আমাদের দেশের গৃহিণীদের জীবনযাত্রায় পালঙ্ক যে সামাজিক অন্তরঙ্গতা সাধক একটা মস্ত গৃহসজ্জা সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বাড়িতে মেয়েদের মজলিস ভাল করে জমকায়ই না সবাই মিলে এক খাটে না বসলে। শুধু বাঙলা দেশে নয়, পশ্চিমে ও উত্তর-পশ্চিমে ভারতের সর্বত্রই এই। কোথাও বাল্প পালং, কোথাও খাট, কোথাও খাটিয়া, কোথাও গদি সতরঞ্চিপাতা বৃহৎ তক্তপোষ, কোথাও ঢালা ফরাস বিছানা—জিনিস একই। ছাড়া ছাড়া আলাদা চেয়ারে বসে প্রাচ্যের তৃপ্তি হয় না, একসঙ্গে, কাছাকাছি একটা আসনে বসলে তবে মন ভরে।

সিমলে বাড়ির পর্ব এইখানে শেষ হল। এখানে থাকতেই

বাবামহাশয়ের বিলেত যাওয়া স্থির হয়ে গিয়েছিল। তাঁর যাবার কিছু পূর্বে থেকে আমরা সে বাড়ি ছেড়ে যোড়াসাঁকোয় এলুম। যে যোড়াসাঁকো আমার জন্মভূমি তারই অন্তর্ভূত হলুম এবার। যোড়াসাঁকো একেবারে ওতপ্রোতভাবে আমার জীবনকে জড়িয়ে নিলে।

যোড়াসাঁকো বলতে কি বোঝায়—আমার মনে ও সাধারণের মনে? একটা বাড়ি শুধু? ইঁট কাঠ জান্‌লা দরজা ছাদে উঠানে গড়া একটা প্রকাণ্ড ইমারত মাত্র, না তাদেরও ভিতর একটি স্বাতন্ত্র্যবান একটি নিজস্ববান সত্তা? অচেতনবৎ তাদের ভিতর চেতনার একটি সূত্রধারা বয় নাকি? তারা চেয়ে থাকে নাকি যে সব শিশুরা এর মাটিতে জন্মায়, খেলা করে, বেড়ে ওঠে, তাদের ত্রিকালজ্ঞ হয়ে তাদের দিকে? দু-তিন পুরুষানুক্রমে এ বাড়ি থেকে যে সব নরনারী সারা দেশে তাঁদের ম্যাগ্নেটিজম্ বিকীর্ণ করে অস্তমিত হয়েছেন তাঁদের প্রতি? সেই ম্যাগ্নে-টিজমের কিছু না কিছু আঁচ-লাগা-গায়ে যে সব শিশুরা এর প্রকোষ্ঠে বাস করেছিল, দালানে চত্বরে খেলা করে বেড়িয়েছিল তাদের প্রতি? দশের উপর দেশের উপর ভাবের ও কর্মের নেতৃত্বে এ বাড়ির যাঁরা জগতে ধন্যার্হ হয়েছেন তাঁদের স্মৃতিতে ধন্যার্হতা বোধ নেই কি এ বাড়ির? সঙ্গে সঙ্গে যাদের এই বাড়ির প্রতি অমর্যাদায় বাড়ি নগণ্য হয়ে গেল তাদের প্রতি করুণ দৃষ্টি নেই কি এই গৃহের গৃহ-দেবতার?

হায় সে যোড়াসাঁকোর বাড়ি! সেদিনকার সে ভাবের তরঙ্গোদ্বেলিত, কর্মের গতি-হিল্লোলিত, নিশিদিন সঙ্গীত-মুখরিত যোড়াসাঁকো—আর আজকের মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বংশের প্রায় সম্পর্কশূন্য এই পরিত্যক্ত, পায়রাবিষ্ঠামলিন শূন্যপুরী। আগে যারা এ বাড়ির অঙ্গাঙ্গী ছিল তাদের মধ্যে কেউ যদি ফিরে এসে আজ বাড়ির আপাদমস্তকে তাকিয়ে অশ্রুভরা-আঁখি হয়ে দাঁড়ায়—বাড়িও কি তার দিকে তাকিয়ে তার চোখের জলে জল মেলায় না? হায় সেদিনকার সে বাড়ি—আর আজকেকার এই কখানা ইঁটকাঠ! এরাই বা আর কতদিন খাড়া থাকবে?

আমি যখন প্রায় পাঁচ বছর বয়স থেকে জন্মপুরীতে ফিরে এসে তার হাওয়ায় মানুষ হতে লাগলুম, তখন সে পুরী জমজম গমগম করছে। প্রতি মহলে মহলে ঘরে ঘরে লোক। কর্তাদাদা মহাশয়ের ছেলেমেয়ে, জামাই-বউ, নাতি-নাত্নী, দাসদাসীতে বাড়ি ভরা। সে বাড়ির রান্নাঘরে দশ-বারজন বামুন ঠাকুর ভোর থেকে রান্না চড়ায়। সে প্রকাণ্ড রান্নাঘরের দুপাশে দুভাগ করা মেঝেতে পরিষ্কার কাপড় পেতে ভাত

ঢালা হয়, সে ভাত স্তূপাকার হয়ে প্রায় কড়িকাঠ স্পর্শ করে। তারই পরিমাণে ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করে দিনে সেই ভাতব্যঞ্জন ও রাত্রে লুচি-তরকারী—লোক গুণে গুণে পাথরের থালাবাটিতে সাজিয়ে মহলে মহলে ঘরে ঘরে দিয়ে আসে বামুনেরা।

এ বাড়ির একটা প্রথা উল্লেখযোগ্য এখানে। যেমন যেমন একটি নতুন শিশুর আবির্ভাব হয়, অমনি অন্নপ্রাশনের পর থেকে তার জন্যে একসেট নতুন জয়পুরী সাদা পাথরের থালাবাটি ও গেলাসের অবতারণা হয়। সাদা পাথরের বাসন দাসীদের হাতে ভাঙতে ভাঙতে নিঃশেষ হলে ক্রমে মুঙ্গেরের কালো পাথরের সেট তার স্থান পূরণ করে। আমরা তাতেই খেতে অভ্যস্ত। পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে কাঁসা পিতলের বাসনের মর্যাদা জানিনে, সে শুধু সরকার বামুন ঝি চাকরদের ব্যবহার্য বলে জানি। মহর্ষির নাত্নীদের কেউ কেউ শ্বশুর গৃহবাসের পূর্বে তার ব্যবহারে রপ্ত হননি। কাঁচের বাসনের চলন ছিল না তখন। চায়ের পেয়ালা পর্যন্ত ছিল না, কারণ চা খাওয়া ছিল না। আমাদের দুধের বরাদ্দ ছিল। প্রত্যেক বালক-বালিকার জন্য দাসীদের জিম্মে করা এক একটি রূপার বাটি থাকত—তাতে করে দুধের ঘর থেকে দুধ এনে ছেলেদের দেওয়া হত। দুধের ঘর ও রান্নাঘর আলাদা।

ঘরে ঘরে বামুন ঠাকুরেরা যে খাবার দিয়ে যেত সেটা হল সরকারী রান্নাঘরের যোগান, এর উপরে প্রতি মহলে তোলা উনুনে গিন্নীদের নিজের নিজের রুচি ও স্বামীর ফরমাস অনুযায়ী বেসরকারী বিশিষ্ট রান্না আলাদা করে হত। সরকারী ও বেসরকারী রান্নায় আকাশ-পাতাল তফাৎ থাকত। বড় হয়ে ছাত্রদের মেসের দাল-মাছের বর্ণনা শুনে আমাদের ছেলেবেলাকার রান্নাঘর থেকে আসা দাল-ঝোলের কথা মনে পড়ত।

ভাঁড়ার

বাড়ির উত্তরে অনেকখানি খোলা জায়গা ছিল—সেটা হল গোলা-বাড়ি। অর্থাৎ সেখানে ধান, দাল প্রভৃতি শস্যরাজি সঞ্চিত থাকত। ঘি, তেল, নুন, চিনির ভাঁড়ার বারবাড়িতে অন্যত্র, তাও সরকারদের হাতে। তারাই প্রয়োজনমত এসব জিনিস বামুনদের বের করে দিত। বাড়ির ভিতরে গিন্নীদের হাতে ছিল শুধু তরকারী ও ফল মিষ্টির ভাঁড়ার।

সকাল বেলায় ৭টার সময় ঘণ্টা বাজে দালানে উপাসনায় যাওয়ার জন্য। বউঝিয়েরা বিবাহের সময় অর্জিত স্ব স্ব চেলি পরে সেখানে যান। নাত্নীরা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দাদামশায়ের কাছ থেকে একখানি করে যে চেলি উপহার পায়, তাই পরে তাদের দালানে যেতে হয়। সেই হল নাত্নীদের দীক্ষার চিহ্ন। বিনা চেলিপরা খুব ছোট মেয়েরাও দালানে যেতে পারে কিন্তু যেতে বাধ্য নয়। নাতিরা উপনয়ন না হলে দালানে বসার অধিকারী হয় না। অনধিকারে তারাও গিয়ে ব্রহ্মসঙ্গীত শুনতে পারে ও শোনে। বিষ্ণু হলেন তখনকার গায়ক।

দাদামহাশয় বাড়ি থাকলে উপাসনা ও উপদেশ খুব জমে। নয়ত বাঁধাগতের মত হয়। সেখান থেকে এসে, যে যার ঘরে গিয়ে পট্টবস্ত্রখানি খুলে তুলে রেখে সাদাসিধে কাপড় পরে ভাঁড়ার ঘরে আসেন।

মামী-মাসিদের প্রাতঃকালীন ভাঁড়ার ঘরের বৈঠকটি বেশ জমে। উপরেই ভাঁড়ার ঘর—তাঁরা সেখানে বসে সবাই মিলে তরকারী কোটেন। দাসীরা মাছ কোটে নীচে রান্নাঘরের কাছে।

এই তরকারী কোটার আসরে বড় মাসিমা, সেজ মাসিমা ও ছোট মাসিমা, বড় মামী, নতুন মামী ও ন-মামী এবং সরোজা দিদি (বড় মামার বিবাহিতা জ্যেষ্ঠা কন্যা[১]) ও সুশীলা দিদি (সেজ মাসিমার জ্যেষ্ঠা কন্যা[২]) —এই কজনের নিত্য উপস্থিতি দেখতে পেতুম। দিদিও যেতেন। আমার মা কখনো আসতেন না।

পূজার মন্দিরে যেমন দুটি প্রকোষ্ঠ থাকে, একটি বহিঃপ্রকোষ্ঠ যেখানে সকলে যায়, একটি অন্তঃপ্রকোষ্ঠ যার ভিতর কেবল পুরোহিত ঢোকেন, মাসিদের ভাঁড়ারেও তেমনি দুটি ভাগ ছিল। বহির্ভাগে যেখানে তরকারী সাজান, বানান ও বণ্টন করা হত সেখানে সবাই এসে বসতেন, কাজ করুন আর নাই করুন। অন্তর্ভাগে শুধু বড় মাসিমা প্রবেশ করতেন। আমরা ছোটরাও বাইরে বড়দের কোল ঘেঁষে এসে বসে পড়তুম, সিমলে বাড়িতে মা-র মজলিসের মত এখানে আমাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ নয়, এখানে আকৃষ্টচিত্তে বড়দের কার্যকলাপ দেখতুম ও তাঁদের গল্পগুজব শুনতুম। ওদিকে অন্তঃপ্রকোষ্ঠে প্রবেশপরায়ণা বড় মাসিমার দিকেও আমাদের চোখ থাকত। সেখানে থাকের পর থাকে ভাঁড়ের পর ভাঁড়ে

---

(১) মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের পত্নী।

(২) ঢাকার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের ভ্রাতা লাহোরের Tribune-এর প্রথম সম্পাদক শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পত্নী।

নানারকম চর্ব্যচোষ্য লুকান থাকত। এক একদিন এক একটি কিছু বের করে এনে—আমসত্ত্ব, তিলকুটা, আনন্দনাড়ু, সুজির নাড়ু, সন্দেশ—বা যা হয় কিছু—আমাদের হাতে একটু একটু করে দিয়ে বড় মাসিমা আমাদের সবার হৃদয় কেড়ে নিতেন। তাঁর আজীবনের মটো ছিল—

"কারেও কোরো না বঞ্চিৎ
সবারে দিও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ॥"

তাই সবারই প্রিয় ছিলেন তিনি।

কর্তাদাদামশায় বাড়ি থাকলে তাঁর জন্যে দুটি একটি বিশেষ রান্না শুক্ত মাসিদের হাতে এই ভাঁড়ার ঘরের বহিঃপ্রকোষ্ঠেই হত। সেজ মাসিমা প্রসিদ্ধ সুপাচিকা ছিলেন।

মাসিমারাই ঘরকন্নার কাজে নিযুক্ত থাকতেন। মা নিজের মহলে নিজের লেখা-পড়া বই রচনার কাজে সদা রত থাকতেন। দৈবাৎ কখনো কোন উৎসবাদি উপলক্ষে ছাড়া এদিকে নামতেনও না।

বাইরের তেতালা

মায়ের মহল ছিল বাইরের তেতালার অর্ধেকটায়। তাঁর ছেলেমেয়ে—আমাদের আস্তানা ছিল তাঁর সীমানার অনেক দূরে বাড়ির ভিতরের তেতালায়। সেখানে সম্পূর্ণভাবে দাসীদের অভিভাবকতায় থাকতুম আমরা।

বাইরের তেতালার অর্ধেকটায় থাকতেন মা, অর্ধেকটায় থাকতেন নতুন মামা নতুন মামী। সেই সমস্তটা পরে রবিমামার অংশ হয়ে আজীবন তাঁরই থেকে, জীবনান্তে তাঁর উইল অনুসারে বিশ্বভারতীর হয়ে গেছে। জীবনের সায়াহ্নে কর্তাদাদামশায়ও এইখানে ছিলেন। তাঁর মহাপ্রয়াণ এই বাইরের তেতালার একটি ঘরেই হয়। তার অনেক পূর্বে রবীন্দ্রনাথের বহুস্তুতা একজন এই বাইরের তেতালাতেই প্রাণবায়ু-বিমুক্তা হন—সে অভিমানিনী নতুন মামী। সেজমামা হেমেন্দ্রনাথের দেহান্তও তৎপূর্বে এরই একটি ঘরে হয়। রবীন্দ্রনাথের পাঁচটি ছেলে-মেয়েরই জন্ম হয়েছে এখানে। তার মধ্যে দুটিমাত্র এখন—রথী ও মীরা বোলপুরে শান্তিনিকেতনেই থাকেন। তিনটি নেই।

এই সবায়ের স্মৃতিজড়িত সব ঘরগুলিই এখন দিনরাত অর্গলবদ্ধ, মানবলীলার সম্পর্কশূন্য, মূক। কত আনন্দ নিরাশা, কত ভয় উদ্বেগ,

কত মানাভিমানের তরঙ্গ এই ঘরগুলির দেওয়ালে আবদ্ধ আছে। দেওয়াল ফেটে তারা কোনদিন কেঁদে বেরতে চায় না কি? কথা কইতে চায় না কি?

মায়ের সঙ্গে আমাদের কোন সাক্ষাৎ সংযোগ ছিল না। কিন্তু বিকেলে বাড়ির অন্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বাইরের তেতালার ছাদে খেলা করতে যাওয়া আমাদের নিত্যকৃত্য ছিল—সেই সময় দূর থেকে মা আমাদের চোখে ভাসতেন—অগম্য দেবী-প্রতিমার মত।

তিনি যে আমাদের আপনার মত করে ব্যবহার করতেন না, কাছে ডাকতেন না, আদর করতেন না, তার দরুন কিন্তু আমরা তখন মোটেই অসুখী ছিলুম না। সিমলের অল্পপরিসরের স্বতন্ত্র বাড়িতে যেখানে পিতামাতার সঙ্গে স্থানগত দূরত্বটা সামান্যই ছিল—সেখানে বরঞ্চ অসুখী হবার বেশী সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু যোড়াসাঁকোতে দিকদেশের অতিবেশী ব্যবধান মায়ের সঙ্গে সন্তানের মানসিক ব্যবধানটা ঢেকে দিত। ঈশ্বর ও জীবের লীলার মধ্যে প্রকৃতির একটা মধ্যবর্তিতা যেমন থাকে, মানুষ হাসে কাঁদে উঠে বসে ঈশ্বরের নির্দেশে যন্ত্রচালিত পুতুলের মত কিন্তু যন্ত্রপরিচালনার আসল কাজটি সমর্পিত থাকে মানুষের নিজের অন্তঃপ্রকৃতি বা ভগবানের পাটরাণী জাগতিক বহিঃপ্রকৃতির উপর; তেমনি আমাদের পিতামাতার ইচ্ছার দ্বারা আমাদের মূল জীবনপদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত ছিল বটে, কিন্তু তার আসল খেলানটা চলেছিল যোড়াসাঁকোর বাড়ির প্রাকৃতিক অবস্থা, স্থানগত বিরাটত্ব, মাস্টার পণ্ডিত, দাসদাসী ও সে বাড়ির অন্যান্য ছেলেমেয়েদের সংসর্গ। এদের সঙ্গে চলাফেরা, মেলামেশা, খেলাধূলা আড়ি ও ভাবের দোলার দোলনে আমরা মা-বাবার সম্পর্ক-শূন্যতার বোধে ক্লিষ্ট হতাম না। মায়ের আদরে অভিমানে তুলতুলে হইনি, নিজের প্রতি অনুকম্পায় কাতর-হৃদয় হইনি, নিজেটাকে ভুলেই শক্ত-সমর্থমনা হয়ে মানুষ হয়েছি।

যোড়াসাঁকোর অন্যান্য ছেলেমেয়েদের থেকে আমাদের জীবনযাত্রায় দুটি বড় রকমের পার্থক্য ছিল। তাঁদেরও ঝি-চাকরেরা তাঁদের পরিচর্যা করত, কিন্তু আমরা একেবারে তাদেরই হাতে সমর্পিত ছিলুম। স্থানগত অতিব্যবধানবশত ইচ্ছা হলেও মায়ের পক্ষে সম্ভব ছিল না আমাদের দেখাশুনা করার। তাঁর মহল প্রায় আর এক পাড়ায় ছিল। তাই আমাদের তিন ভাইবোনদের প্রত্যেকরই এক একটি স্বতন্ত্র পরিচারিকা ছিল। তারা স্ব স্ব বুদ্ধির অনুসারে নিজের কর্তব্য ভালভাবেই পালন করত। যে যার

নিজের ভারার্পিত শিশুর দিকে টানত, ভাল খাবারটুকু যোগাড় করে তাকে দেবার চেষ্টা করত। তাদের নাওয়া ধোয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা সব দিকে দৃষ্টি রাখত। কিন্তু দাসীদের স্বাভাবিক প্রকৃতির বৈষম্য অনুসারে ছেলেদের প্রতি ব্যবহারে কোমলতা বা কঠোরতার তারতম্য হত। আমার গোড়ায় মানুষ করা যাদু দাই এখানে ছিল না। সে ছিল দেখতে সুন্দর আর কোমল-চিত্ত। আমায় খুব ভালবাসত,—যোড়াসাঁকোতে আমার টানে মাঝে মাঝে আসত। হাতে ঠোঙ্গায় ভরা কিছু না কিছু খাবার আর মুখে মিষ্টি আদর ও চুমু। কিন্তু তাতে যোড়াসাঁকোর ভাইবোনদের ঠাট্টার জ্বালায় যাদু দাইকে দূর থেকে দেখলে লজ্জায় পালাবার পথ পেতুম না। যোড়াসাঁকোয় এসে আমি যার হাতে পড়লুম, তার নাম মঙ্গলা। অতি কৃষ্ণবর্ণা হিন্দুস্থানী, জাতিতে গোয়ালা। আমায় যত্ন করত, কিন্তু কথায় কথায় মেরে মেরে চামড়া লাল করে দিতেও ছাড়ত না।

বাড়িভিতর এই ব্যাপার। বাইরে পড়বার ঘরে সতীশ পণ্ডিতমশায়ের হাতে মার খাওয়া আর একটা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা ছিল। এ বাড়ির আর কোনো ছেলেমেয়ের আমাদের মত গৃহ-টিউটর ছিল না, শুধু আমাদেরই ছিল। তিনি চব্বিশ ঘণ্টাই বাড়িতে থাকতেন, এখানেই খেতেন দেতেন শুতেন। বাড়িভিতরের অঞ্চলে আমার অভিভাবিকা দাসী, বাইরের অঞ্চলে অভিভাবক মাস্টার—দুইই প্রহারমূর্তি। মঙ্গলা দাসীর ছিল হাতের মার, সতীশ পণ্ডিতের ছিল রুলের মার। বাড়ির ভিতরে খেলতে খেলতে মামাতো মাসতুতো ভাইবোনদের কারো সঙ্গে ঝগড়া হলে তাঁরা শাসাতেন—"অ্যাঁ! মঙ্গলাকে বলে দেব।" বাইরে হলে বলতেন—"আচ্ছা! দাঁড়াও! সতীশ পণ্ডিতকে বলে দিচ্ছি।" এই দুই "বলে দেওয়ার" আগুনের মধ্যে নিজেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চলতে হত সাত বছরের বালিকাকে।

॥ তিন ॥

বাইরে আমাদের পড়ার ঘরের পাশেই ছিল বড়মামা দ্বিজেন্দ্রনাথের ছেলে-মেয়ের পড়ার ঘর। সেখানে পড়তেন নীতুদাদা, সুধীদাদা ও ঊষাদিদি

এবং শেষে তাঁর কনিষ্ঠ ছেলে কৃতী। ও'দের মাস্টারমশায় ছিলেন "স্যর্"—মেট্রপলিটনের হেডমাস্টার ব্রজবাবু। অতি সরস, অতি সহাস্য, অতি মজাড়ে লোক। তাঁর কোনোই শাসন ছিল না, বরঞ্চ অহেতুক পুরস্কার ছিল। তাঁর শাসনপ্রবৃত্তি মেট্রপলিটনের ছাত্রদের উপর দিয়েই নিঃশেষিত হত। তাদের কাছ থেকে শাস্তিস্বরূপ বাজেয়াপ্ত করা ছুরি, রঙীন পেন্সিল প্রভৃতি কিছু না কিছু পকেট থেকে ফস্ করে বাড়ির পড়ুয়াদের দেখিয়ে ও দিয়ে তিনি তাদের আনন্দে আনন্দ পেতেন। মাঝে মাঝে আমাদের পড়ার ঘরে এসে এই মাস্টারমশাই আমাদের পণ্ডিতমশায়ের সঙ্গে ভদ্রতার বিনিময় করতেন, তখন আমরাও পড়াশুনা থেকে খানিকক্ষণের জন্যে ছুটি পেতুম, আর পেন্সিল বা পকেট-ছুরির ভাগও পেতুম। একদিন পণ্ডিতমশায় আমাকে ও দাদাকে কোণে দাঁড়ানর বদলে শাস্তি দিলেন পড়ার টেবিলের তলায় গিয়ে গুটিসুটি মেরে বসতে। আর হুকুম করলেন—"আজ ব্রজবাবু যখন আসবেন, আমার সঙ্গে গল্পসল্প করবেন, তখন তোমরা ঐখান থেকে তার পায়ে চিমটি কাটবে, তাঁর খুব আমোদ হবে।" একে শাস্তি পাওয়ার লজ্জা তার উপর সেটা নিজে জাহির করা বেহায়াপনার দ্বারা—এই শাস্তির উপর শাস্তি; এই রকম নির্লজ্জ ব্যবহারশীল হতে হওয়া—এইটে ভয়ানক বাজল। পণ্ডিতমশায় মধ্যে মধ্যে আমাদের শুনিয়ে শুনিয়ে গল্প করতেন সেকালের পাঠশালায় গুরুমশায়দের উর্বর মাথায় কত রকমের রোমাঞ্চকর শাস্তির উদ্ভাবনা হত। সে সবের তুলনায় আমরা যে-সব শাস্তি পাচ্ছি, এ ত কিছুই নয়। তাঁর রুলের স্পর্শ তো ফুলের স্পর্শবৎ।

এ-বাড়ির আর এক ঘরেও ছেলেমেয়েরা কড়া শাসনে পালিত হয়েছেন, সে কিন্তু তাঁদের স্বয়ং বাপমায়ের—ঝি মাস্টারের নয়। সেজমামা হেমেন্দ্রনাথের কন্যা প্রতিভাদিদি ও তাঁর ভাইবোনেরা পড়াশুনা ও ও সঙ্গীত অভ্যাসের নিয়মনিগড়ে একেবারে বদ্ধ থাকতেন। নিয়ম থেকে একটু বিচ্যুত হলে সেজমামার হাতে উত্তম-মধ্যম পেতেন। বাড়ির অন্যান্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মেলামেশার তাঁদের সময় হত না, জীবনের প্রথম দিকটায় প্রবৃত্তিও ছিল না। তাঁদের মহলের কবাট কি ভিতরের, কি বাইরের—অর্গলবদ্ধই থাকত, অবাধ গতিবিধি ছিল না কারো। যত বড় হতে লাগলেন এক-একজনের কবাট খুলতে লাগল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দুই-একজন কুনো রইলেন। আশুতোষ চৌধুরীর সঙ্গে প্রতিভাদিদির বিবাহের সূত্রে তাঁদের মহলের মনের ঘর সব প্রথম খুলল।

প্রতিভাদিদিরা সাত বোন। তাঁদের কারো সঙ্গে বাড়ির আর কোনো সমবয়সী ভাইবোনের ঘনিষ্ঠতা ছিল না। তিনটি মেয়ে আমরা সঙ্গিনী ছিলাম, সেজ মাসিমার দ্বিতীয় কন্যা সুপ্রভা দিদি, বড়মামার কনিষ্ঠা কন্যা ঊষা দিদি ও আমি। বিকেলে হল-ঘরের বাইরে বারান্দায় ছেলের দলের সঙ্গে অনেক সময় খেলায় যোগ হত আমাদের। সে দলে ছিলেন বড়মামার দুই ছেলে নীতুদাদা ও সুধীদাদা, আমার দাদা জ্যোৎস্নানাথ ও বিমানমামা —মাদের মামাতো ভাই। নীতুদাদা ছিলেন দলের কাপ্তেন। একটা বাঁধা গালাগালির ছড়া ছিল তাঁর — "ইস্টুপিড-গাধা-ড্যাম-শুয়োর-পাজি-রাস্কেল-ফুল।" তাড়াতাড়ি গড়গড়িয়ে সবগুলো একসঙ্গে একটা কথার মত বলতে হবে। আহা, সে অপরূপ কথার বিন্যাস—কর্ণে কি মধু ঢেলে দিত! জিভ কেমন লেলিহান হত তার উচ্চারণের জন্যে! একটা গোল লোহার চাকা পিটিয়ে বারান্দায় চালাতে চালাতে রোজই এক-আধবার এটা আবৃত্তি করতেন দাদারা। খেলতে খেলতে কারো সঙ্গে ঝগড়া হলে বা চাকাখানার উপর কোন কারণে রাগ হলেই এ গালির বর্ষাপাত হত। সুপ্রভাদিদি ও ঊষাদিদিও নির্বিবাদে এই ছড়াটি মধ্যে মধ্যে কাজে লাগাতেন। কিন্তু আমি যদি কোন দিন এটিকে জিহ্বানিঃসরণ করতুম, অমনি দাদা-দিদিরা সকলে মিলে আক্রোশ করতেন—"অ্যাঁ! গালাগালি দেওয়া হচ্ছে! দাঁড়াও বলে দিচ্ছি সতীশ পণ্ডিতকে।"

সতীশ পণ্ডিত শুধু আমাদের মাস্টার ছিলেন না, তিনি ছিলেন অভিভাবক। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দুধ খেয়েই বাইরে পড়ার ঘরে তাঁর কাছে আসতে হত। দাসীদের যদি বা ফাঁকি দেওয়া যেত, তাঁকে ফাঁকি দেবার যো নেই। বাড়ির ভিতরের hurdleটা পেরিয়ে আবার বাইরে আর একটা hurdle-এর সম্মুখীন হতে হত। তিনি প্রথমেই আমাদের দাঁত দেখতেন ভাল করে মাজা হয়েছে কি না। যদি পাস হতুম রক্ষে—নয়ত রুলের বাড়ির মার, কিম্বা অন্য শাস্তি।

ইস্কুলে ভর্তি হবার পূর্ব থেকেই যত দিন যেতে লাগল, আমাদের উপর পড়াশুনার চাপ বেশি করে পড়তে থাকল। স্কুলে যাতায়াত আরম্ভের পর স্কুল থেকে ফিরেই আর খেলাধুলার তত সময় হত না। আমরা বাড়ি ফিরতে না ফিরতে সংস্কৃতের জন্যে বাইরে পড়ার ঘরে শশী পণ্ডিতমশায় এসে বসে থাকতেন। সংস্কৃত পড়তে ভালই লাগত, কারণ তখনো ব্যাকরণের নীরসতায় ঢোকান হয়নি—'ঋজুপাঠে'র গল্পগুলি

শুধু সাহিত্য হিসেবে পড়িয়ে যাওয়া হত। শশী পণ্ডিত যেতে না যেতে কবাটের বাইরে গান ও সেতারের মাস্টার ভীমবাবুর মুখসূর্য উদীয়মান হত। সতীশ পণ্ডিত তাঁকে গৃহমধ্যে অভ্যর্থনা করে ডেকে নিতেন। সতীশবাবুর পর্যবেক্ষকতায়ই আমাদের সব শিক্ষা চলত।

গান শেখার হাতেখড়ি হয় আমাদের অব্জবাবুর কাছে, বিষ্ণুবাবুর পরে যিনি ব্রাহ্মসমাজের গায়ক হয়েছিলেন। অব্জবাবু তাল ও মাত্রা শেখানর জন্যে একটা কৌশল অবলম্বন করেন। একটা কালো বোর্ডে এই রকম ধরনের আঁক কেটে—সা^{I} রা^{II} মা^{I} রা^{III} আমাদের বুঝিয়ে দেন যে, সুরের পর যটা দাঁড়ি থাকবে, সুরটা মুখে গেয়ে পরে দাঁড়ির বদলে হাতে ততগুলি তালি দিতে হবে। দিদি দাদার একটু দেরি হল জিনিসটা ধরতে। আমি কি জানি কেমন সৌভাগ্যবলে তাঁদের আগেই সুরগুলো চটপট ঠিকঠাক গেয়ে, তালিগুলো হাতে ঠিকঠিক দিয়ে ফেললুম। অব্জবাবু ভারি খুশি হলেন। মার কাছে আমার ভাল রিপোর্ট গেল। রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের স্কুল থেকে আগত ভীমবাবুও আমায় ভাল মার্ক দিতে থাকলেন। খবরটা মায়ের কাছে পোঁছাল। সেই পর্যন্ত আমার প্রতি মায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ হল। এর মানে নয় যে, হৃদয় দিয়ে তাঁর হৃদয়ে বেশি ঘুড়লুম। শুধু শিক্ষা সম্বন্ধে কোন কোন বিষয়ে তাঁর সাক্ষাৎ পরিদর্শকতার গণ্ডির ভিতর এলুম। একটি পিয়ানো বাজনা বাইরের তেতালায় মায়েরই বসবার ঘরে থাকত। শুধু আমাকে শেখানর জন্যে একজন পিয়ানো শিক্ষয়িত্রী মেম হপ্তায় দুদিন করে নিযুক্ত হলেন। মায়ের ঘরে গিয়েই শিখতুম। মেম যতক্ষণ শেখাতেন বেশ লাগত, কিন্তু মা একটা কঠিন নিয়ম করলেন যে, শেখান জিনিসটা রোজ এক ঘণ্টা করে তাঁর ঘরে বসে প্র্যাকটিস করতে হবে—সেইটে বড় নীরস বোধ হতে লাগল। বাজিয়ে বাজিয়ে আঙুল ব্যথা হয়ে যায়, মন শ্রান্ত হয়ে যায়, ঘণ্টা আর শেষ হয় না। এই বিপদে সুপ্রভাদিদি এলেন আমায় বিপদ থেকে উদ্ধারকর্ত্রী হয়ে।

সুপ্রভাদিদি এ বাড়ির মধ্যে একটি ব্যক্তিত্বশালিনী কন্যা। সেজ মাসিমার ছেলেমেয়েরা পড়াশুনার বেশি ধার ধারতেন না। সেকালের 'চারুপাঠে'র উপরে আর উঠেছিলেন কি না সন্দেহ। কিন্তু জাগতিক অনেক বিষয়ে সুপ্রভাদির অশিক্ষিত পাণ্ডিত্য ও অভাবনীয় অভিজ্ঞতা। সর্বনীচের তলার বামুন ও দাসী মহল থেকে আরম্ভ করে সর্বোচ্চতলার বড়দের মহলে কি ঘটছে না ঘটছে, সে সবের খবর তিনি রাখেন। সারা

দিনরাত ধরে চরকির মত ঘুরছেন একবার নীচে একবার ওপরে। এ'র পিতা—আমাদের সেজ মেসোমশায়—যদুনাথ মুখোপাধ্যায়ের মত ইনি রঙ্গরসে ভরা। হাসিয়ে হাসিয়ে কথা কইতে, সভা জমকাতে ইনি অদ্বিতীয়। সুকুমার হালদারের সঙ্গে বিবাহের পর ডেপুটিগৃহিণী হয়ে মহকুমায় এ'র অন্দরে মেয়েদের একটি খাস এজলাস বসত। মজলিসের সদস্যাদের সঙ্গদোষে বা সঙ্গগুণে তথাকথিত অপৌত্তলিক ব্রাহ্মমন্ত্র-দীক্ষিতা মেয়ে হয়েও তিনি সে দীক্ষার বন্ধন ছিন্ন করে পৌত্তলিক গুরুর কাছে মন্ত্রগ্রহণ করলেন, শিবপ্রতিমার পূজারত হলেন। বড় মাসিমার জ্যেষ্ঠা কন্যা ইরুদিদিও কাশীতে শ্বশুরগৃহে নিত্য শিবদুর্গার সেবাপরায়ণা ছিলেন; কারণ, তাঁর বিবাহ হয়েছিল সেই রকম ঘরে—কাশীর নিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের পুত্র নিত্যরঞ্জন বাবুর সঙ্গে—যাঁদের নিজ বাড়িতেই শিবমন্দির ছিল। ইরুদিদিকে তাঁরা ষোল-সতের বৎসর আর মায়ের কাছে মাতুলালয়ে পাঠাননি। অত বছর পরে ইরুদিদি যেদিন প্রথম আবার যোড়াসাঁকোয় পা ফেললেন, সেদিনটি সকলেরই একটি স্মরণীয় দিন—আমাদের ছোটদেরও। সুপ্রভাদিদির বিবাহ হয়েছিল ব্রাহ্মমতে ব্রাহ্মমতাবলম্বী রাখালদাস হালদারের পুত্র ব্রাহ্ম সুকুমার হালদারের সঙ্গে। তৎসত্ত্বেও সুপ্রভাদিদি নিজের স্বাধীন অভিরুচির অনুসরণ করলেন। কিন্তু যোড়াসাঁকোয় মাতুলালয়ে আনাগোনা সমান বজায় রাখলেন—এ বাড়ির সংস্কার ভঙ্গ করেছেন বলে তিলমাত্র অপ্রতিভ হলেন না।

এহেন সুপ্রভাদিদি ছেলেবেলায় ছিলেন আমাদের নেত্রী। নিজের মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ-সমর তাঁর প্রায়ই বাধত। তিনি আমাকে পরামর্শ দিলেন—"অতক্ষণ ধরে প্র্যাকটিস করতে যদি না ভাল লাগে, দরকার কি করবার?" "না করে উপায় ত নেই!" "আছে বৈকি। ঐ সময়ে ঘড়ির কাঁটাটা রোজ একবার করে এগিয়ে দিলেই হল।" আমি শুনে ভয় পেয়ে গেলুম। বল্লুম, "আমি পারব না।" তিনি বল্লেন—"কুছ্ পরোয়া নেই—আমি করে দেব।"

একদিন আমার প্র্যাকটিসের সময় মা যখন গৃহান্তরে আছেন, সুপ্রভাদিদি একটা চেয়ারের উপর চড়ে ঘড়ির কাঁটা মিনিট কুড়ি এগিয়ে দিয়েই নিজে সরে পড়লেন।

খানিক বাদে এ ঘরে এসে ঘড়ির দিকে চেয়ে মা যখন দেখলেন ঘণ্টা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, তাঁর কেমন সন্দেহ হল। চৌকিতে চড়লেও আমার

হাত ঘড়িতে নাগাল পাবে না তা অনুমান করলেন। সুপ্রভাদিদিকে খানিক আগে এ অঞ্চলে উসখুস করতে দেখেছেন, বুঝে নিলেন এ তাঁরই কীর্তি। তবু দিদির মেয়েকে বকাঝকার অধিকার তাঁর নেই, আর প্রকৃত দোষী ত আমি—তাঁর নিজের মেয়েই; সুতরাং শাস্তি আমারই প্রাপ্য। তাই আমাকে একটি চড় মেরে শাস্তি দিতে কৃতসংকল্প হলেন। কিন্তু ঘরে তখন অন্য লোকেরাও এসেছেন। কারো সামনে চড় তোলাটা অশোভনতা বলে মা তাঁদের সরে যেতে অনুরোধ করে একটি কোমল চপেটাঘাত আমার গালে স্পর্শ করালেন।

মঙ্গলা দাসীর বিরাশী সিক্কার ওজনের চড় ও মায়ের এই চড়ে কত তফাৎ! লোকের সামনে রাগ করায়, ছেলেপিলেকে মারায় আত্মমর্যাদার হানি হয়—এই যে সৌকুমার্য মা সেদিন প্রকটিত করলেন, পরজীবনে তাঁর অনেকানেক সুকুমার ব্যবহারের তা অগ্রপরিচয়।

পরোপকারী সুপ্রভাদিদির চেষ্টা কিন্তু নিষ্ফল হল না। সেদিন থেকে আমার প্র্যাকটিসের সময় এক ঘণ্টা হতে আধ ঘণ্টায় নেমে গেল।

বলেছি, উত্তরোত্তর আমাদের উপর লেখাপড়ার চাপ বেশি করে পড়তে লাগল। স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর সন্ধ্যাবেলায় গানবাজনার মাস্টার ভীমবাবু চলে গেলেই খাস হোম-টিউটরের কাছে ইস্কুলের পড়া তৈরি আরম্ভ হত। রাত ৯টা পর্যন্ত তিনজনকে পালা করে পড়ান চলত। দেউড়িতে ঢং ঢং করে ৯টার ঘণ্টা বাজলে আমাদের ছুটি দেওয়া হত। ঘুমে চোখ ঢুলঢুল করে বাড়ির ভিতরে নিজেদের ঘরে দাসীদের কাছে খেতে-শুতে আসতুম।

সেই সময় সেজমামার বাইরের ঘরটার পাশ দিয়ে আসতে গা ছম্‌ছম্‌ করত। তিনি নাকি যখন একবার ডাক্তারি পড়তেন, সেই ঘরটায় মড়া কাটতেন, তাই ঘরে ভূত ভরা। সুপ্রভাদিদি সব-জানতা, সব ভয়ের প্রতিকারও তাঁর জানা বিদ্যের মধ্যে। তিনি আমাদের গুরু হয়ে শেখালেন 'রাম' 'রাম' বল্লে ভূতের ভয় কেটে যায়, আর একটু লোহা গায়ে রাখলেও ভূত একেবারে পালায়। দিদি তখন খোঁপা বাঁধতে আরম্ভ করেছেন, মাথায় লোহার কাঁটা থাকে, সুতরাং তাঁর নিজের গায়েই অস্ত্র রয়েছে। আমি নিরস্ত্র, টুপ্‌ করে পার হয়ে বাড়ির ভিতরের মোহনায় খড়খড়িঘরে ঢুকে হাঁফ ছেড়ে বাঁচতুম। দাদা নির্ভীক, ভূতের ভয় ছিল না তাঁর।

নিজেদের ঘরে এসে খেয়েই যে তৎক্ষণাৎ ঘুমুতে যেতুম সব সময় তা নয়। সেজমাসিমাদের 'দশ-পঁচিশ' ও 'তাসে'র আড্ডা জমত ঐ সময়।

প্রায়ই একবার করে সেখানে ঢু মেরে, তাঁদের খেলা দেখে দেখে খেলা শিখতুম, দু-একহাত তাঁদের সঙ্গে খেলতুমও। এই ছিল night-club সেকালের মেয়েদের যতক্ষণ না তাঁদের স্বামীরা বাড়ির ভিতরে না আসতেন। এই clubএ গিয়ে গিয়ে দশ-পঁচিশ ও তাসের বিন্তি খেলায় পারদর্শী হয়ে উঠেছিলুম—এক এক সময় মাসিদেরও হারিয়ে দিতুম। কিন্তু তদূর্ধ্বে উঠতে পারি নি—গ্রাবুর ছক্কা পাঞ্জা আমার পক্ষে রহস্য-লোকই রয়ে গেল। গ্রাবুটা একালের ব্রিজের অগ্রদূত। এ দুয়েতেই আমার কোন দক্ষতা হল না কোনকালে। এতে যতটা মাথা খেলাতে হয়, ততটার অবসর এবং রুচিও হয়নি আমার—না ছেলেবেলায় না বড় হয়ে।

বাড়ির ছেলেমেয়েদের মধ্যে বড়মামার ছোট মেয়ে ঊষাদিদির সঙ্গে আমার সবচেয়ে বেশি ভাব। যোড়াসাঁকোর ছেলেমেয়েদের এক একটা group ছিল। আমাদের সাথী ছেলেদের মধ্যে নীতুদাদা, সুধীদাদা, বলুদাদা ও দাদা একদল এবং মেয়েদের মধ্যে সুশীলাদি ও দিদি একদল এবং তার চেয়ে আর একটি ছোট দলে ছিলুম সুপ্রভাদিদি, ঊষাদিদি ও আমি। সুপ্রভাদিদি আসলে সব দলেই ভুক্ত ছিলেন—তাই ঊষাদিদি ও আমি বেশি বন্ধু ছিলুম। ভয়ানক ভালবাসতুম তাঁকে। তিনি সুপ্রভা-দিদির মত জীবন্ততায় ভরা নয়, অতি ঠান্ডা, সরল, সাদাসিদে। শিশুর ভালবাসা যে বড়দের মতই প্রগাঢ় হতে পারে তা বড়রা অনুমান করতে পারে না। ঊষাদিদির দাসী ছিল শঙ্করী—আমার যেমন মঙ্গলা। শঙ্করী খুব রূপকথা জানত। যখনই মঙ্গলার হাতছাড়া হয়ে পালিয়ে আসতে পারতুম ঊষাদিদিদের ঘরে গিয়ে তাঁদের প্রকাণ্ড তক্তপোষের বিছানায় মশারির ভিতর ঢুকে জড়াজড়ি করে শুয়ে শঙ্করীর রূপকথা শুনতুম। খুব ভোরে উঠে দুজনে গলা ধরাধরি করে বাড়ির ভিতরের বাগানে গিয়ে শিউলিফুল কুড়িয়ে আনতুম। শুকিয়ে গেলে তার বোঁটা জলে সিদ্ধ করে কাপড় ছোপান হত। সুপ্রভাদিদি ও ঊষাদিদি পরতেন শাড়ি—আমার পরিধান তখনও ইজের জামা। কাপড় রঙাবার জন্যে আর একটি জিনিসও পাওয়া যেত কখনো কখনো বাগানে—নটকানে। কিন্তু তাতে বড়রা দখল জমিয়ে রাখতেন—আমাদের তোলা প্রায় নিষিদ্ধ ছিল। সুন্দর হালকা নটকানে রঙের শাড়ি তাঁদের প্রায়ই অপরাহ্নের সাজ হত। বাগানে আমরা দল না বেঁধে যেতুম না, একা একা যেতে ভয় করত, সুপ্রভাদিদি দলপতি হয়ে আমাদের নিয়ে যেতেন। পাঁচিলের ওধারে সিংহীবাগান—পাছে সেখান থেকে কোন চোর পাঁচিল টপকে লাফিয়ে পড়ে সেই ভয়।

একবার নাকি তাই হয়েছিল, আমাদের সংবাদদাতা সুপ্রভাদিদির জ্ঞাপিত এই সংবাদ।

ছুটির দিন ঊষাদিদির লুচি আলুভাজির সঙ্গে আমার লুচিগুড় মিশিয়ে পরস্পরের মুখে তুলে দিয়ে খেতে পরম তৃপ্তিলাভ হত দুজনের। সাত-আট বছরের বালিকাদের পরস্পরের প্রতি টানটা একটা বড় বিস্ফুটে ভাষায় একদিন ব্যক্ত হল। কথাটার ওজন না বুঝে ভাবে গদগদ হয়ে একদিন বল্লুম—তোমার মা-বাবা যখন থাকবেন না তোমাকে আর তোমাদের ঘরে গিয়ে শুতে হবে না, সারা দিনরাতই আমাদের কাছে থাকতে পারবে, কখ্খনও আমাদের ছাড়াছাড়ি হবে না।

কথাটা ঊষাদিদির বড়বোন সরোজাদিদির কানে উঠল। উঠতেই চারিদিকে রটে গেল—"কি সর্বনেশে কথা! কি দুষ্টু মেয়ে! এমন কথা মুখে আনে।" যে কথাটা নিছক ভালবাসার একটা চরম ব্যঞ্জনারূপে মুখ দিয়ে ফুটেছিল, যার ভিতর প্রেমিক হৃদয়ের ক্ষণমাত্র বিরহহীন মিলনের আকাঙ্ক্ষাটা শিশুর হৃদয় ভেদ করে ব্যক্ত হয়েছিল—তার মর্ম কেউ ধরলে না। চারদিক থেকে ধিক্কার আসতে লাগল। একটা ভয়ানক অকথনীয় কিছু বলেছি অনুমান করলুম। এতটুকু মেয়ের মুখে একথা বেরল কি করে? সে ভিতরে ভিতরে কত স্নেহক্ষুধায় ভরা ছিল, তারই বাইরে প্রকাশ এটা। যে মাকে আঁকড়াতে পারে না, মায়ের কোলে ঝাঁপাতে পারে না, সে কাউকে আঁকড়াতে চায়। এত বড় প্রকাণ্ড বাড়িতে যেখানে বড়দের সবই চলছে—আমোদপ্রমোদ ও স্নেহ-ভালবাসা অন্য ছেলেমেয়েদের জন্যে—সেখানে নতুন মামী ছোট বোন ঊর্মিলাকে যেমন ভালবাসতেন, তাকে যেমন বুকে করে নিয়েছিলেন, আমাকে যদি তেমনি কেউ স্নেহ দিয়ে ঘিরত, তাহলে ঊষাদিদিকে যে বড্ড ভালবাসি, সেইটে এই রকম ভাষায় ফুটে উঠত না। তাই অপরাধের গুরুত্বটা ঠিক কোন্‌খানটায় তা ধরতে পারলুম না। "বাবা-মা না থাকার" মানে যে ঘরে একেবারে মৃত্যুর করালমূর্তিকে ডেকে আনা—তা কল্পনায়ও আনতে পারলুম না। কেউ না থাকার মানে যে আপন জনের মৃত্যু-কালিমায় গৃহ আচ্ছন্ন হওয়া, সেটা যে কতদূর শোচনীয় ব্যাপার—যার দরুন বলে শত্রুরও মৃত্যু কামনা করতে নেই,—তা তখন আমার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে ধারণার অতীত।

মৃত্যুছায়ার একটা আভাস এল আমার জীবনে আমাদের সব ছোট-বোন ঊর্মিলার হঠাৎ মৃত্যুতে। ঊর্মিলা ছিল নতুন মামীর আদুরে। তিনিই তাকে দেখতেন শুনতেন খাওয়াতেন পরাতেন। তাঁর সঙ্গে সে

বাইরের তেতালাতেই থাকত—আমাদের তিনজনের সঙ্গে বাড়ির ভিতরে নয়। নিঃসন্তান নতুন মামীরই মেয়ে যেন সে। শুধু আমরা যখন ইস্কুলে যেতে লাগলুম তাকেও আমাদের সঙ্গে ইস্কুলে পাঠান হল। এক পাল্কীতে চড়ে যাওয়ার সেই সময়ে মাত্র তার সঙ্গে আমাদের যোগ। তার সঙ্গে আর কোন সংস্রব আমার মনে পড়ে না। আমার চেয়ে দু বছরের ছোট সে। ইস্কুলে ভর্তি হওয়ার দুই এক মাস পরেই একদিন নতুন মামীর ছাদের বাঁকা সিঁড়ি দিয়ে গোলাবাড়ির দিকে আপনাআপনি নামতে গিয়ে নীচে পড়ে গিয়ে brain concussionএ মৃত্যু হয় তার। বাবামশায় তখন বিলেতে।

সারা বাড়িতে সেদিন এক ঘোর কালোছায়া। মা উপরে আছেন, আমাদের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়নি—আমাদের উপরে নিয়ে যাওয়া হয়নি। সেদিন শুধু সতীশ পণ্ডিত আমাদের আগলিয়ে বসে আছেন। বাড়ির অন্য ছেলেমেয়েরা সেদিন খেলতে আসেনি—সবাই নিজেদের ঘরে ঘরে আছে। পণ্ডিতমশায়ের উপর ভার দেওয়া হয়েছিল আমাদের নানা কথায় ভুলিয়ে রাখা, মৃত্যু জিনিসটা যে কি তা না জানতে দেওয়া। ঊর্মিলা কোথায় বেড়াতে গেছে—এই বলা হল আমাদের। আর যে কখনও ফিরবে না তা অনেক দেরীতে ক্রমে ক্রমে উপলব্ধি করলুম।

॥ চার ॥

ইস্কুল

আমি সাড়ে সাত বছরে বেথুন ইস্কুলে ভর্তি হই সব নীচের ক্লাসে—আর ক্লাসের মধ্যে সব চেয়ে ছোটও আমি। লজ্জাবতী—রাজনারায়ণ বসুর ছোট মেয়ে—আমার চেয়ে বয়সে অন্তত চার বছরের বড়—সেও ঐ ক্লাসে। আমি তার ভারি স্নেহ ও যত্নের একটি পুতুল হলুম। ইস্কুলে বছরের পর বছর ক্লাসের পর ক্লাসে সকলের প্রিয় হতে থাকলুম। ক্রমে এমন হতে লাগল এক এক ব্যাচের পর ব্যাচে এক একটি মেয়ে আমার ঘোরতর প্রেমিকা হতে থাকল। যখন বাড়ির গাড়ি বন্ধ হয়ে আমাদের ইস্কুলের বাসে যাতায়াত হল—"সরলা দিদির" বইখাতা কে তাঁর হাত থেকে

নিয়ে নিজেদের হাতে ধরে থাকবে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হল। ইস্কুলে টিফিনের ছুটির সময় বা বাসের ক্ষেপের প্রতীক্ষায় যখন বসে থাকতে হত—তখন "সরলা দিদি"কে নিয়ে ঘুঁটি খেলা করা বা তাঁকে ঘিরে ইংরেজী রূপকথা শোনা—এই হল তাদের কাজ। মাঝে মাঝে "সরলা দিদিকে" বাড়িতে নিমন্ত্রণ করা ও প্রত্যেকের যেটি সবচেয়ে প্রিয় ও রুচিকর জিনিস সেইটি তাঁকে খাওয়ান।

সেই ঘুঁটি খেলার একটি বুলি এখনও মনে পড়ে—কি জানি আজকালকার মেয়েরা আর সেই বুলি বলে সেইরকম ঘুঁটি খেলে কিনা।

"ও দোলন দোলন ও দোলনটি
এক ভুলব দোলের নোটনটি
নোটনধাম নোটনধাম নোটনধামটি।"

আজকাল মেয়েদের মধ্যেও indoor games বলতে "লুডো" "ক্যারাম" এইসব বোঝায়। এই বিজাতীয়দের মধ্যে স্বজাতীয় ঘুঁটিকে ঢোকালে কেমন হয়?

কথামালার ক্লাস থেকে আমি প্রায় সাত বছরে ঢুকেছি, আর সতের বছরে বি-এ পাস করে বেরিয়েছি এই বিদ্যালয় থেকে। এর মধ্যে কত সঙ্গিনী, কত প্রণয়িনী, কত স্থায়ী বান্ধবী লাভ করেছি। পাস করে বেরোনর পরও বছর বছর প্রাইজের পূর্বে আমার ডাক পড়ত—মেয়েদের এ উপলক্ষে গান ও অভিনয়াদি শিখিতে সাজিয়ে গুজিয়ে তৈরি করার জন্যে। শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদেরও আমি খুব প্রিয় ছিলুম। যখন বি-এ পাস করলুম সব শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরা মিলে আমায় অভিনন্দন করে এক সেট ভাল ইংরেজ কবিদের গ্রন্থাবলী উপহার দিলেন।

পাল্কীবাহন

অনেক এগিয়ে এসে পড়েছি। আবার পিছিয়ে বলি। যোড়াসাঁকোয় থাকতে ইস্কুল যেতুম পাল্কীতে চড়ে। ইস্কুলের রাস্তা ছিল যোড়াসাঁকো থেকে চিৎপুর রোডে বেরিয়ে বারাণসী ঘোষ স্ট্রীট দিয়ে মাণিকতলা স্ট্রীটে পড়া। মাণিকতলা স্ট্রীটের ছোট রাস্তার উপর একটা দোকান ছিল, সেখানে বেহারাদের কাঁধে পাল্কী থামিয়ে "gem" বিস্কুট ও লজঞ্জুস কেনা অমাদের জীবনে প্রথম shopping রসের অনুভূতি।

সেকালে পাল্কীর সঙ্গে আমাদের অত্যন্ত সংযোগ ছিল। দুচারখানা

পাল্কী বাড়ির ভিতরের দেউড়ীতে সর্বদাই মজুদ থাকত। দরকার হলে শুধু বেহারাদের তাদের বাড়ি থেকে ডেকে পাঠালেই হল।

বারাণসী ঘোষ স্ট্রীট থেকে চাষা-ধোপা পাড়া বেরোত। সেখানে থাকতেন মাদের মামা ও মামী এবং তাঁদের ছেলেমেয়েরা। ছুটির দিন দু-আনার পাল্কী ভাড়া করে সেখানে যাওয়া আমাদের মস্ত একটা outing ছিল। ঐ দুটি অনা যোগাড় হলেই কি আনন্দের ডাকে আমরা সেখানে ছুটতুম, কি রসহ্রদে ডুবে মজে থাকতুম। ছোট্ট দোতালা বাড়ি, ছোট্ট উঠান, ছোট্ট পুজার দালান, ছোট্ট ছাদ—তার ভিতর বিশালহৃদয়া, সরল, সহাস্য, নাতিসুন্দরী মাদের মামী, আমাদের দিদিমা। মাদের মামা খাস শ্বশুরে পিরিলি, দেখতে অতি সুন্দর, ধবধবে রঙ। নীচের ঘরেই পড়ে থাকেন। এঁদের বড় মেয়ে বিনোদা মাসি আমাদের ছোট মাসিমা বর্ণ-কুমারীর সমবয়সী ও বন্ধু। এঁদের বড় ছেলে বিমান মামা কিন্তু নীতু দাদাদের সমবয়সী। আমরা এখানে এসে কি করতুম? হুড়োহুড়ি, গান, বাজনা, বড়দের দেখা অভিনয়ের নকল। আমাদের এক মামীর একটি বোনঝিও আসত আমাদের সঙ্গে। তার বেসুরা গলায় গান গাওয়ান ও তাতে হেসে হেসে গড়িয়ে পড়া ছিল আর এক মজা। কিন্তু তাকে জানতে দেওয়া হত না যে তার গানের জন্যে আমরা হেসে অস্থির। এ বিষয়ে নেত্রী ছিলেন সরোজা দিদি বা বড়দের কোন একজন। তাঁরা কেউ তাকে গান গাইতে উৎসাহ দিলে সে যখন গান ধরত আর উৎসাহদাত্রী হাসি সামলাতে অক্ষম হতেন, তখন ছোটদের একজনের উপর একটা দোষ চাপাতেন, "ও কি! দেখেছ! কি রকম সুড়সুড়ি দিচ্ছে!" বলে তখন খোলাখুলি সবাই মিলে হেসে বাঁচতেন। গায়িকা স্বপ্নেও সন্দেহ করত না যে তার গানই সবায়ের হাসির প্রবর্তক।

এখানে আসা সম্বন্ধে আর একটি কথা মনে পড়ে। ছোটদের মনে কি রকম করে একটা ধারণা উপ্ত হয়েছিল যে, এঁদের অবস্থা ভাল নয়, যা মাসহারা পান তাতে বহুসন্তানিক এঁদের কষ্টে খরচ নির্বাহ হয়। সেইজন্যে শিশু হলেও বড়দেরই শিক্ষায় আমাদের মনে একটা কর্তব্যবোধ জাগ্রত হয়েছিল যে, এখানে আমোদ করতে এসে যেন এঁদের ঘাড়ে কোন খরচ না চাপাই। তাই আমরা নিজেরাই পয়সা দিয়ে দোকান থেকে সখের খাবারাদি আনাতুম, দিদিমার উপর কোন বোঝা চাপাতুম না। চাষা-ধোপা পাড়ার গলিটিতে যাতায়াত আমাদের ইস্কুল-জীবনেরই এক অঙ্গ ছিল। যেমন যেমন বড় হতে লাগলুম সেটা আস্তে আস্তে খসে যেতে লাগল।

মেজ মামী বিলেত থেকে ফিরলে আর এক দিদিমার বাড়ি—তাঁর মায়ের বাড়ি যাতায়াত আমাদের ধরলে—তাঁরই ছেলেমেয়ের সঙ্গে। সে কথা পরে বলব।

ইস্কুলে পড়াশুনায় যে আমি খুব নিবিষ্টমনা ছিলুম তা নয়। তবে বাড়ির থেকে পণ্ডিত মশায়ের কাছে একদফা পড়া তৈরি করে আসায় ক্লাসে মোটের উপর ভালই থাকতুম। ইস্কুলে যাবার পর পড়াশুনার মধ্য দিয়ে মার সঙ্গে আমার একটু যোগাযোগ আরম্ভ হল। এই সময়কার একটি কথা মনে পড়ে। একদিন ইংরেজী grammar-এ আমার বিদ্যার দৌড় পরীক্ষা করছিলেন মা। Common noun ও Proper noun-এর প্রভেদ কি তার দৃষ্টান্তস্বরূপ জিগ্যেস করলেন—"'গঙ্গা' Common noun না Proper noun?" আমি বল্লুম—"Common noun"। সরোজাদিদির স্বামী মোহিনীবাবু তখন সেই ঘরে ছিলেন, তিনি মার সঙ্গে সঙ্গে বল্লেন—"এই ত তাহলে কিচ্ছু বোঝনি? ভুল বল্লে।"

আমি ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলুম, নিশ্চয় জানি আমার ভুল হয়নি। অসহায়ভাবে বল্লুম—"কেন? ভুল কোথায়? গঙ্গা ত নদী, তাইত Common noun।"

দাসীদের কথায়বার্তায় 'গঙ্গা' শব্দ যে 'নদী'রই পারিভাষিক, যে-সে-নদীই যে গঙ্গাপদবাচ্য এই ধারণাই আমার মনে বসা ছিল। সেটা আমি কিছুতেই মাদের বোঝাতে পারছিলুম না। তাই তাঁরা যখন বল্লেন—'ভুল' আমার মন বলতে লাগল, "বাঃ, আমি যেটা ঠিকই বল্লুম—তাঁরা বল্লেন 'ভুল'!"

বিয়ের পর পঞ্জাবে গিয়ে দেখলুম, সেখানেও মেয়েরা গঙ্গা-শব্দ 'নদী'মাত্রের পরিকল্পে ব্যবহার করেন। তাই গঙ্গা Common noun ও Proper noun দুই-ই। আমিও ভুল বলিনি, আমার গুরুজনেরাও আমার ঠিককে ভুল বলায় ভুল করেননি।

পড়াশুনায় নিতান্ত মন্দ না হলেও সেলাইয়ে আমার রুচি মোটেই ছিল না। সে বিষয়ে ক্লাসে ফাঁকি দিয়ে পরজীবনে নিজেই খুব ফাঁকিতে পড়েছি। মনে পড়ে সেলাইয়ের ঘণ্টা পড়লে Gallery ঘরে গিয়ে সবাই সেলাই হাতে নিয়ে বসত। আমিও Gallery-র সর্বোচ্চ থাকে গিয়ে বসতুম, কিন্তু খালি গল্প করতুম, সেলাই বিশেষ করতুম না। একদিন পাশের মেয়ের সঙ্গে খুব গল্প জমিয়ে দিয়েছি, হঠাৎ চুপচুপ করে উঠে এসে সেলাইয়ের শিক্ষয়িত্রী মিস্ মুখার্জি অতর্কিতে ঠাস করে আমার

গালে একটি চড় মেরে আমায় কর্তব্যে সজাগ করলেন। বাড়িতে মঙ্গলা দাসীর মত স্কুলে এই খ্রীস্টান মহিলাটির চড়চাপড়ের বিশেষ খ্যাতি ছিল। একদিন একটি ছোট মেয়েকে এমন জোরে চাড়িয়েছিলেন যে তাঁর পাঁচটা আঙ্গুলের দাগ দুদিন ধরে তার গাল লাল করে বিরাজমান ছিল। কমিটির কাছে তার অভিভাবকের নালিশে এই শিক্ষয়িত্রী কর্মচ্যুত হলেন। ইস্কুলে আর কারো কাছে কোন শাস্তিই পাইনি। নীচে থেকে উপর পর্যন্ত সকলের কাছেই আদর-যত্ন পেয়েছি। তাই কি পড়াশুনায় বেশি মন না দিয়েও মন্দ হইনি, আর এই শিক্ষয়িত্রীর অকুশল ব্যবহারেই কি সেলাই আমায় পেয়ে বসেনি?

দু-চার ক্লাস উপরে উঠে নতুন একটি পড়ুয়া মেয়ের আবির্ভাবে পড়ায় নিবিষ্টচিত্ততা যে কি তার পরিচয় পেলুম। সে হচ্ছে হেমপ্রভা—জগদীশ বসুর একটি বোন। সে এসে অবধি সেই বরাবর ক্লাসে ফার্স্ট থাকে, তাকে ডিঙ্গোনর কথা কারো কল্পনায়ও আসে না। সে কিন্তু আমার প্রতি খুব আকৃষ্ট হল—আমাদের দুজনের গাঢ় বন্ধুত্ব হল। তখন মাঝে মাঝে তার অভিভাবিকা বড় বোন লাবণ্য-দিদির অনুমতি নিয়ে শনি রবিবারে সে বোর্ডিং থেকে আমাদের বাড়িতে এসে থাকত। তখন আমরা যোড়াসাঁকো ছেড়ে কাশিয়াবাগানে এসেছি। এই সময় দিদির বন্ধু দুর্গামোহন দাসের কনিষ্ঠা কন্যা, শৈল বা 'খুসী', শিবনাথ শাস্ত্রী মশায়ের কন্যা হেম এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আমার সহপাঠী লাহোরের নবীন রায়ের কন্যা হেমন্ত—এরাও পালা করে আসত। আমাদের বন্ধু-জীবন খুব ভরাট হতে লাগল।

॥ পাঁচ ॥

আমরা যোড়াসাঁকো থেকে কাশিয়াবাগানে উঠে আসার আগে মেজমামীরা বিলেত থেকে ফিরেছেন। যোড়াসাঁকোয় আর এক নতুন আবহাওয়া এসেছে। মেজমামা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সব প্রথম ইণ্ডিয়ান সিভিলিয়ন—বম্বে প্রদেশে নিযুক্ত। মেজমামীর ছেলেমেয়ে সুরেন বিবির ইংরেজী ভাষণ ও ইংরেজী চালচলনের সঙ্গে সঙ্গে সাহেবী পোশাক-পরা বোম্বাইয়ের "রামা" চাকরের অভ্যুদয় সকলের পক্ষে ভারি আমোদজনক হল। ইন্দিরার "বিবি" নামটিও বোম্বায়ের আমদানী। আরও একটি

সঙ্গী ছিল তাঁদের—ফ্রান্সের নিস্ শহর থেকে সংগৃহীত "নিসুয়া" নামের কুকুর,—ছোট ছোট সাদা লোমওয়ালা একটি তুলতুলে জাপানী lap-dog। সবাই তাকে নিয়ে কাড়াকাড়ি করতুম, কোলে তুলতে চটকাতে ভালবাসতুম। প্রথমটা দাঁত খিঁচতে ত্রুটি করত না সে, কিন্তু পরে ঠাণ্ডা হয়ে থাকত।

সুরেন বিবিদের পরিধান খাস বিলেতের কোট ও ফ্রক। এ বাড়ির ছোট ছেলেমেয়েদের বাড়ির পরিধান তখনও সেই ইজের জামা, আর বাইরে স্কুলাদিতে যেতে হলে দিশী দর্জির হাতের যেমন-তেমন cut-এর ফ্রক। পেশোয়াজ প্রভৃতির চাল ইরুদিদি ইন্দুদিদিদের (বড়মাসিমার দুই কন্যা) পর থেকে উঠে গেছে। বলেছি আমাদের সান্ধ্য বিহার ছিল বাইরের তেতালার ছাদে। কিন্তু বিলেত ফেরৎ সুরেন বিবিরা রামার সঙ্গে রোজ ইডেন গার্ডেনে বেড়াতে যেত। পালা করে এক একদিন বাড়ির এক একটি ছেলেমেয়ে তাদের সঙ্গে যেতে পেত। একদিন আমার পালা এল। দিদির ও আমার দুটি নতুন ফ্রক তৈরি হয়েছে। সুইস মস্লিনের উপর সুন্দর ফিতে দিয়ে সাজান। দিদি তাঁরটা মাঝে মাঝে পরে বাহার দেন, আমার অবসর আসে না। সেদিন ইডেন গার্ডেনে যাব বলে সেই ফ্রক পরে বাইরের বারান্দায় এসে অপেক্ষা করতে লাগলুম—রামার সঙ্গে সুরেন বিবিরা এলে একসঙ্গে নীচে নেমে গাড়িতে চড়ব বলে।

আমি দাঁড়িয়ে আছি দক্ষিণ দিকে বৈঠকখানার সামনের বারান্দায়। আমাদের পড়ার ঘর হচ্ছে পশ্চিম দিকে। সে ঘর থেকে বেরিয়ে তাঁর বারান্দায় এসে সতীশ পণ্ডিতমশায়ের চোখ হঠাৎ আমার উপর পড়ল। কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন—"কোথায় যাওয়া হচ্ছে এত সাজগোজ করে?"

"সুরেন বিবির সঙ্গে ইডেন গার্ডেনে বেড়াতে যাচ্ছি।"

"কার হুকুমে?"

"মা বলেছেন যেতে।"

"বটে! আমায় জিজ্ঞেস করা হয় নি! আমার বিনা হুকুমে যাওয়া হচ্ছে! যেতে পাবে না। ফিরে যাও মঙ্গলার কাছে। ফ্রক খুলে ফেল।"

আমি কাঁদতে কাঁদতে বাড়ির ভিতরে ফিরে গেলুম নিজেদের ঘরে। মায়ের হুকুমের উপরেও যে পণ্ডিতমশায়ের হুকুম চলতে পারে না এ সন্দেহ এল না মনে। বড় হয়ে একদিন মার কাছে এই দিনকার ঘটনাটা বর্ণনা করতে মা বললেন—"আমার কাছে এসে বললি নে কেন তখন?"

হয়ত দাদা-দিদিরা জানেন, কিন্তু আমি তখনও জানতুম না মা-ই Supreme Court, মায়ের অনুমতির বিরুদ্ধে পণ্ডিতমশায়ের হুকুমের উপর মায়ের কাছে আপীল আছে। এমনি অকরুণ হর্তাকর্তাবিধাতার হাতে পড়েও যে কতটা আনন্দের অবসর ছিল আমাদের শৈশব জীবনে তাই আশ্চর্য হই। শিশুচিত্তের স্থিতিস্থাপকতা তার একটা প্রধান কারণ।

যদিও সুরেন বিবি দুই ভাই-বোনে ইংরেজী স্কুলে ভর্তি হলেন—একজন সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুলে আর একজন লরেটো কনভেণ্টে, আর আমার দাদা জ্যোৎস্নানাথ ও আমি দেশী স্কুলের ছাত্রছাত্রী রইলুম, তবু আমাদের দুটি জোড়া ভাইবোনে খুব ভাব হল। বাড়ির মধ্যে আমাদেরই বেশী মিল—শিক্ষাদীক্ষা এক ধরনের, কিন্তু গোড়ায় গোড়ায় আমাদের রুচি ও আদর্শের অনেক পার্থক্যও ছিল। বেথুন স্কুলের আবহাওয়ায় আমি ছিলুম ভারি স্বদেশপ্রেমিক। নতুন মামা একদিন আমাদের কোন একটা সার্কাসে নিয়ে যেতে চাইলেন—একটা বাঙালীর ও একটা উইলসন সাহেবের—যেটায় আমাদের অভিরুচি। আমি বললুম—"বাঙালীর সার্কাসে যাব।" টাট্‌কা বিলেত প্রত্যাগত মেজমামীর ছেলেমেয়েরা বললেন, সাহেবের সার্কাসে যাবেন, কেননা বাঙালীর সার্কাস নোংরা। আমি বললুম—"হলই বা একটু নোংরা। কত কষ্ট করে বাঙালীরা নিজেদের একটা কিছু গড়ে তুলছে—তাদের দেখব না?" নতুন মামাও স্বদেশী। তাই সেবারটা বাঙালী সার্কাসেই যাওয়া হল। বড় হয়ে মেজ-মামীর ছেলেমেয়েরাও ক্রমে ক্রমে বিচারে আচারে স্বদেশী হতে থাকলেন। "হিন্দুস্থান কো অপারেটিভ ইন্সুরেন্স" সুরেনের একটি মস্ত স্বদেশী কীর্তিস্তম্ভ।

এদিকে স্কুলে উপর ক্লাসের কতকগুলি মেয়েদের নেতৃত্ব-প্রভাবে আমার জাতীয়তার ভাব উত্তরোত্তর বর্ধিত হতে লাগল। তাঁদের মধ্যে অন্যতম নেত্রী ছিলেন—কামিনী দিদি ও অবলা দিদি—কবি কামিনী রায় ও লেডি অবলা বসু। তাঁদের নির্দেশগুলি আমাদের কাছে প্রবহমান হয়ে আসত আমার দিদি ও তাঁর সহপাঠিনীদের মধ্য দিয়ে। সব সময় সব ব্যাপারগুলি না বুঝেও তাঁদের আদেশানুযায়ী কাজ করতুম। ইলবার্ট বিলের আন্দোলনে সুরেন বাঁড়ুয্যে যখন জেলে যান, তখন সবাই একটা কালরঙের ফিতে আস্তিনে বাঁধলুম। কেন তা ঠিক জানতুম না। কিন্তু রাস্তায় স্কুলযাত্রী অনেক ছেলেদের হাতেও সেই রকম ফিতে দেখে একটা সহবেদনার বৈদ্যুতী খেলতে লাগল মনে। একটা বড় কিছুর সঙ্গে

যুক্ত হয়েছি অনুভব করতে লাগলাম। লর্ড রিপনের বিরাট অভ্যর্থনায় স্টেশনে সারবন্দি "flower girls"দের মধ্যে আমায় একজন মনোনীত করা হল। অভ্যর্থনা কমিটির দেওয়া একই রকমের শাড়িজামা পরে, হাতে ফুলের সাজি নিয়ে প্রায় ত্রিশচাল্লিশটি মেয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম ট্রেন আসার প্রতীক্ষায়। যেমন গাড়ি এসে থামল, লর্ড রিপন নামলেন, তাঁর উপর পুষ্পবৃষ্টি করলে "ফুলকুমারী"রা। আমার জীবনে ৯।১০ বছর বয়সে এই প্রথম পাবলিক অনুষ্ঠানে অবতারণা। এই অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন ব্যারিস্টার গিরিজাশঙ্কর সেন। তাঁর ছোটবোন প্রমীলা আমার সহপাঠী বন্ধু। তাঁরই বড় বোন আজকালকার কংগ্রেসকর্মী মোহিনী দেবী।

মেজমামীদের সঙ্গে রবিমামাও প্রথমবারের বিলেত যাত্রা থেকে বাড়ি ফিরে এসেছিলেন। আমরা ছোটরা গানের ভিতর দিয়ে তাঁর সঙ্গে সম্পর্কে এলুম। এ বিষয়ে পূর্বে লিখিত একটি প্রবন্ধ থেকে কিছু কিছু যোগ-বিয়োগের সঙ্গে উদ্ধার করছি—

বাড়িতে গান-বাজনা ও অভিনয়াদির দিক থেকে রবিমামার প্রাধান্য ক্রমশ ফুটছে। এর আগে নতুনমামা—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর সে দিককার কর্ণধার ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বিলেতনিবাস কালেই আমার মায়ের রচিত 'বসন্তোৎসব' গীতিনাট্যের অভিনয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অধ্যক্ষতায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সঙ্গীতের এক মহাহিল্লোলে হিল্লোলিত হয়ে উঠেছিল বাড়ি তখন। আমাদের শিশুকণ্ঠেও প্রতিধ্বনিত হতে থাকত বড় বড় ভাবের বড় বড় কথায় বড় বড় রাগ—"চন্দ্রশূন্য তারাশূন্য মেঘান্ধ নিশীথে য়ে য়ে য়ে য়ে"—বাগেশ্রীর তানে আমাদের গলা ও মন খেলিয়ে খেলিয়ে উঠত। "বসন্তোৎসব" বাস্তবিকই একখানি অপূর্ব জিনিস। রবিমামার মত য়ুরোপের দেশবিদেশ ঘুরে বহুদর্শিতায় পুষ্ট প্রতিভার ফল এটি নয়। শুধু ঘরের ভিতরে অন্তঃপুরে বসে বসে অন্তঃপুরিকার রচনা। ভারতবর্ষের পূর্বাপর কেবলমাত্র কল্পনা-রাজ্যবাসী কবিদেরই শ্রেষ্ঠতম কাব্যরচনার সঙ্গে তুলনীয়। বন্ধুদের যে আনুকূল্য রবীন্দ্রনাথের কৈশোর থেকে দোসর হয়েছিল, সেই আনুকূল্যের অভাবে এটা দেশে ছড়িয়ে পড়েনি। তবু আগরতলায় ত্রিপুরার রাজপ্রাসাদে যখন বহু বৎসর পরে নিমন্ত্রিত হয়ে যাই, রাজা বীরেন্দ্র মাণিক্যের নিজের অধিনায়কতায় তাঁর কন্যা, ভগ্নী ও অন্যান্য রাজ-অন্তঃপুরিকাদের দ্বারা এই গীতিনাট্যটির অভিনয় দেখে শুনে আশ্চর্য হয়েছিলুম।

রবীন্দ্রনাথের জন্যে বাড়িতে ভূমি তৈরি। তিনি এসে তাতে নতুন নতুন বীজক্ষেপ করতে থাকলেন। তিনি আসার পর প্রথম যে একটি ছোট্ট গীতিনাট্যের অভিনয় হল—যাতে ইন্দ্র ও শচী সাজেন নতুনমামা নতুনমামী এবং বসন্ত সাজেন রবিমামা, তার নাম "মানময়ী", নতুনমামাই তার রচয়িতা।

তারপর হল সরস্বতী পুজার দিন 'সারস্বত সম্মিলনে' ছাদের উপর স্টেজ বেঁধে, বাইরের লোক নিমন্ত্রণ করে মহা ধুমধামে "বাল্মীকি প্রতিভা"। এইতে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা প্রথমে সর্বজনসমক্ষে উদ্ঘোষিত হল।

এসব মধুচক্রের রচয়িতা বড়রা হলেও আমরা ছোটরা নিত্য তাঁদের প্রসাদ-মধুপায়ী ছিলুম। কখনো কখনো তাঁদের অনুকরণে নিজেদের দল বেঁধেই আবার ঐ সবের অভিনয়পরায়ণ হতুম। আমাদের নেতা ছিলেন সুধীদাদা—বড়মামা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র। তিনি রবিমামার অনুকরণ করে ঠিক ঠিক সেই রকম বাল্মীকি সাজতেন, নিজের হাতের লেখাটিও তাঁর লেখার প্রায় অবিকল প্রতিরূপ করে তুলেছিলেন—তখনো তিনি সে প্রখ্যাত রবীন্দ্রনাথ হননি—যাঁর হস্তলিপির অনুলিপি দেশের ডজন ডজন ভক্ত ছেলেরা করেছে।

এই রকমে পরোক্ষভাবে সঙ্গীত-প্রাণকতায় আমরা রবিমামার অধিনায়কত্বে আসতে থাকলুম। কিন্তু যেখানে তাঁর সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ হল সে ১১ই মাঘের গানে। এর আগে ১১ই মাঘের গানের অভ্যাস বড়মামা, নতুনমামা বা বোম্বাইপ্রবাস প্রত্যাগত মেজমামা—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহ-নেতৃত্বাধীনে থাকত। রবিমামা বিলেত থেকে ফেরার পর তিনিই নেতা হলেন। দাদাদের সঙ্গে সঙ্গে নিজেও নতুন নতুন ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করা, ওস্তাদদের কাছ থেকে সুর নিয়ে সুরভাঙ্গা, নিজের মৌলিক ধারার সুর তখন থেকেই তৈরি করা ও শেখান—এ সবের কর্তা হলেন রবিমামা। বাড়ির সব গাইয়ে ছেলেমেয়েদের ডাকও এই সময় থেকে পড়ল। আগে শুধু অক্ষয়বাবুপ্রমুখ ওস্তাদের দল ১১ই মাঘের গায়ক ছিলেন; তাঁদের মধ্যে একমাত্র প্রতিভাদিদির—সেজমামার কন্যার—কখনো কখনো স্থান হত।

কর্মজীবনে যে তৎপরতা রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্টতা হয়ে দেখা দিয়েছিল এখানি তার একটু আভাস পাওয়া গেল। আর শেষদিন পর্যন্ত ছাপান কাগজের জন্যে অপেক্ষা নয়। দিন দুয়েক হাতে হাতে নকল করা

দু-একখানা কাগজ ভাগাভাগি করে গান অভ্যাসের পর প্রায় তৃতীয় দিনের মধ্যেই সকাল-সন্ধ্যা দুবেলার গানের বইয়ের বিশ-পঁচিশখানি প্রুফ আদিব্রাহ্মসমাজ প্রেস থেকে তুলিয়ে আনিয়ে প্রত্যেক গায়কের হাতে একখানি করে বই বেঁটে দিয়ে স্বয়ং আসরে বসে শেখান কার্যে ব্রতী হতে থাকলেন রবিমামা।

আগেকার ব্রহ্মসঙ্গীতগুলির ভাব অদ্বৈতমূলক, উপনিষদের শ্লোকাবলীর প্রায় অনুবৃত্তি, আমাদের পক্ষে তার মর্মে প্রবেশ দুরূহ ছিল। কিন্তু রবিমামার আমলের সঙ্গীত গাম্ভীর্য ও মাধুর্য মিশিয়ে শিশুচিত্তেও একটা অব্যক্ত আলোড়ন আনতে থাকল। কিছু বুঝি, কিছু বুঝি না, কিন্তু হৃদয় যেন কোন সুদূরে আনন্দের আঁচল ছুঁয়ে আসে। এমন কি এই গানটি আমার ন-দশবছরের শিশু-মনের কোন কবাটে ঘা দিত—“তবে কি ফিরিব ম্লান মুখে সখা—আঁধার সংসারে আবার ফিরে যাব।”

শুধু ধর্মসঙ্গীতে নয়, এখন থেকে কত ভাবের কত গানে বাড়ি সদাগুঞ্জরিত হতে থাকল। বাড়িতে শেখা দিশী গানবাজনায় শুধু নয়, মেমেদের কাছে শেখা য়ুরোপীয় সঙ্গীতের চর্চায়ও আমাদের উৎসাহদাতা ছিলেন রবিমামা।

আমার একটা নৈসর্গিক কুশলতা বেরিয়ে পড়ল—বাঙ্গলা গানে ইংরিজী রকম কর্ড দিয়ে ইংরিজী ‘piece’ রচনা করা। একবার রবিমামা আমাদের একটা ‘task’ দিলেন—তাঁর “নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ” কবিতাকে পিয়ানোতে প্রকাশ করা। একমাত্র আমিই সেটা করলুম। মনে পড়ে তাতে কি অভিনিবেশ শিক্ষা দিলেন। কি গভীর ভাবে কাব্যের অর্থবোধ ও সঙ্গে সঙ্গে সুরে ও তালে তাকে দেহদান করার অপূর্ব গহন আনন্দকূপে আমায় ডুব দেওয়ালেন।

তখন আমার বয়স বার বৎসর। হঠাৎ সেই জন্মদিনের সকালে রবিমামা এলেন কাশিয়াবাগানে হাতে একখানি য়ুরোপীয় music লেখার manuscript খাতা নিয়ে। তার উপর সুন্দর করে বড় বড় অক্ষরে লেখা —“ ‘Socatore’—Composed by Sarola।”

‘সকাতরে ঐ কাঁদিছে সকলে’ বলে রবিমামার একটি ব্রহ্মসঙ্গীতকে আমি রীতিমত একটি ইংরেজী বাজনার pieceএ পরিণত করেছিলুম। পুরোদস্তুর ইংরেজী piece, পিয়ানোতে বা ব্যাণ্ডে বাজাবার মত।—না জানলে কেউ চিনতে পারবে না এর ভিতরটা দিশী গান, জানলে—তারা

উদারা মুদারা তিনটে গ্রামে ছড়ান কণ্ঠের বহুস্বরের বৈচিত্র্যের ভিতর থেকে আসল সুরটির উঁকিঝুঁকি ধরে ফেলে বিস্ময়ামোদিত হবে।

ইংরেজী বিধানে সপ্তাঙ্গে সম্পূর্ণ সেই বাজনাখানি আমার মাথায় স্তরে স্তরে লেখা ছিল। কাউকে শোনাতে গেলেই সবটা মনের থেকে হাতে বেরিয়ে এসে বাজত। রবিমামা খাতাখানি দিয়ে বল্লেন—"এইতে লিখে রাখ, ভুলে যাবি।"

লেখা হল, কিন্তু ভোলাও হল। কেননা সে খাতাখানি গেছে হারিয়ে —আমার জীবনের সবই কিছু যেমন হারানর তহবিলে গেছে চলে।

তারপরেও "চিনি গো চিনি বিদেশিনী" প্রভৃতি অনেকগুলি রবীন্দ্রগান এবং "হে সুন্দর বসন্ত বারেক ফিরাও" প্রভৃতি দুই-একটি নিজের গানও আমার হাতে সেই রকমে য়ুরোপীয়াম্বিত হয়েছিল। অন্তরটি এদের একহারা দিশী সুর, বাইরের শরীরটি তাদের উচ্চ নীচ নানা সপ্তকে নানা সুরের অবিসম্বাদী মিলনময় একটি রূপ। এ সব গান শেখান এবং গাওয়ানও হয়েছে অনেকবার অনেক সঙ্গীত সভায়। ইংরেজী স্বরলিপি প্রথায় লেখার শ্রমও করেছেন মেজমামার কন্যা ইন্দিরা দেবী, কিন্তু বই করে কোনদিন ছাপান হয়নি। ছাপাখানার সুযোগের অভাবে, কিম্বা আমার ভিতর থেকে সে বিষয়ে দুর্দমনীয় আগ্রহের ও চেষ্টার অভাবে।

কিশোর বয়স পর্যন্ত আমরা থাকি বড়দের হাতে সলতের মত। ভিতরে ভিতরে জ্বলার ধর্ম থাকলেও তাঁরা উস্কে না দিলে সব সময় বাইরে জ্বলিনে। আর জ্বলাটা যদি অভ্যাসগত না হয়ে যায়—অভ্যাসটা যদি একবার পার হয়ে যাওয়া যায়, পরে আর নিজেকে নিজে বাইরে জ্বালানর উদ্যম আসে না। আমার বিধাতা আমার পিতামাতাকে সঙ্গীতে বা সাহিত্যে কোনদিকে আমার আত্ম-অভিব্যক্তিকে বাইরে উস্কানর কাজে নিযুক্ত করেননি, তাদের মুদ্রাঙ্কনের বিষয়ে উৎসাহ ও উদ্যোগময় করেননি। তাই আজ পর্যন্ত আমার সব লেখাই প্রায় 'ভারতী'র পৃষ্ঠাতেই নিবদ্ধ এবং গানগুলি আমার খাতায় বা গায়কদের মুখে মুখে। আমার লেখা-কুমারীরা মাসিকে সাপ্তাহিকে দৈনিকে ছাপাসুন্দরী হয়েছে কিন্তু গ্রন্থের ঘরণী হয়নি—মাত্র গুরুদাস চাটুয্যে কোম্পানীর আট আনার এডিশনে ছাপান "নববর্ষের স্বপ্ন" নামে কতকগুলি ছোট গল্প, বড় বড় সভাসমিতিতে ভাষিত ইংরেজী ও বাঙ্গলা বক্তৃতা, 'বঙ্গের বীর' সিরিজের দুখানি পুস্তিকা ও ইদানীংকার দুয়েকটি আধ্যাত্মিক বিষয়ের বই ছাড়া।

লাহোর থেকে দু-একবার আগেকার লেখাগুলি বই আকারে ছাপাবার চেষ্টা করে ব্যর্থশ্রম হয়েছি। 'কবিমন্দির' প্রভৃতি দুতিন ফর্মা ছেপে, প্রেসওয়ালাদের পকেটে টাকা ভরে রুদ্ধশ্বাস হয়ে গেছে।

প্রাণের গভীরে আমার যে সুরদেবতা অধিষ্ঠিত ছিলেন তাঁকে নিত্য হবিঃ দানে তাঁর পুষ্টিসাধনা করে তাঁর দ্বারা আমারও পুষ্টিবিধানের হোতা হলেন রবিমামা। আমি গানের বাতিকগ্রস্ত ছিলুম। যেখান সেখান থেকে নতুন নতুন গান ও গানের সুর কুড়তুম। রাস্তায় গান গেয়ে যাওয়া বাঙ্গালী বা হিন্দুস্থানী ভিখারীদের ডেকে ডেকে পয়সা দিয়ে তাদের কাছে তাদের গান শিখে নিতুম। আজও সে ঝোঁক আছে।

কর্তাদাদামহাশয় চুঁচড়ায় থাকতে তাঁর ওখানে মাঝে মাঝে থাকবার অবসরে তাঁর বোটের মাঝির কাছ থেকে অনেক বাউলের গান আদায় করেছিলুম। যা কিছু শিখতুম তাই রবিমামাকে শোনাবার জন্যে প্রাণ ব্যস্ত থাকত—তাঁব মত সমজদার আর কেউ ছিল না। যেমন যেমন আমি শোনাতুম—অমনি অমনি তিনি সেই সুর ভেঙ্গে, কখনো কখনো তার কথাগুলিরও কাছাকাছি দিয়ে গিয়ে এক একখানি নিজের গান রচনা করতেন। "কোন্ আলোকে প্রাণের প্রদীপ", "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে", "আমার সোনার বাংলা" প্রভৃতি অনেক গান সেই মাঝির কাছ থেকে আহরিত আমার সুরে বসান।

মহীশূরে যখন গেলুম সেখান থেকে এক অভিনব ফুলের সাজি ভরে আনলুম। রবিমামার পায়ের তলায় সে গানের সাজিখানি খালি না করা পর্যন্ত, মনে বিরাম নেই। সাজি থেকে এক একখানি সুর তুলে নিলেন তিনি, সেগুলিকে মুগ্ধচিত্তে নিজের কথা দিয়ে নিজের করে নিলেন—তবে আমার পূর্ণ চরিতার্থতা হল। "আনন্দলোকে মঙ্গলা-লোকে", "এস হে গৃহদেবতা", "এ কি লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ", "চিরবন্ধু চিরনির্ভর" প্রভৃতি আমার আনা সুরে বসান গান।

আমার সব সঙ্গীতসঞ্চয়ের মূলে তাঁকে নিবেদনের আগ্রহ লুকিয়ে বাস করত। দিতে তাকেই চায় প্রাণ, যে নিতে জানে। বাড়ির মধ্যে শ্রেষ্ঠ গ্রহীতা ছিলেন রবিমামা, তাই আমার দাত্রীত্ব পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল তাঁতে।

"বন্দে মাতরম্"এর প্রথম দুটি পদে তিনি সুর দিয়েছিলেন নিজে। তখনকার দিনে শুধু সেই দুটি পদই গাওয়া হত। একদিন আমার উপর ভার দিলেন—"বাকী কথাগুলোতে তুই সুর বসা।" তাই "ত্রিংশকোটিকণ্ঠ

কলকলনিনাদ করালে" থেকে শেষ পর্যন্ত কথায় প্রথমাংশের সঙ্গে সমন্বয় রেখে আমি সুর দিলুম। তিনি শুনে খুশী হলেন। সমস্ত গানটা তখন থেকে চালু হল।

আমার সাহিত্যগত রুচিও গড়ে দিয়েছিলেন রবিমামা। ম্যাথু আর্নল্ড, ব্রাউনিং, কীটস্, শেলি প্রভৃতির রসভাণ্ডার যিনি আমার চিত্তে খুলে দেন—সে রবিমামা। মনে পড়ে দার্জিলিঙের 'Castleton House'এ যখন মাসকতক রবিমামা, মা, বড়মাসিমা, দিদি ও আমি ছিলুম—প্রতি সন্ধ্যাবেলায় Browningএর "Blot in the Scutcheon" মানে করে করে বুঝিয়ে বুঝিয়ে পড়ে শোনাতেন। Browning-এর সঙ্গে আমার সেই প্রথম পরিচয়। সেই সময় পিঠে একটা ফোড়ায় যখন শয্যাশায়ী তখন শুয়ে শুয়ে "মায়ার খেলা" গীতিনাট্য রচনা আরম্ভ করেন। প্রতিদিন একটি দুটি করে গান রচনা করতেন ও সঙ্গে সঙ্গে আমায় শিখিয়ে দিতেন।

॥ ছয় ॥

রবীন্দ্র-বঙ্কিম বিতর্ক

রবিমামার সঙ্গে ছেলেবেলায় একটি সভায় যাওয়া আমার মনে পড়ে। জীবনে এই প্রথম সভাগমন। কি excitement, কি উদ্দীপনা আমাদের —সুরেন বিবি সুধীদাদা বলুদাদারাও আছেন। সভাটি আদি ব্রাহ্ম-সমাজের হলে আহূত। উদ্দেশ্য সে সভায় বঙ্কিমের একটি মতের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের তীব্র প্রতিবাদ পাঠ। বঙ্কিমের যশ ও কীর্তি তখন মধ্যাহ্ন গগনে সমুদিত আর রবি সবেমাত্র উদীয়মান। লোকদের মধ্যে একটা হলচল পড়ে গেল। রবীন্দ্রনাথের নাম তখন তাঁর গানের ভিতরে রবিছায়াতেই প্রায় নিবদ্ধ। এই বক্তৃতায় যে ওজস্বী গদ্যে, যে যুক্তিতর্কে তাঁর শ্রোতাদের মন আকৃষ্ট করলেন তা ইতিপূর্বে তাঁর সম্বন্ধে অভাবনীয়।

সংক্ষেপে ব্যাপারটি এই—রবীন্দ্রনাথের প্রতিপাদ্য এই যে, মিথ্যা কোন অবস্থাতেই কোন সময়েই কথনীয় নয়। এ বিষয়ে ধর্মশাস্ত্রকারকৃত

ব্যতিক্রম বিধিগুলি তিনি সমর্থন করেন না, বঙ্কিম করেন—এই প্রভেদ। রবীন্দ্রনাথের দুই অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এ বিষয়ে শাস্ত্রকারদের ও বঙ্কিমের পক্ষাবলম্বী হলেন, তাঁরা বক্তৃতা-সভায় যোগদান করলেন না। কিন্তু ছোটরা তাঁর hero-worshipper হল।

তর্কের বিষয়টি বড় সূক্ষ্ম ও চিরকাল মানবসমাজের আলোচ্য। একপক্ষের অস্ত্রধারী হয়ে রবীন্দ্রনাথ যেন এইটিতে বঙ্কিমের Achilles' heel আবিষ্কার করে সেইখানে খোঁচা দিলেন। রবীন্দ্রের বক্তৃতা তৎকালীন "ভারতী"তে বেরিয়েছিল, বিশ্বভারতী থেকে রবীন্দ্র রচনা সংগ্রহে সেইটি নিশ্চয়ই সন্নিবিষ্ট হয়ে থাকবে। কিন্তু বঙ্কিমকে বাঙালীর মনে চিরজাগরূক রাখবার কোন প্রতিষ্ঠান নেই। তাঁর যে শুধু ঔপন্যাসিক প্রতিভা ছিল না, সংস্কারের ও ভাবের গতানুগতিকতায় বাহিত না হয়ে বুদ্ধির প্রখর বিচারশীলতায় তিনি যে কত বড় 'আধুনিক', রবীন্দ্রের গুরু ও মার্গদর্শী তিনিই যে,—সে কথা এই পুরুষের বাঙ্গালীরা প্রায় জানে না। 'সত্য' সম্বন্ধে রবীন্দ্রের uncompromising আপোষশূন্য মনোভাবের অভিব্যক্তিতে সেদিন আমরা বাড়ির ছোট ছেলেমেয়েরা মুগ্ধ হলুম। সত্যভক্তি আমাদের বুকে ক্ষোদিত করে দেওয়া হল। শিশুদের পক্ষে এইটেই দরকার। তাদের মনে ধর্মের নিয়মগুলির সংস্কারই বসিয়ে দেওয়া উচিত, ব্যতিক্রমের গহনে আগে থেকেই পা ফাঁসালে তাদের দুর্বল মন কথায় কথায় ব্যতিক্রমবিধির আড়ে মিথ্যাভাষণ ও মিথ্যা আচরণের আশ্রয় নেবে। শোনা যায় বিদ্যাসাগরমশায় তাঁর স্কুলের কোন পড়ুয়াকে মিথ্যা কথা কইতে শুনে বলেছিলেন,—"যাও বাবা, এখানে তোমার জায়গা হবে না, সেই আলিপুরের বটতলায় 'টুর্নি' বাবুদের কাছে গিয়ে বোসো।" কি শিশু, কি বড়, সকল মানুষেরই অন্তরের গভীর স্তরে কতকগুলি উচ্চ ভাব বসবাস করে। একখানা ব্রিটিশ Military Manual-এ পড়েছিলুম—"সৈন্যদের কেবলমাত্র হুকুমের দ্বারা চালাবে না। তাদের ভিতরকার সাহস প্রভৃতি উচ্চতম ভাব ও আদর্শের প্রতি appeal করে শত্রুজয়ে উদ্দীপিত করবে।" সত্যই পরম ধর্ম। কখনো কখনো অসত্যও ধর্মেরই রূপ; সুতরাং মার্জনীয়—এই কথা শাস্ত্রকাররা বলেছেন। সত্যই পরম ধর্ম। সত্যমিথ্যার ব্যবচ্ছেদ রেখাটি সুস্পষ্ট। কিন্তু কোন কোন অবস্থায় দেখতে অসত্য হলেও, তা ধর্মেরই রূপান্তর ও সেস্থলে ধর্মার্থে অসত্যই বিহিত—এই কথাটিই শ্রীকৃষ্ণের মুখে বঙ্কিম আমাদের শুনিয়েছেন।

বড় হয়ে যখন বিচার-বিবেচনা-শক্তি খানিকটা উদ্বুদ্ধ হল, তখন বঙ্কিমকে পড়ে দেখে অনুভব করলুম, বঙ্কিমের প্রতি সুবিচার করিনি আমরা, সেদিন মাতুলভক্তিতে অযথা বঙ্কিম-মতদ্বেষী হয়ে পড়েছিলুম। সেই অন্যায় ক্ষালনের জন্যে একালের পাঠকদের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্যে ও বিষয়টির মাহাত্ম্য তাঁদের সমক্ষে ধারণের জন্যে "কৃষ্ণকথিত ধর্মতত্ত্ব" থেকে নিম্নে উদ্ধৃত করছি।

"কথাটা এই। সত্য পরম ধর্ম। যদি অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে বধ না করেন, তবে তাঁহাকে সত্যচ্যুত হইতে হয়। অর্জুনের প্রশ্ন এই যে, সত্যরক্ষার্থ যুধিষ্ঠিরকে বধ করা তাঁহার কর্তব্য কি না। অর্জুন কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার মতে এক্ষণে কি করা কর্তব্য?"

কৃষ্ণ যে উত্তর দিলেন, তাহা বুঝাইবার পূর্বে, আমরা পাঠককে অনুরোধ করি যে, আপনিই ইহার উত্তর দিবার চেষ্টা করুন। বোধ করি, সকল পাঠকই একমত হইয়া উত্তর দিবেন যে, এরূপ সত্যের জন্য যুধিষ্ঠিরকে বধ করা অর্জুনের কর্তব্য নহে। কৃষ্ণও সেই উত্তর দিলেন। কিন্তু পাশ্চাত্যনীতিপণ্ডিত আধুনিক পাঠক যে কারণে এই উত্তর দিবেন, কৃষ্ণ সেই কারণে এ সকল উত্তর দিলেন না। তিনি প্রাচ্যনীতির বশবর্তী হইয়াই এই উত্তর দিলেন। তাহার কারণ বুঝাইতে হইবে না,—বুঝাইতে হইবে না যে, শ্রীকৃষ্ণ ভারতবর্ষে অবতীর্ণ—ইংলণ্ডে নহে। তিনি ভারতবর্ষের নীতিতে সুপণ্ডিত, ইউরোপীয় নীতি তখন হয়ও নাই, এবং কৃষ্ণ তন্মতাবলম্বী হইলে অর্জুনও তাহার কিছুই বুঝিতেন না।

কৃষ্ণ অর্জুনকে বুঝাইবার জন্য যে সকল তত্ত্বের অবতারণা করিলেন, এক্ষণে তাহার স্থূল মর্ম বলিতেছি—অন্ততঃ যে অংশ বিবাদের স্থল হইতে পারে, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

তাঁহার প্রথম কথা, "অহিংসা পরম ধর্ম।" ইহাতে প্রথম আপত্তি হইতে পারে যে, সকল স্থানে অহিংসা ধর্ম নহে। দ্বিতীয় আপত্তি এই হইতে পারে যে, কৃষ্ণ স্বয়ং গীতাপর্বাধ্যায়ে অর্জুনকে যে উপদেশ দিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন, এ উক্তি তাহার বিপরীত।

যিনি অহিংসাতত্ত্বের মর্ম না বুঝেন, তিনিই এরূপ আপত্তি করিবেন। অহিংসা পরম ধর্ম, একথায় এমন বুঝাইবে না যে, কোন অবস্থায় কোন প্রকারে প্রাণিহিংসা করিলে অধর্ম হয়। প্রাণিহিংসা ব্যতীত আমরা ক্ষণমাত্র জীবন-ধারণ করিতে পারি না, ইহা ঐশিক নিয়ম। যে জল পান করি, তাহার সঙ্গে সহস্র সহস্র অণুবীক্ষণদৃশ্য জীব উদরস্থ করি; প্রতিনিশ্বাসে বহুসংখ্যক তাদৃক্ জীব নাসাপথে প্রেরিত করি, প্রতি পদার্পণে সহস্র সহস্রকে দলিত করি। একটি শাকের পাতা বা একটি বেগুনের সঙ্গে অনেকগুলিকে রাঁধিয়া খাই। যদি বল, এ সকল অজ্ঞানকৃত হিংসা, ইহাতে পাপ নাই; আমি তাহার উত্তরে বলি যে, জ্ঞানকৃত প্রাণিহিংসা ব্যতীতও আমাদের প্রাণরক্ষা নাই। যে বিষধর সর্প বা বৃশ্চিক আমার গৃহে বা শয্যাতলে আশ্রয় করিয়াছে, আমি তাহাকে বিনাশ না করিলে সে আমাকে বিনাশ করিবে। যে ব্যাঘ্র আমাকে গ্রহণ করিবার জন্য লম্ফনোদ্যত, আমি তাহাকে বিনাশ না করিলে সে আমাকে

বিনাশ করিবে। যে শত্রু আমার বধসাধনে কৃতনিশ্চয় ও উদ্যতায়ুধ, আমি তাহাকে বিনাশ না করিলে সে আমাকে বিনাশ করিবে। যে দস্যু ধৃতাস্ত্র হইয়া নিশীথে আমার গৃহে প্রবেশপূর্বক সর্বস্ব গ্রহণ করিতেছে, যদি বিনাশ ভিন্ন তাহাকে নিবারণের উপায় না থাকে, তবে তাহাকে বিনাশ করাই আমার পক্ষে ধর্মানুমত। যে বিচারকের সম্মুখে হত্যাকারিকৃত হত্যা প্রমাণিত হইয়াছে, যদি তাহার বধদণ্ড রাজনিয়োগসম্মত হয়, তবে তিনি তাঁহার বধাজ্ঞা প্রচার করিতে ধর্মতঃ বাধ্য। এবং যে রাজপুরুষের উপর বধার্হের বধের ভার আছে, সেও তাহাকে বধ করিতে বাধ্য। সেকেন্দর বা গজনবী মহম্মদ, আতিলা বা জঙ্গেজ, তৈমুর বা নাদের, দ্বিতীয় ফ্রেড্রিক্ বা নেপোলেয়ন্ পরস্ব ও পররাষ্ট্রহরণ জন্য যে অগণিত শিক্ষিত তস্কর লইয়া পররাজ্যপ্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহা লক্ষ লক্ষ হইলেও প্রত্যেকেই ধর্মতঃ বধ্য। এখানে হিংসাই ধর্ম।

পক্ষান্তরে, যে পাখীটি আকাশে উড়িয়া যাইতেছে, ভোজন জন্যই হউক বা খেলার জন্যই হউক, তাহার নিপাত অধর্ম। যে মাছিটি মিষ্টবিন্দুর অন্বেষণে উড়িয়া বেড়াইতেছে, ক্রীড়াশীল বালক যে তাহাকে ধরিয়া টিপিয়া মারিল, তাহা অধর্ম। যে মৃগ বা যে কুক্কুট তোমার আমার ন্যায় জীবনযাত্রা-নির্বাহের জন্য জগতে আসিয়াছে, উদরম্ভরী যে তাহাকে বধ করিয়া খায়, সে অধর্ম। আমরা বায়ুপ্রবাহের অন্তশ্চারী জীব; মৎস্য জলপ্রবাহের উপরিচর জীব; আমরা যে তাহাদের ধরিয়া খাই, সে অধর্ম।

তবে অহিংসা পরম ধর্ম, এ বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য এই যে, ধর্ম্য প্রয়োজন ব্যতীত যে হিংসা, তাহা হইতে বিরতিই পরম ধর্ম। নচেৎ হিংসাকারীর নিবারণ জন্য হিংসা অধর্ম নহে, বরং পরম ধর্ম। এই কথা স্পষ্টীকৃত করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলাকের ইতিহাস শুনাইলেন। তাহার স্থূল তাৎপর্য এই যে, বলাক নামে ব্যাধ প্রাণিগণের বিশেষবিনাশহেতু এক শ্বাপদকে বিনাশ করিয়াছিল, করিবামাত্র তাহার উপর "আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি নিপতিত হইতে লাগিল; অপ্সরোদিগের অতি মনোরম গীতবাদ্য আরম্ভ হইল, এবং সেই ব্যাধকে স্বর্গে সমানীত করিবার নিমিত্ত বিমান সমুপস্থিত হইল।" ব্যাধের পুণ্য এই যে, সে হিংসাকারীর হিংসা করিয়াছিল।

অহিংসা পরম ধর্ম, এই অর্থে বুঝিতে হইবে। তবে, ধর্ম্য প্রয়োজন ভিন্ন হিংসা করিবে না, একথায় একটা ভারি গোলযোগ হয়, এবং জগতে চিরকাল হইয়া আসিতেছে। ধর্ম্য প্রয়োজন কি? ধর্ম কি? Inquisition কর্তৃক মনুষ্যবধে ধর্ম্য প্রয়োজন আছে বলিয়া কোটি কোটি মনুষ্য যমপুরে প্রেরিত হইয়াছিল। ধর্মার্থেই St. Bartholomew হত্যাকাণ্ড। ধর্মাচরণ বিবেচনাতেই ক্রুসেদ্‌ওয়ালাদিগের দ্বারা পৃথিবী নরশোণিতপ্রবাহে পঙ্কিল হইয়াছিল। ধর্মবিস্তারের জন্য মুসলমানেরা লক্ষ লক্ষ মনুষ্য হত্যা করিয়াছিল। বোধ হয়, ধর্ম্য প্রয়োজন সম্বন্ধে ভ্রান্তিতে পড়িয়া মনুষ্য যত মনুষ্য নষ্ট করিয়াছে, তত মনুষ্য আর কোন কারণেই নষ্ট হয় নাই।

অর্জুনেরও এখন সেই ভ্রান্তি উপস্থিত। তিনি মনে করিয়াছেন যে, সত্যরক্ষাধর্মার্থ যুধিষ্ঠিরকে বধ করা কর্তব্য। অতএব কেবল অহিংসা পরম ধর্ম, একথা বলিলেও তাঁহার ভ্রান্তির দূরীকরণ হয় না। এই জন্য কৃষ্ণের দ্বিতীয় কথা।

সে দ্বিতীয় কথা এই যে, বরং মিথ্যাবাক্যও প্রয়োগ করা যাইতে পারে কিন্তু

কখনই প্রাণিহিংসা করা কর্তব্য নহে।* ইহার স্থূল তাৎপর্য এই যে, অহিংসা ও সত্য, এই দুইয়ের মধ্যে অহিংসা শ্রেষ্ঠ ধর্ম। ইহার অর্থ এইঃ—নানাবিধ পুণ্য কর্মকে ধর্ম বলিয়া গণনা করা যায়; যথা—দান, তপ, দেবভক্তি, সত্য, শৌচ, অহিংসা ইত্যাদি। ইহার মধ্যে সকলগুলিই সমান নহে; ইতরবিশেষ হওয়াই সম্ভব। শৌচের মাহাত্ম্য বা দানের মাহাত্ম্য কি সত্যের সঙ্গে বা অহিংসার সঙ্গে এক? যদি তাহা না হয়, যদি তারতম্য থাকে, তবে সর্বশ্রেষ্ঠ কে? কৃষ্ণ বলেন, অহিংসা। সত্যের স্থান তাহার নীচে।

আমরা পাশ্চাত্যের শিষ্য। অনেক পাঠক এই কথায় শিহরিয়া উঠিবেন। পাশ্চাত্যেরা নাকি বলিয়া থাকেন, কোনও অবস্থাতেই মিথ্যা বলা যাইতে পারে না। তা না হয় হইল; সে কথা এখন উঠিতেছে না। কিন্তু এমন কেহই বলিবেন না যে, পাশ্চাত্যদিগের মতে একজন মিথ্যাবাদী একজন হত্যাকারীর অপেক্ষা গুরুতর পাপী, অথবা মিথ্যাবাদী ও হত্যাকারী তুল্য পাপী। তাঁহারা যে তাহা বলেন না, সমস্ত ইউরোপীয় দণ্ডবিধিশাস্ত্র তাহার প্রমাণ। যদি তাই হইল, তবে এখন কৃষ্ণের সঙ্গে পাশ্চাত্যের শিষ্যগণের মতভেদের এখানে কোন লক্ষণ দেখা যায় না। এখানে কেবল পাপের তারতম্যের কথা হইতেছে। কোন অধর্মই কোন সময়ে করিতে নাই। নরহত্যাও করিতে নাই, মিথ্যা কথাও বলিতে নাই। কৃষ্ণের কথার ফল এই যে, যদি এমন অবস্থা কাহারও ঘটে যে, হয় তাহাকে মিথ্যা কথা বলিতে হইবে, নয় নরহত্যা করিতে হইবে, তবে সে বরং মিথ্যা কথা বলিবে, তথাপি নরহত্যা করিবে না। যদি এরূপ ধর্মাত্মা নীতিজ্ঞ কেহ থাকেন যে, বলেন যে বরং নরহত্যা করিবে, তথাপি মিথ্যা কথা বলিবে না, তবে আমাদের উত্তর এই যে, তাঁহার ধর্ম তাঁহাতেই থাক, এ নারকী ধর্ম যেন ভারতবর্ষে বিরলপ্রচার হয়।

কৃষ্ণের এই মত। যদি অর্জুন ইহার অনুবর্তী হইবেন, তবে ভ্রাতৃবধ-পাপ হইতে তাঁহাকে বিরত করিবার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। কিন্তু অর্জুন বলিতে পারেন, "এ ত গেল তোমার মত। কিন্তু লৌকিক ও প্রচলিত ধর্ম কি? তোমার মতই যথার্থ হইতে পারে, কিন্তু ইহা যদি প্রচলিত ধর্মানুমোদিত না হয়, তবে আমি জনসমাজে সত্যচ্যুত পাপাত্মা বলিয়া কলঙ্কিত হইব।" এজন্য কৃষ্ণ আপনার মত প্রকাশ করিয়া প্রচলিত ধর্মমত যাহা, তাহা বুঝাইতেছেন। তিনি বলিলেন, "হে ধনঞ্জয়! কুরুপিতামহ ভীষ্ম, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির, বিদুর ও যশস্বিনী কুন্তী যে ধর্মরহস্য কহিয়াছেন, আমি যথার্থরূপে তাহাই কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।" এই বলিয়া বলিলেন,

"সাধু ব্যক্তিই সত্য কথা কহিয়া থাকেন, সত্য অপেক্ষা আর কিছুই শ্রেষ্ঠ নাই।† সত্যতত্ত্ব অতি দুর্জ্ঞেয়। সত্যবাক্য প্রয়োগ করাই অবশ্য কর্তব্য।"

---

* যে বচনের উপর নির্ভর করিয়া কৃষ্ণকথিত এই ধর্মতত্ত্ব সংস্থাপিত হইতেছে, তাহার মূল সংস্কৃত উদ্ধৃত করা কর্তব্য।

"প্রাণিনামবধস্তাত সর্বজ্যায়ান্মতো মম।
অনৃতাং বা বদেদ্বাচং নতু হিংস্যাৎ কথঞ্চন॥"

পাঠক দেখিবেন, অহিংসা পরম ধর্ম, এটা কৃষ্ণবাক্যের ঠিক অনুবাদ নহে। ঠিক অনুবাদ—"আমার মতে প্রাণিগণের অহিংসা সর্ব হইতে শ্রেষ্ঠ।" অর্থগত বিশেষ প্রভেদ নাই বলিয়া "অহিংসা পরম ধর্ম" ইতি পরিচিত বাক্যই ব্যবহার করিয়াছি।

† "ন সত্যাদ্বিদ্যতে পরম্।" ইতিপূর্বে কৃষ্ণ বলিয়াছেন, "প্রাণিনামবধস্তাত

এই গেল স্থূল নীতি। তারপর বর্জ্জিত তত্ত্ব বলিতেছেন,

“কিন্তু যে স্থানে মিথ্যা সত্যস্বরূপ ও সত্য মিথ্যাস্বরূপ হয়, সে স্থলে মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করা দোষাবহ নহে।”

কিন্তু কখনও কি এমন হয়? একথাটি আবার উঠিবে, সেই সময়ে আমরা ইহার যথাসাধ্য বিচার করিব। তারপর কৃষ্ণ বলিতেছেন,

“বিবাহ, রতিক্রীড়া, প্রাণবিয়োগ ও সর্বস্বাপহরণকালে এবং ব্রাহ্মণের নিমিত্ত মিথ্যা প্রয়োগ করিলেও পাতক হয় না।”

এখানে ঘোর বিবাদের স্থল, কিন্তু বিবাদ এখন থাক। কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদে উল্লিখিতরূপ আছে। উহা একটি শ্লোকের মাত্র অনুবাদ, কিন্তু মূলে ঐ বিষয়ে দুইটি শ্লোক আছে। দুইটিই উদ্ধৃত করিতেছি;

১। প্রাণাত্যয়ে বিবাহে চ বক্তব্যমনৃতং ভবেৎ।
সর্বস্যাপহারে চ বক্তব্যমনৃতং ভবেৎ॥

২। বিবাহকালে রতিসম্প্রয়োগে প্রাণাত্যয়ে সর্বধনাপহারে।
বিপ্রস্য চার্থে হ্যনৃতং বদেত পঞ্চানৃতান্যাহুরপাতকানি॥

এই দুইটি শ্লোকের একই অর্থ; কেবল প্রথম শ্লোকটিতে ব্রাহ্মণের কথা নাই, এই প্রভেদ। এখন পাঠকের মনে এই প্রশ্ন আপনিই উদয় হইবে, একই অর্থবাচক দুইটি শ্লোকের প্রয়োজন কি?

ইহার উত্তর এই যে, এই দুইটিই অন্যত্র হইতে উদ্ধৃত—Quotation—কৃষ্ণের নিজোক্তি নহে। সংস্কৃত গ্রন্থে এমন স্থানে স্থানে দেখা যায় যে, অন্যত্র হইতে বচন ধৃত হয়, কিন্তু স্পষ্ট করিয়া বলা হয় না যে, এই বচন গ্রন্থান্তরের। এই মহাভারতীয় গীতাপর্বাধ্যায়েই তাহার উদাহরণ গ্রন্থান্তরে দিয়াছি।

আমি আন্দাজের উপর নির্ভর করিয়া বলিতেছি না, এ বচন দুইটি অন্যত্র হইতে ধৃত। দ্বিতীয় শ্লোকটি, যথা—“বিবাহকালে রতিসম্প্রয়োগে” ইত্যাদি—ইহা বশিষ্ঠের বচন। পাঠক বশিষ্ঠের ১৬ অধ্যায়ে ৩৫ শ্লোকে তাহা দেখিবেন; ইহা মহাভারতের আদিপর্বে, ৩৪১২ শ্লোকে, যেখানে কৃষ্ণের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই, সেখানেও কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হইয়া উদ্ধৃত হইয়াছে, যথা—

ন ধর্মযুক্তং বচনং হিনস্তি ন স্ত্রীষু রাজন্ন বিবাহকালে।
প্রাণাত্যয়ে সর্বধনাপহারে পঞ্চানৃতান্যাহুরপাতকানি॥

চারিটি ভিন্ন পাঁচটির কথা এখানে নাই, তথাপি বশিষ্ঠের সেই “পঞ্চানৃতান্যাহুরপাতকানি” আছে। প্রচলিত বচন সকল মুখে মুখে এইরূপ বিকৃত হইয়া যায়।

প্রথম শ্লোকটির পূর্বগামী শ্লোকের সহিত লিখিতেছি;

(ক) ভবেৎ সত্যমবক্তব্যং বক্তব্যমনৃতং ভবেৎ॥
(খ) যত্রানৃতং ভবেৎ সত্যং সত্যঞ্চাপ্যনৃতং ভবেৎ॥
(গ) প্রাণাত্যয়ে বিবাহে চ বক্তব্যমনৃতং ভবেৎ।
(ঘ) সর্বস্বস্যাপহারে চ বক্তব্যমনৃতং ভবেৎ॥

সর্বজ্যায়াস্মতো মম।” এই দুইটি কথা পরস্পরবিরোধী। তাহার কারণ, একটি কৃষ্ণের মত, আর একটি ভীষ্মাদিকথিত প্রচলিত ধর্মনীতি। •

এক্ষণে মহাভারতের সভাপর্ব হইতে একটি (১৩৮৪৪) শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি—কৃষ্ণের সহিত সেখানে কোন সম্বন্ধ নাই।

(চ) প্রাণান্তিকে বিবাহে চ বক্তব্যমনৃতং ভবেৎ।

(ছ) অনৃতেন ভবেৎ সত্যং সত্যেনৈবানৃতং ভবেৎ॥

পাঠক দেখিবেন, (গ) ও (চ), আর (খ) ও (ছ) একই। শব্দগুলিও প্রায় একই। অতএব ইহাও প্রচলিত পুরাতন বচন।

ইহা কৃষ্ণের মত নহে; নিজের অনুমোদিত নীতি বলিয়াও তাহা বলিতেছেন না; ভীষ্মাদির কাছে যাহা শুনিয়াছেন, তাহাই বলিতেছেন; নিজের অনুমোদিত হউক বা না হউক, কেন তিনি অর্জুনকে ইহা শুনাইতে বাধ্য, তাহা বলিয়াছি। সুতরাং কৃষ্ণচরিত্রে এ নীতির যাথার্থ্যাযাথার্থ্য বিচারে কোন প্রয়োজন হইতেছে না।

কিন্তু আসল কথা বাকি আছে। আসল কথা, কৃষ্ণের নিজের মতও এই যে, অবস্থাবিশেষে সত্য মিথ্যা হয় এবং মিথ্যা সত্য হয় এবং সে সকল স্থানে মিথ্যাই প্রযোক্তব্য। একথা তিনি পরে বলিতেছেন।

প্রথমে বিচার্য, কখনও কি মিথ্যা সত্য হয় এবং সত্য মিথ্যা হয়? ইহার স্থূল উত্তর এই যে, যাহা ধর্মানুমোদিত তাহাই সত্য, আর যাহা অধর্মের অনুমোদিত, তাহাই মিথ্যা। ধর্মানুমোদিত মিথ্যা নাই, এবং অধর্মানুমোদিত সত্য নাই। তবে সত্যাসত্য মীমাংসা ধর্মাধর্ম মীমাংসার উপর নির্ভর করিতেছে। অতএব শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে ধর্মতত্ত্ব নির্ণয় করিতেছেন। কথাগুলাতে গীতার উদার নীতির গম্ভীর শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। বলিতেছেন,

"ধর্ম ও অধর্ম তত্ত্ব নির্ণয়ের বিশেষ লক্ষণ নির্দিষ্ট আছে। কোন কোন স্থলে অনুমান দ্বারাও নিতান্ত দুর্বোধ ধর্মের নির্ণয় করিতে হয়।"

ইহার অপেক্ষা উদার ইউরোপেও কিছু নাই। তারপর—

"অনেকে শ্রুতিরে ধর্মের প্রমাণ বলিয়া নির্দেশ করেন। তাহাতে আমি দোষারোপ করি না; কিন্তু শ্রুতিতে সমস্ত ধর্মতত্ত্ব নির্দিষ্ট নাই; এইজন্য অনেক স্থলে অনুমান দ্বারা ধর্ম নির্দিষ্ট করিতে হয়।"

এই কথাটা লইয়া আজিও সভ্যজগতে বড় গোলমাল। যাঁহারা বলেন যে যাহা দৈবোক্তি, বেদই হউক, বাইবেলই হউক, কোরাণই হউক—তাহাতে যাহা আছে, তাহাই ধর্ম, তাহার বাহিরে ধর্ম কিছুই নাই—তাঁহারা আজিও বড় বলবান্। তাঁহাদের মতে ধর্ম দৈবোক্তিনির্দিষ্ট, অনুমানের বিষয় নহে। একথা মনুষ্যজাতির উন্নতির পথে বড় দুরুত্তীর্য কণ্টক। আমাদের দেশের কথা দূরে থাকুক, ইউবোপেও আজিও এই মত উন্নতির পথ রোধ করিতেছে। আমাদের দেশের অবনতির ইহা একটি প্রধান কারণ। আজিও ভারতবর্ষের ধর্মজ্ঞান বেদ ও মনুযাজ্ঞবল্ক্যাদি স্মৃতির দ্বারা নিরুদ্ধ;—অনুমানের পথ নিষিদ্ধ। অতি দূরদর্শী মনুষ্যাদর্শ শ্রীকৃষ্ণ লোকোন্নতির এই বিষম ব্যাঘাত সেই অতি প্রাচীনকালেও দেখিয়াছিলেন। এখন হিন্দুসমাজের ধর্মজ্ঞান দেখিয়া বিষণ্ন মনে সেই শ্রীকৃষ্ণেরই শরণ লইতে ইচ্ছা করে।

কিন্তু অনুমানের একটি মূল চাহি। যেমন অগ্নি ভিন্ন ধূমোৎপত্তি হয় না, এই মূলের উপর অনুমান করি যে, সম্মুখস্থ ধূমবান্ পর্বত বহ্নিমান্ও বটে, তেমনই একটা লক্ষণ চাহি যে, তাহা দেখিলেই বুঝিতে পারিব যে, এই কর্মটা ধর্ম বটে। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার লক্ষণ নির্দিষ্ট করিতেছেন।

"ধর্ম প্রাণিগণকে ধারণ করে বলিয়া ধর্মনামে নির্দিষ্ট হইয়াছে। অতএব যদ্দ্বারা প্রাণিগণের রক্ষা হয়, তাহাই ধর্ম।"

এই হইল কৃষ্ণকৃত ধর্মের লক্ষণ-নির্দেশ। একথাটায় এখনকার Herbert Spencer, Bentham, Mill ইতি সম্প্রদায়ের শিষ্যগণ কোনপ্রকার অমত করিবেন না জানি। কিন্তু অনেকে বলিবেন, এ যে ঘোরতর হিতবাদ—বড় Utilitarian রকমের ধর্ম। বড় Utilitarian রকম বটে, কিন্তু আমি গ্রন্থান্তরে বুঝাইতেছি যে, ধর্মতত্ত্ব হিতবাদ হইতে বিযুক্ত করা যায় না; জগদীশ্বরের সার্বভৌমিকত্ব এবং সর্বময়তা হইতেই ইহাকে অনুমিত করিতে হয়। সঙ্কীর্ণ খ্রীষ্টধর্মের সঙ্গে হিতবাদের বিরোধ হইতে পারে, কিন্তু যে হিন্দুধর্মে বলে যে, ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন, হিতবাদ সে ধর্মের প্রকৃত অংশ। এই কৃষ্ণবাক্যই যথার্থ ধর্মলক্ষণ।

পূর্বে বুঝাইয়াছি, যাহা ধর্মানুমোদিত তাহাই সত্য; যাহা ধর্মানুমোদিত নহে, তাহাই মিথ্যা। অতএব যাহা সর্বলোকহিতকর, তাহাই সত্য, যাহা লোকের অহিতকর, তাহাই মিথ্যা। এই অর্থে, যাহা লৌকিক সত্য, তাহা ধর্মতঃ মিথ্যা হইতে পারে; এবং যাহা লৌকিক মিথ্যা, তাহা ধর্মতঃ সত্য হইতে পারে। এইরূপ স্থলে মিথ্যাও সত্যস্বরূপ এবং সত্যও মিথ্যাস্বরূপ হয়।

উদাহরণস্বরূপ কৃষ্ণ বলিতেছেন, "যদি কেহ কাহারে বিনাশ করিবার মানসে কাহারও নিকট তাহার অনুসন্ধান করে, তাহা হইলে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তির মৌনাবলম্বন করাই উচিত। যদি একান্তই কথা কহিতে হয়, তবে সে স্থলে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করাই কর্তব্য। ঐরূপ স্থলে মিথ্যা সত্যস্বরূপ হয়।"

এই প্রস্তাব উত্থাপিত করিবার পূর্বেই, কৃষ্ণ কৌশিকের উপাখ্যান অর্জুনকে শুনাইয়া ভূমিকা করিয়াছিলেন। সে উপাখ্যান এই,—

"কৌশিক নামে এক বহুশ্রুত তপস্বিশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ গ্রামের অনতিদূরে নদীগণের সঙ্গমস্থানে বাস করিতেন। ঐ ব্রাহ্মণ সর্বদা সত্য বাক্য প্রয়োগরূপ ব্রত অবলম্বনপূর্বক তৎকালে সত্যবাদী বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। একদা কতকগুলি লোক দস্যুভয়ে ভীত হইয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিলে, দস্যুরাও ক্রোধভরে যত্নসহকারে সেই বনে তাহাদিগকে অন্বেষণ করত সেই সত্যবাদী কৌশিকের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিল, হে ভগবন্! কতকগুলি ব্যক্তি এই দিকে আগমন করিয়াছিল, তাহারা কোন্ পথে গমন করিয়াছে, যদি আপনি তাহা অবগত থাকেন, তাহা হইলে সত্য করিয়া বলুন। কৌশিক দস্যুগণকর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া সত্যপালনার্থে তাহাদিগকে কহিলেন, কতকগুলি লোক এই বৃক্ষ, লতা ও বৃক্ষপরিবেষ্টিত অটবীমধ্যে গমন করিয়াছে। তখন সেই ক্রূরকর্মা দস্যুগণ তাহাদের অনুসন্ধান পাইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ ও বিনাশ করিল। সূক্ষ্মধর্মানভিজ্ঞ সত্যবাদী কৌশিকও সেই সত্য-বাক্যজনিত পাপে লিপ্ত হইয়া ঘোর নরকে নিপতিত হইলেন।"

এস্থলে ইহা অভিপ্রেত যে, কৌশিক অবগত হইয়াছিলেন যে, ইহারা দস্যু; পলায়িত ব্যক্তিগণের অনিষ্ট ইহাদের উদ্দেশ্য,—নহিলে তাঁহার কোন পাপই নাই। যদি তাহা অবগত ছিলেন, তবে তিনি কৃষ্ণের মতে সত্যকথনের দ্বারা পাপাচরণ করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে ঘোরতর মতভেদ। আমাদের প্রতীচ্য শিক্ষকদিগের নিকট শিখিয়াছি যে, সত্য নিত্য, কখনও মিথ্যা হয় না, এবং কোনও সময়ে মিথ্যা প্রযোক্তব্য নহে। সুতরাং কৃষ্ণের মত শিক্ষিত

সম্প্রদায়ের নিকট নিন্দিতই হইতে পারে। যাঁহারা ইহার নিন্দা করিবেন (আমি ইহার সমর্থনও করিতেছি না), তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, কৌশিকের এ অবস্থায় কি করা উচিত ছিল। সহজ উত্তর, মৌনাবলম্বন করা উচিত ছিল। সে কথা ত কৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন—সে বিষয়ে মতভেদ নাই। যদি দস্যুরা মৌনী থাকিতে না দেয়? পীড়নাদির দ্বারা উত্তর গ্রহণ করে? কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, পীড়ন ও মৃত্যু স্বীকার করিয়াও কৌশিকের মৌন রক্ষা করা উচিত ছিল। তাহাতেও আমরা সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। তবে জিজ্ঞাস্য এই, ঈদৃশ ধর্ম পৃথিবীতে সাধারণতঃ চলিবার সম্ভাবনা আছে কি না? ইহাতে সাংখ্য-প্রবচনকারের একটি সূত্র আমাদের মনে পড়িল। মহর্ষি কপিল বলিয়াছেন, "নাশক্যোপদেশবিধিরুপদিষ্টেঽপ্যনুদেশঃ।"* এরূপ ধর্মপ্রচার চেষ্টা নিষ্ফল বলিয়া বোধ হয়। যদি সফল হয়, মানবজাতির পরম সৌভাগ্য।

কথাটা এখানে ঠিক তাহা নয়। কথাটা এই যে, যদি একান্তই কথা কহিতে হয়,

অবশ্যং কূজিতব্যে বা শঙ্কেরন্ বাপ্যকূজতঃ।

তাহা হইলে কি করিবে? সত্য বলিয়া জ্ঞানতঃ নরহত্যার সহায়তা করিবে? যিনি এইরূপ ধর্মতত্ত্ব বুঝেন, তাঁহার ধর্মবাদ যথার্থই হউক, অযথার্থই হউক, নিতান্ত নৃশংস বটে।

প্রতিবাদকারী বলিতে পারেন যে, কৃষ্ণোক্ত এই নীতির একটি ফল এমন হয় যে, হত্যাকারীর জীবন রক্ষার্থ মিথ্যা শপথ করাও ধর্ম। যিনি এরূপ আপত্তি করিবেন, তিনি এই সত্যতত্ত্ব কিছুই বুঝেন নাই। হত্যাকারীর দণ্ড মনুষ্যজীবন রক্ষার্থ নিতান্ত প্রয়োজনীয়, নহিলে যে যাহাকে পাইবে, মারিয়া ফেলিবে। অতএব হত্যাকারীর দণ্ডই ধর্ম; এবং তাহার রক্ষার্থ যে মিথ্যা বলে, সে অধর্ম করে।

কৃষ্ণোক্ত এই সত্যতত্ত্ব নির্দোষ এবং মনুষ্যসাধারণের অবলম্বনীয় কি না, তাহা আমি এক্ষণে বলিতে প্রস্তুত নহি। তবে কৃষ্ণচরিত্র বুঝাইবার জন্য উহা পরিস্ফুট করিতে আমি বাধ্য। কিন্তু ইহাও বলিতে আমি বাধ্য যে, পাশ্চাত্যেরা যে কারণে বলেন যে, সত্য সকল সময়েই সত্য, কোন অবস্থাতেই পরিহার্য নহে, তাহার মূলে একটি গুরুতর কথা আছে। কথাটা এই যে, ইহাই যদি ধর্ম—সত্য যেখানে মনুষ্যের হিতকারী, সেইখানেই ধর্ম, আর যেখানে মনুষ্যের হিতকারী নয়, সেখানে অধর্ম, ইহাই যদি ধর্ম হয়, তাহা হইলে মনুষ্যজীবন এবং মনুষ্যসমাজ অতিশয় বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে,—যে লোকহিত তোমার উদ্দেশ্য, তাহা ডুবিয়া যায়। অবস্থাবিশেষ উপস্থিত হইলে, সত্য অবলম্বনীয় বা মিথ্যা অবলম্বনীয়, একথার মীমাংসা কে করিবে? যে সে মীমাংসা করিতে বসিলে, মীমাংসা কখনও ধর্মানুমোদিত হইতে পারে না। শিক্ষা, জ্ঞান, বুদ্ধি অনেকেরই অতি সামান্য; কাহারও সম্পূর্ণ নহে। বিচারশক্তি অধিকাংশেরই আদৌ অল্প, তার উপর ইন্দ্রিয়ের বেগ, স্নেহমমতার বেগ, ভয়, লোভ, মোহ ইত্যাদির প্রকোপ। সত্য নিত্যপালনীয়, এরূপ ধর্মব্যবস্থা না থাকিলে মনুষ্য-জাতি সত্যশূন্য হইবার সম্ভাবনা।

প্রাচীন হিন্দু ঋষিরা যে তাহা বুঝিতেন না, এমত নহে। বুঝিয়াই তাঁহারা

---

* প্রথম অধ্যায়, ৯ সূত্র।

বিশেষ করিয়া বিধান করিয়া দিয়াছেন, কোন্ কোন্ সময়ে মিথ্যা বলা যাইতে পারে। প্রাণাত্যয়ে ইত্যাদি সেই বিধি আমরা উদ্ধৃত করিয়াছি। মনু, গোতম প্রভৃতি ঋষিদিগেরও মতও সেই প্রকার। তাঁহারা যে কয়টি বিশেষ বিধি বলিয়াছেন, তাহা ধর্মানুমত কি না, তাহার বিচারে আমার প্রয়োজন নাই। কৃষ্ণকথিত সত্যতত্ত্ব পরিস্ফুট করাই আমার উদ্দেশ্য। কৃষ্ণও আধুনিক ইউ-রোপীয়দিগের ন্যায় বুঝিয়াছিলেন যে, বিশেষ বিধি ব্যতীত, এই সাধারণ বিধি কার্যে পরিণত করা সাধারণ লোকের পক্ষে অতি দুরূহ। কিন্তু তাঁহার বিবেচনায় প্রাণাত্যয়ে প্রভৃতি কয়েকটি বিশেষ অবস্থা নির্দেশ করিলেই লোককে ধর্মানুমত সত্যাচরণ বুঝান যায় না। তিনি তৎপরিবর্তে কি জন্য এবং কিরূপ অবস্থায় সাধারণ বিধি উল্লঙ্ঘন করা উচিত, তাহাই বলিতেছেন। আমরা তাহা স্পষ্টীকৃত করিতেছি।

দান, তপ, শৌচ, আর্জব, সত্য প্রভৃতি অনেকগুলি কার্যকে ধর্ম বলা যায়। ইহার সকলগুলিই সাধারণতঃ ধর্ম, আবার সকলগুলিই অবস্থাবিশেষে অধর্ম। অনুপযুক্ত প্রয়োগ বা ব্যবহারই অধর্ম। দান সম্বন্ধে উদাহরণ প্রয়োগপূর্বক বলিতেছেন, "সমর্থ হইলেও চৌরাদিকে ধনদান করা কদাপি কর্তব্য নহে। পাপাত্মাদিগকে ধন দান করিলে অধর্মাচরণ নিবন্ধন দাতাকেও নিতান্ত নিপীড়িত হইতে হয়।" সত্য সম্বন্ধেও সেইরূপ। শ্রীকৃষ্ণ তাহার যে দুইটি উদাহরণ দিয়াছেন, তাহার একটি উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি, আর একটি এই,—

"যে স্থলে মিথ্যা শপথ দ্বারাও চৌরসংসর্গ হইতে মুক্তিলাভ হয়, সে স্থলে মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করাই শ্রেয়ঃ। সে মিথ্যা নিশ্চয়ই সত্যস্বরূপ হয়।"

ইহা ভিন্ন প্রচলিত ধর্মশাস্ত্র হইতে প্রাণাত্যয়ে বিবাহে ইত্যাদি কথা পুনরুক্ত হইয়াছে।

কৃষ্ণকথিত সত্যতত্ত্ব এইরূপ। ইহার স্থূল তাৎপর্য এইরূপ বুঝা গেল যে,

১। যাহা ধর্মানুমোদিত, তাহাই সত্য, যাহা ধর্মবিরুদ্ধ, তাহা অসত্য।

২। যাহাতে লোকের হিত, তাহাই ধর্ম।

৩। অতএব যাহাতে লোকের হিত, তাহাই সত্য। যাহা তদ্বিরুদ্ধ, তাহাই অসত্য।

৪। এইরূপ সত্য সর্বদা সর্বস্থানে প্রযোক্তব্য।

কৃষ্ণভক্ত বলিতে পারেন যে, ইহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সত্যতত্ত্ব কোথাও কথিত হইয়াছে, এমন যদি দেখাইতে পার, তবে আমরা কৃষ্ণের মত পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি। যদি তাহা না পার, তবে ইহাই আদর্শ মনুষ্যোচিত বাক্য বলিয়া স্বীকার কর।

উপসংহারে আমার ইহাও বক্তব্য যে, যদ্দ্বারা লোকরক্ষা বা লোকহিত সাধিত হয়, তাহাই ধর্ম, আমরা যদি ভক্তিসহকারে এই কৃষ্ণোক্তি হিন্দুধর্মের মূলস্বরূপ গ্রহণ করিতে পারি, তাহা হইলে হিন্দুধর্মের ও হিন্দুজাতির উন্নতির আর বিলম্ব থাকে না। তাহা হইলে, যে উপধর্মের ভস্মরাশির মধ্যে পবিত্র এবং জগতে অতুল্য হিন্দুধর্ম প্রোথিত হইয়া আছে, তাহা অনল্পকালে কোথায় উড়িয়া যায়। তাহা হইলে শাস্ত্রের দোহাই দিয়া কুক্রিয়া, অনর্থক সামর্থ্যব্যয় ও নিষ্ফল কালাতিপাত দেশ হইতে দূরীভূত হইয়া সৎকর্ম ও সদনুষ্ঠানে হিন্দুসমাজ প্রভাম্বিত হইয়া উঠে। তাহা হইলে ভণ্ডামি, জাতি-মারামারি, পরস্পরের বিদ্বেষ ও অনিষ্টচেষ্টা আর থাকে না। আমরা মহতী

কৃষ্ণকথিতা নীতি পরিত্যাগ করিয়া শূলপাণি ও রঘুনন্দনের পদানত—লোকহিত পরিত্যাগ করিয়া তিথিতত্ত্ব, মলমাসতত্ত্ব প্রভৃতি আটাইশ তত্ত্বের কচকচিতে মন্ত্রমুগ্ধ। আমাদের জাতীয় উন্নতি হইবে ত কোন্ জাতি অধঃপাতে যাইবে? যদি এখনও আমাদের ভাগ্যোদয় হয়, তবে আমরা সমস্ত হিন্দু একত্র হইয়া, "নমো ভগবতে বাসুদেবায়" বলিয়া কৃষ্ণপাদপদ্মে প্রণাম করিয়া, তদুপদিষ্ট এই লোকহিতাত্মক ধর্ম গ্রহণ করিব।* তাহা হইলে নিশ্চিতই আমরা জাতীয় উন্নতি সাধিত করিতে পারিব।

॥ সাত ॥

বঙ্কিম

ছোটবেলার ঐ একটি ঘটনাতে—তাঁর সঙ্গে মতবিরোধ প্রকাশের জন্য রবীন্দ্রের বক্তৃতা শুনতে যাওয়ায় বঙ্কিম নামের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়। একটু বড় হলে কাশিয়াবাগানে তাঁর সব বইয়ের মধ্যে 'ইন্দিরা' বইখানি প্রথমে পড়ার রসভোগ করি। ক্রমে ক্রমে আর সব বই একে একে পড়তে অনুমতি পেলুম। তাঁর প্রতিভাচ্ছটা হৃদয় আলোকিত করতে থাকল।

একবার একটা ১১ই মাঘের উৎসবে বাড়ির ছেলেমেয়ে-গায়নমণ্ডলী আমরা গান গাইতে গাইতে হঠাৎ অনুভব করলুম আমাদের পিছনে একটা নাড়াচাড়া সাড়াশব্দ পড়ে গেছে। কে এসেছেন? পিছন ফিরে ভিড়ের ভিতর হঠাৎ একটি চেহারা চোখে পড়ল—দীর্ঘনাসা, তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল দৃষ্টি, মুখময় একটা সহাস্য জ্যোতির্ময়তা। জানলুম তিনি বঙ্কিম। যে বঙ্কিম এতদিন তাঁর বইয়ে রচনামূর্তিতে আমাকে পেয়ে বসেছিলেন আজ পেলুম তাঁকে প্রকৃতির তুলিতে হাড়েমাসে রঞ্জনা মূর্তিতে।

তারপরে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ সংস্পর্শ আনলে আমার লেখা পড়ে তাঁর চিঠি। সে চিঠি ত যে সে চিঠি নয়। তার দুচারটি মাত্র সেণ্টেন্স বঙ্কিমেরই সেণ্টেন্স বটে!

"ভারতী"তে আমার আঠার উনিশ বৎসরের লেখা 'রতিবিলাপ' ও

---

* বেন্থামের কথা ইংলণ্ড শুনিল—কৃষ্ণের কথা ভারতবর্ষ শুনিবে না?

'মালবিকাগ্নিমিত্র' পড়ে তাঁর লেখা চিঠি। সে চিঠি সাহিত্য দায়রায় দণ্ডায়মান একজন নবীনের উপর তাঁর রায়—বা তাকে দুই বাহু বাড়িয়ে আদর করে নেওয়া। যদিও রবিমামার চিঠিতে তাঁরও appreciation ব্যক্ত হয়েছিল, কিন্তু তাঁর চেয়েও সেদিন সাহিত্যসম্রাট ও সাহিত্যের ন্যায়াধীশ বঙ্কিমের রায়ে নিজেকে বেশি চরিতার্থ মনে করলুম। এই দুজনের অভিমত আমার সাহিত্যজীবনে আনন্দের যাত্রাপথে পর্যাপ্ত পাথেয় হল। কিন্তু হায়! এমন হাত দুটির চিঠিগুলি রক্ষা করে—সাহিত্যিক মিউজিয়মে সেগুলি উপঢৌকন দেওয়ার সৌভাগ্য আমার হল না। আমার জীবন-নিয়ন্ত্রিণী দেবী ভগবতীর নির্দেশ হল—"খেয়ে নে, যত পারিস আনন্দ, তাতে পুষ্ট হয়ে এগিয়ে চল, জমা থাকবে না কিছু।"

পঞ্জাবের পোলিটিকাল হোমাগ্নিতে আমাব সব সঞ্চিত সাধের চিঠি-পত্রগুলি ভস্মসাৎ হল। একটা ধরপাকড়ের আতঙ্কের দিনে একদিন বাড়িতে আমার অনুপস্থিতির সুযোগে আমাকে নিরাপদ করার শুভ ইচ্ছায় আমার যত কিছু বাঙলা চিঠিপত্র প্রবন্ধাদি—এমন কি বাক্সে রাখা ইংরেজি চিঠিগুলিও—কেম্ব্রিজ-কবি মনোমোহন ঘোষের কাব্যরসে সরস, সাধু তীর্থরামের দার্শনিক ও কথঞ্চিৎ স্বদেশী রসসঙ্কুল এবং জাস্টিস উড্রফের অপূর্ব তন্ত্রদৃষ্টি-উদ্ভিন্ন সমুন্নত তথ্যময় এক এক তাড়া চিঠি আমার অজ্ঞাতেই হিতৈষী আত্মীয় সুহৃদেরা অগ্নিদেবতাকে উৎসর্গ করলেন। পঞ্জাবে আমার সারাটা বৈবাহিকজীবনই প্রায় যুদ্ধের ক্যাম্প লাইফবৎ ছিল। আগে চলা ও পিছনের সব কিছু পুড়িয়ে যাওয়া।

শ্রীশ মজুমদার প্রভৃতি বন্ধুদের কাছে বঙ্কিম আমার লেখাগুলি সম্বন্ধে নাকি নিজের সবিস্ময় অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন—তা তাঁদের লিখিত বঙ্কিমের জীবন-প্রসঙ্গে লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু বঙ্কিমের লিপি আর অন্যের লিপিতে অনেক তফাৎ। বঙ্কিমের লিপিখানি ছিল পুরো বঙ্কিমী ঠাটের সাহিত্যের একখানি হীরের কুচি। বিদূষক সম্বন্ধে আমার মন্তব্যের সঙ্গে তাঁর মতের মিল হয়নি। তার উল্লেখ করে "গরীব বিদূষকের" পক্ষ নিয়ে তাঁর সরস লেখনী দুই এক ছত্রে কি হাস্যের ছটাই তুলেছিল। তাই বলছি তাঁর চিঠিখানি ছিল একটি সাহিত্যিক ক্ষুদ্র রসকুম্ভ। পলিটিক্স-দানবী সাহিত্য-দেবীর সঙ্গে আড়ি করে তাঁর ঘর-সাজান একটি সুশোভন কারুবস্তুকে ফেলে দিলে বিনাশের হুতাশন-গর্ভে।

বঙ্কিমের চিঠির সাথী হয়ে এসেছিল সেদিন তাঁর নিজের এক সেট

বই উপহার—অপ্রত্যাশিত স্নেহ-নিদর্শন। তাঁর হস্তলিপিযুক্ত সে বই-গুলিও রাখতে পারিনি শেষ পর্যন্ত। বঙ্কিম-রসলোলুপ পঞ্জাব-প্রবাসী বাঙালী বন্ধু ও আগন্তুকেরা সেগুলি আমার লাইব্রেরীতে দেখে ধার চাইতেন পড়ার জন্যে। বই ধার নিয়ে ফিরিয়ে দেন কটা লোকে সেটার হিসেব কেউ করেছেন? এবিষয়ে দেশকাল জাতিভেদ নেই। প্রসিদ্ধ ডাক্তার কর্নেল ডেন্‌হাম হোয়াইটের পত্নীর কাছে গল্প শুনি তাঁদের এক বন্ধুর কবরের উপর এই স্মৃতিলিপি খোদিত হয়েছিল—"He returned books" —"তিনি বই ফিরিয়ে দিতেন।" আমার কাছ থেকে বঙ্কিমের বই পড়তে নেওয়া কোন বন্ধুই তাঁদের কবরে ঐ স্মৃতিলিপি খোদিত হওয়ার যোগ্যতা দেখাননি। কাজেই বইগুলি একে একে আমার হস্তচ্যুত হতে হতে একেবারে অন্তর্ধান হল।

চিঠি ও বই উপহারের পর তিনি আমন্ত্রিত হয়ে এলেন একদিন আমাদের বাড়িতে। মানুষ বঙ্কিমের সঙ্গে আমাদের সংস্পর্শ আরম্ভ হল। মনে পড়ে তিনি চা-ভক্ত ছিলেন, আর আমার পিতা ছিলেন চায়ের একজন মর্মজ্ঞ। আমাদের বাড়ির চা বঙ্কিমের সুস্বাদু বোধ হল। তার পরদিন সেই চায়ের এক প্যাকেট এক গোচ্ছা গোলাপ ফুলের সঙ্গে তাঁর কাছে উপঢৌকন গেল। কোথায় বঙ্কিমের এক সেট বই—আর কোথায় দার্জিলিংয়ের এক প্যাকেট চা। কিন্তু দুইয়েরই পশ্চাতে প্রেরক ছিল যে দুটি ভাব—স্নেহ ও ভক্তি—তারা বোধ হয় সমানই অমূল্য।

তিনি সেদিন আমায় ফরমাস করে গিয়েছিলেন তাঁর "সাধের তরণী" গানটিতে সুর বসাতে। থিয়েটারে দেওয়া সুর তাঁর পছন্দ হয়নি বললেন। সেটা শুনতে এলেন আর একদিন—শুনে খুব খুশী হয়ে গেলেন। বঙ্কিমের ফরমাসী এই গানের স্বরলিপি "শতগান" গ্রন্থে দেওয়া আছে।

তারপরে আমাদের—আমার মাকে ও আমাকে—দিদি তখন বিয়ে হয়ে নিজের বাড়িতে থাকেন—নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গেলেন তাঁর বাড়ি একদিন। তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত হল। বঙ্কিমের স্ত্রীর সহিত বা তাঁর সম্পর্কীয় কথায়বার্তায় একটি সুন্দর প্রীতিময় হাসিকৌতুকের ঢেউ খেলিয়ে যেত। আমরা যেন তাঁর নভেলেরই একটা দৃশ্যের মধ্যে পড়ে যেতুম। দুই দৌহিত্র দিব্যেন্দু ও পূর্ণেন্দুর সঙ্গে সপত্নীক বঙ্কিমের শুভাগমন অনেকবারই হতে থাকল আমাদের কাশিয়া-বাগান বাগানবাড়িতে।

যে বাড়িতে শুধু বঙ্কিমের নয়, আমার ভক্তির টানে বিদ্যাসাগর

মশায়ের পদধূলিও মাঝে মাঝে পড়তে থাকল, যে বাড়িতে আমার পিতা-মাতার থিয়সফি নিষ্ঠার দরুণ মাদাম ব্লাভাটস্কি ও কর্নেল অল্‌কটের প্রায়ই গতিবিধি হতে লাগল, যে বাড়ি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, আশুতোষ চৌধুরী, লোকেন পালিত ও অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবী-সহ মাতুলকুলের আবালবৃদ্ধবনিতা প্রায় সমস্ত আত্মীয়-আত্মীয়ার স্মৃতিভারে নমিত ছিল —সে বাড়ি আজ গুঁড়ো হয়ে রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীটের ধূলায় ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। সে বাগানবাড়ির বকুলবীথি, পুকুর চাঁদনি ও ফলফুলের উপবনে যোড়াসাঁকোর শহুরে ছেলেমেয়েদের নতুন নতুন প্রাকৃতিক আবিষ্কারের বিস্ময়, পাড়ার বৌঝিদের মল ঝমঝম করে খিড়কি দরজা দিয়ে জল তুলতে আসা, তার পুকুরে কবি রবির সাঁতারকাটা ও ঘাটে উঠে কল্পনার বীণার ঝঙ্কারে নতুন নতুন কবিতা ও গান ফোটান, সে বাড়ির তেতালার ছাদের ঘরে বড়মামার প্রজ্ঞাঘন জীবনের অনুকূল নীরব প্রশান্ততা—এই সবই কর্পোরেশনের স্টীম রোলারের নীচে পড়ে চিরকালের জন্যে গেছে অন্তর্হিত হয়ে।

বঙ্কিমের স্মৃতি প্রসঙ্গে "বন্দে মাতরম্" গান ও মন্ত্রের স্মৃতি ভেসে না উঠে যায় না। সে গান বঙ্কিম-ভক্তিতে ডোবা আমার প্রাণে প্রথম ফোটেনি। তার ফোটানতে ছিল রবীন্দ্রের হাত। জীবনের প্রথম দিকে কাব্য বা সঙ্গীতের রসগ্রাহিতায় রবীন্দ্রের আত্মপর বিচার ছিল না। যে কবির যেটি ভাল লাগত সেটিতে নিজের সুর বসিয়ে, গেয়ে ও গাইয়ে তার প্রচার করতেন। কোন কোন বৈষ্ণবপদাবলীতে, যেমন, "ভরা বাদর, মাহ ভাদর" এবং বিহারী চক্রবর্তীর দু-চারটি গানেও তাঁরই সুর দেওয়া "গাছে ফুল শোভা যেমন", "পাগল মানুষ চেনা যায়", "বুঝতে নারি নারী কি চায়" ইত্যাদি, এমন কি "বাল্মীকি প্রতিভায়" বিহারী চক্রবর্তী রচিত একটি গান একেবারে সশরীরে সন্নিবিষ্ট।

রবীন্দ্রনাথই "বন্দে মাতরম্"-এর প্রথম সুর বসিয়েছিলেন। তাঁর দেওয়া সুরে ঐ দুটি পদে গানটি সর্বত্র চলিত হল। একদিন মাতুল আমায় ডেকে বললেন—"তুই বাকিটুকুতে সুর দিয়ে ফেল্ না।" ওরকম ভার মাঝে মাঝে আমায় দিতেন। তাঁর আদেশে "সপ্তকোটিকণ্ঠ কলকলনিনাদ করালে" থেকে শেষ পর্যন্ত ভাবের সঙ্গে ও গোড়ার সুরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সুর দিয়ে ফুটিয়ে নিলুম। দুই একটা জাতীয় উৎসবে সমস্বরে বহুকণ্ঠে বহুজনকে গাইতেও শেখালুম। সেই থেকে সভাসমিতিতে সমস্তটাই গাওয়া হতে থাকল।

"বন্দে মাতরম্" শব্দটি মন্ত্র হল সব প্রথম যখন মৈমনসিংহের সুহৃদ সমিতি আমাকে স্টেশন থেকে তাদের সভায় প্রোসেশন করে নিয়ে যাবার সময় ঐ শব্দ দুটি হুংকার করে করে যেতে থাকল। সেই থেকে সারা বাঙলায় এবং ক্রমে ক্রমে সারা ভারতবর্ষে ঐ মন্ত্রটি ছড়িয়ে পড়ল—বিশেষ করে পূর্ববঙ্গে যখন গবর্নর সাহেবের অত্যাচার আরম্ভ হল আহিমালয়-কুমারিকা পর্যন্ত ঐ বোলটি ধরে নিলে।

আমার বিয়ের পর গোখলের সভাপতিত্বে বেনারস কংগ্রেসে প্যাণ্ডালের দোতলায় মেয়েদের মঞ্চে আমি উপবিষ্ট ছিলুম। আমার পাশে ছিলেন লেডি অবলা বসু। হঠাৎ সভা থেকে গোখলের কাছে অনুরোধ গেল আমাকে দিয়ে "বন্দে মাতরম্" গাওয়ানর জন্যে। গোখলে পড়লেন বিপদে। তার কিছু আগে বাঙলাদেশে কোথাও কোথাও ম্যাজিস্ট্রেটদের দ্বারা "বন্দে মাতরম্" সভাসমিতিতে গাওয়া নিষিদ্ধ হয়েছে। তিনি সাবধানপন্থী। গবর্নমেণ্টের সঙ্গে ভাব রেখে কাজ করতে চান, গবর্নমেণ্টের আদেশের বিরুদ্ধে কিছু করতে চান না। কিন্তু কি করবেন? ভারতের সর্বপ্রদেশ থেকে সমাগত প্রতিনিধিদের "বন্দে মাতরম্" শোনার তীব্র ইচ্ছা কিছুতেই নিরোধ করতে পারলেন না। তখন গোখলে আমার কাছে একটি ক্ষুদ্র লিপি পাঠালেন গাইতে অনুরোধ করে—সঙ্গে সঙ্গে লিখলেন,—সময় সংক্ষেপ, সুতরাং দীর্ঘগানের সবটা না গেয়ে ছেঁটে গাই যেন। কোন্ অংশটা ছাঁটা তাঁর অভিপ্রেত ছিল জানি নে, আমি মাঝখানে একটুখানি ছেঁটে চট করে "সপ্ত কোটির" স্থলে "ত্রিংশ কোটি" বলে সমগ্রটা গাওয়ারই ফল শ্রোতাদের কাছে ধরে দিলুম, তাঁদের প্রাণ আলোড়িত হয়ে উঠল। ভারতের প্রান্ত প্রান্ত থেকে সমাসীন দেশভক্তদের মধ্যে আজও যাঁরা জীবিত আছেন—সেদিনকার গান ভুলতে পারেননি।

আজ কংগ্রেস "High Command" থেকে কাটাছাঁটা "বন্দে মাতরম্" গাওয়ার হুকুম বেরিয়েছে। তা হোক্। হালফ্যাশনের ছাঁটা কুন্তলেও "বন্দে মাতরম্" তার তেজ ও দীপ্তিরসে ঢল ঢল করছে।

যেদিন বঙ্কিমের মৃত্যু সংবাদ হঠাৎ কানে এল—মনে হল আমারই জীবনের একাংশ খসে গেল।

॥ আট ॥

জন্মদিন

মেজমামী বিলেত থেকে ফিরে আসার পর থেকে 'জন্মদিন' বলে একটা ব্যাপারের সঙ্গে পরিচয় হল আমাদের—সে বিলাতী ধরনে সুরেন বিবির জন্মদিন উৎসব করার উপলক্ষ্যে। তার আগে এ পরিবারে 'জন্মদিন' কেউ কারো জন্যে করেনি। আমাদের জ্ঞানগোচরে হিন্দু ঘরের 'জন্মতিথি' পুজো এ বাড়িতে প্রচলিত ছিল না, তার কারণ প্রতিমা পুজোর সঙ্গে সঙ্গে সব রকম পুজো এ গৃহে বর্জিত হয়ে গিয়েছিল, কোন পুরানো পার্বণই আর টেঁকেনি। সরস্বতী পুজোটা পুরুষদের মহলে সারস্বত সম্মিলনীতে পরিণত হয়েছিল। দোলের সময় আবীর ছোঁড়ার নিছক আমোদটুকুও চলত। শ্রীপঞ্চমীতে বড় মেয়েরা কাপড় রঙিয়ে পরতেন, আর পৌষপার্বণে পিঠে গড়ার ধূম লেগে যেত বাড়ির ভিতরে কিন্তু পুজো-আর্চা কিছু হত না। তাই ঘরে ঘরে ছেলেমেয়ের জন্মতিথি পুজোর অনুষ্ঠান না থাকায় আমরা কে যে কবে জন্মেছি তার ধার ধারতুম না। আমাদের জন্মের তারিখ বা তিথি ঠিকুজি.বা কুষ্ঠিতে তোলা থাকত, লোকের মনে বছর বছর তুলে ধরা হত না। বিলেত-ফের্তা মেজমামী যে জন্মদিন করাতে লাগলেন তা তিথি পুজোর মত নয়, বিলিতী রকমের। মেজমামী এ পরিবারের একটি বিশাল-হৃদয়া বধূ, যেমন বিশাল-হৃদয় ছিলেন তাঁর স্বামী আমাদের মেজমামা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মেজমামী যদিও একান্ত নিজ সন্তান-দৃষ্টিগত-প্রাণ তবু পরিবারস্থ সকলের প্রতি ভাসুর দেবর ননদ নন্দাই জা ও তাদের সকলেরই সন্তানদের প্রতি অতি প্রীতিপরায়ণা। তাঁর ছেলেমেয়েদের জন্মদিনে বাড়িশুদ্ধ সকলকে বৈকালিক জলযোগে নিমন্ত্রণ করতেন, আর প্রতি ঘরের ছেলেমেয়েরা হাতে কিছু উপহার নিয়ে আসত। যারা আসত তাদের মা-বাপরা তাদের জন্মদিন কখনো করাতেন না, সুতরাং তারা দিতেই শিখল, তারাও যে পেতে পারে, সে ভাবনা তাদের মাথায় এল না, নিজেদের সম্বন্ধে সন্তান হিসেবে নগণ্যতার ভাবটাই তাদের রয়ে গেল। মেজমামীর দুই ছেলেমেয়ের সঙ্গে সন্তান-মাহাত্ম্যে প্রতিযোগিতার স্পর্ধা তাদের হৃদয়কে এতটুকু স্পর্শ করলে না। এমত স্থলে আমার একটি বাল্যবন্ধু যখন একবার আমার জন্মদিনের খোঁজ নিয়ে হঠাৎ সেদিন আমায় একটি উপহার দিলে আমি একটু অপ্রতিভই

হয়ে পড়লুম। বন্ধুটি হচ্ছে হেমপ্রভা—জগদীশ বসুর ছোট বোন। বলেছি শনি রবিবারে মাঝে মাঝে সে স্কুলের বোর্ডিং থেকে আমাদের বাড়িতে আসত। দুদিন আমাদের কাছে থেকে আবার সোমবারে আমাদের সঙ্গে স্কুলের বোর্ডিংয়ে ফিরে যেত।

জগদীশ বসুর পিতা ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট ভগবান বসু ছিলেন ব্রাহ্ম। তাঁর সর্বজ্যেষ্ঠা কন্যা স্বর্ণপ্রভা ছিলেন ব্যারিস্টার আনন্দমোহন বসুর পত্নী। দ্বিতীয়া কন্যা সুবর্ণপ্রভা ছিলেন তাঁরই অনুজ ডাক্তার মোহিনী-মোহন বসুর পত্নী। তার পরের তিনটি কন্যা অনূঢ়া, তাঁদের মধ্যে লাবণ্য-প্রভা বড়। এঁরা তিনজনেই মফঃস্বল থেকে এসে বেথুন স্কুলের বোর্ডিংয়ে ভর্তি হন। কাদম্বিনী বসু (পরে গাঙ্গুলী), কামিনী সেন (পরে রায়), অবলা দাস (পরে বসু) ও কুমুদিনী খাস্তগির (পরে দাস) এবং শিবনাথ শাস্ত্রী মশায়ের কন্যা হেমলতা (পরে সরকার) প্রভৃতি ব্রাহ্মসমাজের বড় বড় মেয়েরাই উপরের দিকের ক্লাসে ছিলেন। কিন্তু জগদীশ বসুর ভগ্নীদের আবির্ভাবে ব্রাহ্ম পরিবারের একটা বিশেষত্ব স্কুলে বেশী করে ফুটে উঠল—একটা সহজ স্বাধীন গতিবিধির ভাব, পড়াশুনায় মার্জিত রুচি, এবং কোন কোন বিষয়ে ইংরেজিয়ানার বিশেষ অনুবর্তন। সেকালের ব্রাহ্মরা জীবনের কতকগুলি অনুষ্ঠানে একেবারে ইংরেজী ধাঁচা অবলম্বন করেছিলেন। সমাজে তাঁদের উপাসনা মাতৃভাষায় না হয়ে অনেক সময়ে ইংরেজীতে হত; বিবাহের সময় কনের বসন সাদা রঙের হত। গাউন না পরে শাড়ি পরলেও ইংরেজদের অনুকরণে কনে শাড়ির উপর আমস্তকপাদ একটি সাদা নেটের veil বা অবগুণ্ঠনে আবৃত হতেন, তাতে 'অরেঞ্জব্লসম্' অর্থাৎ কমলানেবুর ফুল লাগান থাকত এবং bride বা কনের পিছনে brides-maids বা কনের পশ্চাৎচারিণী একই রকম সাজে সাজা দুচারটি কুমারী বালিকাদের শোভাযাত্রা অবশ্যকর্তব্য হত। আমি দুটি ব্রাহ্ম বিবাহে brides-maid হই—এক শিবনাথ শাস্ত্রীর জ্যেষ্ঠা কন্যা হেমের বিয়েতে—আর এক দুর্গামোহন দাসের কনিষ্ঠা কন্যা খুসীর বিয়েতে। হেমের বিয়ে হল ইংরেজদের churchএ বিয়ে হওয়ার মত—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরে। হেম প্রায় সাদা ক্রীম রঙের শাড়ির উপর আগাগোড়া ইংরেজী রকমে veilএ আচ্ছাদিত। কিন্তু খুসীর বেলায় ব্রাহ্মদের ঘোরতর ইংরেজী অনুকরণ-প্রিয়তা অনেকটা শিথিল হয়ে এসেছে। খুসী আমাদের সঙ্গে খুব বেশী রকম মিশে গিয়েছিল। সে তার বিয়েতে সাদা রঙের রেশমী শাড়ির পরিবর্তে সনাতন লাল বেনারসী

শাড়ি পরলে আর veilএর দস্তুর বর্জন করে আমাদের বাড়ির মেয়েদের মত ওড়না পরলে। কিন্তু brides-maid প্রথা বজায় রইল। তবে তারও সংখ্যা এক আমাতেই পর্যবসিত হল, খুসী আর কাউকে চায় না। Brides-maidsদের পোশাক সরবরাহ করেন বা তার খরচা বহন করেন বর এই হল দস্তুর। ডাক্তার ডি এন রায়ের খরচায় দিব্যি সেজেগুজে আমি চললুম খুসীর পিছনে পিছনে, গিয়ে বসলুম বিবাহ সভায় গুরুগম্ভীর-ভাবে তার কাছাকাছি।

পশ্চিমে নিতবরের প্রথা প্রচলিত আছে। বাঙলায় নিতবরের সঙ্গে সঙ্গে নিতকনেও হয়। আমি একবার সেই সত্যিকার বাঙালী দস্তুরের নিতকনেও হয়েছিলুম—প্রতিভা দিদির বিয়েতে। প্রতিভা দিদির নিজের ছয়টি সহোদরা ছোটবোন থাকতে আমাকে যে নিতকনে করতে চাইলেন তার কারণ এই যে, আমি তাঁর ভাবী স্বামী আশু চৌধুরীর একটি অতি প্রিয় বোনের মত ছিলুম—তাঁর নিজের ছোট বোন ও বোনঝি মেনা ও প্রিয়ম্বদার সখী হিসেবে। কনের মত লাল টুকটুকে পাংলা বেনারসী শাড়ি পরে, কনের সঙ্গে সঙ্গে যোড়াসাঁকোর উপাসনার দালানে বিবাহ-সভায় গিয়ে তাঁকে বসান উঠান এই ছিল আমার নির্ধারিত কর্তব্য। সেদিন কনের পরই আমারই প্রতি সবায়ের দৃষ্টি। হঠাৎ খুব একটা আত্মগৌরবের আনন্দ অনুভব করলুম।

'জন্মদিন'-এর কথা দিয়ে আরম্ভ করেছিলুম। ব্রাহ্ম পরিবারে জন্মদিন করা চালু হয়েছিল। ধর্মপ্রাণ মেমেরা যেমন সেদিন পাদরীকে দিয়ে প্রার্থনার দ্বারা অনুষ্ঠানের আরম্ভ করতেন, সাধারণ ব্রাহ্মেরাও তেমনি তাঁদের আচার্যদের দিয়ে প্রথমে উপাসনা করিয়ে শেষে খাওয়ান-দাওয়ান ও উপহার দেওয়াদেয়ির ব্যবস্থা করতেন। কর্তাদাদামশায়কৃত ব্রাহ্ম অনুষ্ঠান পদ্ধতিতে জন্মদিন উল্লিখিত না হওয়ায় যোড়াসাঁকোয় মেজ-মামীর ছেলেদের জন্মদিনের অনুষ্ঠানও উপাসনা-বর্জিত হয়ে শুধু আমোদপ্রমোদ, মেলামেশা ও খাওয়া-দাওয়ার উৎসব-মূর্তিতে দেখা দিয়েছিল। হেমপ্রভা সে বছর আমার জন্মদিন খুঁড়ে বের করলে। আমার জন্যে আমাদের বাড়িতে যা কস্মিনকালে হয়নি তা সেবারও হয়নি। বাড়ির কারোই খোঁজখবরে আসেনি সেদিনটা আমার জন্মদিন বলে। কিন্তু আমার প্রতি স্নেহমুগ্ধ হেমপ্রভা সেদিনটাকে গৌরব দিয়ে ভোর হতেই একখানি ইংরেজী গল্পের বই আমার হাতে উপহার দিলে, ভিতরে তার লেখা—"সরলার জন্মদিনে হেমপ্রভার ভালবাসার সহিত উপহার।"

সে বইখানির নাম—"Lamplighter"--চমৎকার বই। জানি না আজকালকার মেয়েরা সে বই পড়েছে কিনা। সেই পর্যন্ত নিজের জন্মদিন সম্বন্ধে আমার মনে একটা জাগ্রতি এল। আর সেটা পুষ্ট করলেন আমার দিদি হিরণ্ময়ী। আমাদের নিজস্ব পারিবারিক সংহত জীবনের কর্তা তিনি। পরিবারের মধ্যে আমার নিজের সম্বন্ধে একটা ন্যূনতা জ্ঞান সদা বর্তমান ছিল। দিদির ছিল না। তিনি মা-বাপের আদরে বর্ধিত। নিজে ও নিজের মা-বাবা, ভাইবোনরা যে কেউকেটা নয় এমনি একটা হামবড়াইতে ভরা ছিলেন। যোড়াসাঁকো ছেড়ে কাশিয়াবাগানে এলে তিনি ভাইবোনদের ও মায়ের জন্মদিন উৎসব প্রবর্তন করলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমরাও তাঁর করতে থাকলুম। হয়নি শুধু বাবামশায়ের, কারণ তিনি তাঁর জন্ম মাস, বৎসর, তিথি বা তারিখ জিজ্ঞেস করলেও বলতেন না।

আমার ষোড়শ জন্মদিনের কথা বেশ মনে পড়ে। লম্বা খাবার টেবিলে নানারকম মিষ্টান্ন ফল ফুল সাজান—মাঝখানে একটা ঝকঝকে রুপার থালার উপর একটি বড় কেকের পাশে পাশে গোল করে ষোলটি মোমবাতি দীপ্যমান। আজ যত বছরের হলুম, এ গৃহে ততগুলি দীপ জ্বলে উঠল আজ—এই সুন্দর ইংরেজী প্রথাটির অনুসরণ দিদির নতুনত্ব—যতদূর মনে পড়ে মেজমামীও কোনদিন এটা করেন নি।

মেজমামা বিলেত হয়ে আসার পূর্বে যোড়াসাঁকোয় কারো জন্যেই 'জন্মদিন' করান হত না বলেছি। আজ যে দেশব্যাপী রবীন্দ্র-জন্মদিন অনুষ্ঠান, তাও মেজমামীদের সঙ্গে রবিমামা ফেরার পরও সেকালে যোড়াসাঁকোয় কোনদিন হয়নি। সেটি ধরালুম আমি আমার ভক্তি-প্রাবল্যে। তখন তিনি ও নতুন মামা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ থাকেন মেজমামীদের সঙ্গে ৪৯নং পার্ক স্ট্রীটে। এ বিষয়ে পূর্বে যা লিখেছি, তার থেকে উদ্ধৃত করছি—"রবিমামার প্রথম জন্মদিন উৎসব আমি করাই। তখন মেজমামা ও নতুনমামার সঙ্গে তিনি ৪৯নং পার্ক স্ট্রীটে থাকেন। অতি ভোরে উল্টোডিঙির কাশিয়াবাগান বাড়ি থেকে পার্ক স্ট্রীটে নিঃশব্দে তাঁর ঘরে তাঁর বিছানার কাছে গিয়ে বাড়ির বকুল ফুলের নিজের হাতে গাঁথা মালা ও বাজার থেকে আনান বেলফুলের মালার সঙ্গে অন্যান্য ফুল ও একজোড়া ধুতি-চাদর তাঁর পায়ের কাছে রেখে প্রণাম করে তাঁকে জাগিয়ে দিলুম। তখন আর সবাই জেগে উঠলেন—পাশেই নতুনমামার ঘর। "রবির জন্মদিন" বলে একটি সাড়া পড়ে গেল। সেই বছর থেকে পরিজনদের মধ্যে তাঁর জন্মদিনের উৎসব আরম্ভ হল।

জানতে পেলুম, নতুনমামা ও রবিমামার জন্মদিন কাছাকাছি তারিখে। রবিমামার হল ইংরেজি ৭ই মে, আর নতুনমামার বোধহয় ৫ই মে। তাই পরের বছর থেকে নতুনমামার জন্মদিনও আরম্ভ হল। সেটা মেজমামীই করলেন। নতুনমামীর মৃত্যু কয়েক বৎসর পূর্বে হয়েছে, সেই পর্যন্ত নতুনমামা ওঁদের সঙ্গেই থাকেন। এসবের অনেক পরে কর্তাদাদা-মহাশয়ের জন্মদিন যোড়াসাঁকোর উঠানে উপাসনাপূর্বক প্রচলিত হল।

গৃহের ভিতর গৃহনির্মাত্রী মেয়েরাই। তাঁরাই পরিবারটিকে কতকগুলি আচার-অনুষ্ঠানের বন্ধনীতে বাঁধেন, আরম্ভে সেগুলি কেবলমাত্র মেয়েলী হলেও ক্রমে তারাই সামাজিক অনুষ্ঠানে পরিণত হয়। মেজমামীর প্রবর্তিত নিজের ছেলেমেয়ের জন্মদিনটুকু ক্রমে যোড়াসাঁকোর ঘরে ঘরে সঙ্গোপনে বা প্রকাশ্যে প্রতি মায়ের ছেলেমেয়ের জন্যে প্রসারিত হতে হতে এ পরিবারে একটি পারিবারিক আচারের মত হয়ে উঠল এবং নিম্নমুখিতা থেকে উর্ধ্বমুখিতা নিলে, একপুরুষে বড়দের জন্মদিনও প্রবর্তিত হল।

মেজমামী আর একটি জিনিসের প্রবর্তক—এই পরিবার থেকে আরম্ভ করে সমস্ত বাঙলাদেশে। সেটি শাড়ি পরার ভঙ্গিমা পরিবর্তন। দাদামশায়ের আমল থেকেই মেয়েদের পোশাক সম্বন্ধে এ পরিবারের মস্তিষ্কে নানারকম আন্দোলন চলেছে। শুনতে পাই, অনেক পরখ করে করে দাদামহাশয় তাঁর বাড়ির কুমারী মেয়েদের জন্যে বাইরের পোশাক 'পেশোয়াজ' হওয়াই সাব্যস্ত করেছিলেন। বড়মাসিমার জ্যেষ্ঠা কন্যা ইরু-দিদির বিবাহপূর্বের সেই পোশাকপরা সুন্দর অয়েল পেণ্টিং অবন-দাদাদের বাড়িতে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু ইংরেজি ফ্রকটা সহজসাধ্যতায় পেশোয়াজকে পদচ্যুত করলে। বিবাহিত মেয়ে ও বউদের শাড়ি পরার ভঙ্গিমার সমস্যা তাতে মিটল না। এ-বাড়ির বড়রা কেউ ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ প্রভৃতির পত্নীদের মত গাউন পরতে রাজি নয়। অথচ বাঙালীকেতায় শাড়ি জড়ানতে সৌষ্ঠব নেই। মেজমামী যখন স্বামীর সঙ্গে বোম্বাই গেলেন, সেখানে পার্শী ও গুজরাটি মেয়েদের শাড়ি পরার ধরন তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। সেটি পশ্চিমের মেয়েদেরই ধরন—যা ভারতের চিত্রকলায় চির-আদৃত। মেজমামী সেটি গ্রহণ করলেন—খালি আঁচলের ধাঁচটা বাঙালী রকমই রাখলেন। যখন আমার মায়ের সঙ্গে মেজমামী দেশে ফিরলেন, দুইজনেই সেই রকমে শাড়িপরা—তাই বাড়ি-শুদ্ধ সকলেই সেই ধাঁচটাই ধরে নিলেন। ক্রমে তাঁদের দেখাদেখি সাধারণ

ব্রাহ্মসমাজের রুচিশালিনী কতকগুলি মেয়েরাও এটা গ্রহণ করলেন। পরে সব ব্রাহ্মপরিবারে এটা ছড়িয়ে পড়ল। এই রকমে পরা শাড়ির নাম ব্রাহ্মরা রেখেছিলেন 'ঠাকুরবাড়ির শাড়ি'। ব্রাহ্ম মেয়েরা সবাই পরতে আরম্ভ করায় দেশের লোক তার নাম দিলে 'ব্রাহ্মিকা শাড়ি'।

বাঙালী মেয়ের শাড়ি পরার ক্রমবিবর্তনের দ্বিতীয় ধারা এল দিল্লী-দরবারের পর। সেই দরবারে সমস্ত ভারতবর্ষের রাণী-মহারাণী সম্মেলনে তাঁদের সঙ্গে সাজের সঙ্গতি রাখার জন্যে কুচবেহার মহারাণী সুনীতি দেবী ও ময়ূরভঞ্জ মহারাণী সুচারু দেবী অধুনাতন নবীনতম পন্থায় শাড়ি পরতে লাগলেন এবং পরে দেশে ফিরে এসেও সেটি জারী রাখলেন। এ নাকি কুচবেহারের ও উড়িষ্যার—তাঁদের স্ব স্ব শ্বশুরকুলের নিজস্ব পন্থা, এতদিন তার থেকে নিজেদের বাঙালীর অভিমানে নিজেদের দূরে দূরে রেখেছিলেন। আজ ভারতের রাজকুলের সঙ্গে সাম্যে সেটি গ্রহণ করলেন। এই পরিধানপন্থার সুশ্রীতা বাঙালীমাত্রের মনোগ্রাহী হল, এই হয়ে গেল বাঙলাদেশের শাড়ির ফ্যাশন এবং এ ফ্যাশন সমগ্র ভারতবর্ষের সঙ্গে বাঙলার একতা এনে দিলে। বাঙালী মেয়েদের পরিচ্ছদে ভারতীয় ঐক্যসাধনে মেজমামী প্রথমে পথপ্রদর্শিকা। এই দ্বিতীয় রকমটি সেই ঐক্যেরই আর এক পদক্ষেপ মাত্র। কিন্তু পুরুষদের পরিচ্ছদে এখনও সে ঐক্যের অভাব রয়ে গেছে। বাঙালীর সামাজিক সাজ যে পাৎলা ধুতি, চাদর ও পাঞ্জাবী—শীতকালে শাল, সেটা অন্য প্রদেশে সব সময় চলতে পারে না। উত্তর-পশ্চিমের পুরুষদের সামাজিক সাজ যে চুড়িদার পাজামা ও আচকান বা সেরবানি—সেটা বাঙালীর বিবাহ বা শ্রাদ্ধসভায় অচল হলেও অন্য সভায় চলে। আমাদের পরিবারে বোধহয় নবাবদের আমল থেকেই সেইটিই পুরুষদের বাইরের পোশাকস্বরূপ গাত্রভূষণ হয়ে চলে আসছে। শিরোভূষণটি পাগড়ি বা টুপির মধ্যে দোলায়মান থেকেছে। রবিমামার ও তাঁর অগ্রজদের বিভিন্ন ফটো থেকে তা সুস্পষ্ট হবে। পাগড়ীটি সুচারু করে বেঁধে দেওয়ার জন্যেও দেবরদের মাথার উপর মেজমামীর হস্তচারণা অনেকবার হয়েছে। যোড়াসাঁকোর পরিবারকে আমোদ-উৎসবে সাজসজ্জায় এক করে বাঁধতে মেজমামীর অনেক দিকে অনেকটা হাত ছিল—তার একটুখানির উল্লেখ করলুম। কিন্তু মেজমামারও কম ছিল না। তিনি বোম্বাইপ্রবাসে থাকতে অধিকাংশ আত্মীয়ই তাঁর ওখানে মাঝে মাঝে গিয়ে কাটিয়ে আসতেন। তাঁদের মধ্যে হংসপ্রকৃতির যাঁরা—নীর থেকে ক্ষীর নিতে জানতেন—

গুজরাটি, মারাঠী, পার্শী, সিন্ধীদের কাছ থেকে অনেক কিছু সংগ্রহ করে আনতেন। মেজমামা যখন ছুটিতে বাড়ি আসতেন, বাড়িশুদ্ধ ছোট ছেলেমেয়েদের জন্যে খেলনা সঙ্গে করে আনতেন। সব সাজিয়ে রাখা হত একটা জায়গায়, যার যেটা পছন্দ তুলে নিত, কোন বাধানিষেধ থাকত না। আমার মনে পড়ে, একটি খুব বড় মোমের পুতুলের জন্যে আমি লুব্ধ হই। কিন্তু পেতে পারি বলে ভরসা ছিল না, হাত বাড়িয়ে তুলে নিতে সাহস হচ্ছিল না। মেজমামার সঙ্গে বড়দের আর একজন কেউ সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন, আমি চুপ করে সব খেলনার দিকে চেয়ে আছি দেখে জিজ্ঞেস করলেন—"কোন্‌টা চাই তোমার?" আমি নীরবে পুতুলটার দিকে দেখালুম। মেজমামা তৎক্ষণাৎ সেটা তুলে আমার হাতে দিলেন। তাই তাঁর ছুটিতে বাড়ি আসার জন্যে আমরা ছোটরা সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতুম।

॥ নয় ॥

দিদি

দিদি হিরন্ময়ীর স্মৃতি আমার মনে একটি সুবাসের মত ভরা আছে। যেমন হাসানুহানা গাছের কাছ দিয়ে গেলে সন্ধ্যাবেলা একটা সুবাস বয়ে আসে, যেমন যুঁই বেল ক্ষেতের হাওয়া ভোরের বেলায় একটি সুবাস-স্নিগ্ধতা আনে—ঠিক তেমনি যেন। তাঁর রক্তচর্মের শরীরটি ছেড়ে ভিতরকার স্নেহ-ভক্তি-প্রীতিময়তার সুবাসই তাঁকে আমার মনে জাগরূক রেখেছে।

কাশিয়াবাগানে এসে অবধি দিদিই আমাদের পরিবারের কর্ণধার হন। তাঁর আমাদের জন্মদিনের উৎসব প্রবর্তনের কথা বলেছি। অন্য অনেক রকমেও তিনি যেন বড়-ছোট সকলের অভিভাবিকা হলেন। ভক্তি-প্রীতি-সেবায় তাঁর সহজ তৎপরতা রোজ দেখা দিতে লাগল। যেমন মায়ের প্রতি তেমনি বাবামশায়ের প্রতিও কি যত্ন ছিল তাঁর। একটা পুরানো চাকর—আমাদের ঠাকুরদাদার আমলের—একবার বাবামশায়ের কাছে কি লাগিয়ে দিদির সঙ্গে বাবামশায়ের একটু মনান্তর সাধন করে।

দিদি জন্মে সেটা ভুলতে পারেননি। বাবামশায়ের সঙ্গে মন-ভাঙ্গাভাঙ্গি! এতদূর ক্ষতি করা!

দিদির স্নেহে আমার মাতৃস্নেহের অভাব অনেকটা পূরণ হয়েছিল। আমার যখন যা সাধ হত তাঁকে ধরলেই পেতুম। একবার জানালুম, রোজ সন্ধ্যেবেলা একটি করে বেলফুলের মালা পেলে ভারি মন খুশী হয় আমার। অম্নি বাজার থেকে সেটা নিয়মমত আসার বন্দোবস্ত করে দিলেন দিদি। একবার যোড়াসাঁকোর একটি মেয়ের গলায় একটি অভিনব প্যাটার্নের সুন্দর সোনার নেকলেস দেখে আমারও সখ হল সেই রকম নেকলেস পরতে। কে দিলে স্যাকরাকে দিয়ে গড়িয়ে ঠিক সেই রকম নেকলেস আমায়? মা নয়—দিদি। তখন তাঁর বিয়ে হয়েছে—নিজের সংসারের নিজে হর্তাকর্তা। যাকে যা খুশী দিতে পারেন, যেমন ইচ্ছে খরচ করতে পারেন।

দিদির বিয়ে হয় ষোল বৎসর বয়সে আমাদের পিসেমশায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। সিমলার বাড়িতে থাকতেই ফণিদাদা পিসেমশায়ের সঙ্গে প্রায়ই আমাদের বাড়িতে আসতেন। তখন থেকেই তাঁর দিদিকে বিয়ে করবার ইচ্ছা হয়। সেই অভিলাষ পূর্ণ করার জন্যে গিলক্রিস্ট স্কলারশিপের প্রচেষ্টায় কৃতকার্য হয়ে বিলেত যান। সেখান থেকে গবর্নমেণ্টের এডুকেশন সার্ভিস নিয়ে এসে প্রথমে প্রেসিডেন্সী কলেজে বোটানির অধ্যাপক হন। তার পরে রাজসাহী ও হুগলী কলেজে বদলি হন। শেষজীবনে প্রেসিডেন্সী ও বর্ধমান ডিভি-সনে ইন্সপেক্টর হন। যতদিন কলকাতায় ছিলেন দিদিরা কাশিয়াবাগানেই থাকতেন।

দাদামশায়ের নাত্নীদের সবায়ের যেমন হয়, দিদিরও বিয়ে তেমনি হয়েছিল যোড়াসাঁকোর উপাসনার দালানে। আমরা সকলে সেই উপলক্ষে কাশিয়াবাগান থেকে যোড়াসাঁকোয় গিয়ে ছিলুম কিছুদিন ধরে। দিদির বিয়েতে দিদির পরম বন্ধু খুসী নিতকনে হয়ে দিদির সঙ্গে সভায় গিয়ে বসেছিল। তখনো আমাদের বাড়ির মেয়েদের দালানে বিয়ের সভায় যাওয়া দস্তুর হয়নি। খুসীর পরনে সবুজ রঙের পাৎলা বেনারসী। ঐ রঙটা তার পছন্দ। আমরা সবাই বল্লুম, "অন্য রঙ পর, সবুজ রঙে তোমায় ভাল লাগে না।" সে বল্লে, "আমার সবুজ রঙ ভাল লাগে, নাইবা সবুজ রঙে আমায় ভাল লাগল।" বাসরের আমোদ-উৎসবস্বরূপ রবিমামা 'বিবাহোৎসব' বল্লে একটি গীতি-নাটিকা রচনা করে অভিনয় করালেন

দিদির সমবয়সী বা তাঁর চেয়ে কিছু বড় বোনেদের দিয়ে। এতে দিদির খুসীও ছিল। সরোজাদিদি তাতে ছিলেন নায়িকা—অন্যরা সব তাঁর সখী। দুজন পুরুষ ছিল, একজন নায়ক ও একজন তার আমুদে সখা। যদুদাদার প্রথমা স্ত্রী দিনুর মা—সুশীলা বৌঠান ও সুপ্রভাদিদি—এই দুজনে ঐ দুই পুরুষ সেজেছিলেন।

বিয়ের পর থেকে দিদির বাপ-মা ও ভাই-বোনের প্রতি টান বিশেষ করে প্রকট হল। সব বিষয়ে মায়ের সাহচর্য করতে লাগলেন। সে সময় থিয়সফির খুব প্রচার। আমাদের বাড়িতে মহিলা-থিয়সফিক্যাল সভা হত, তার প্রেসিডেন্ট মা। যাঁদের স্বামী বা বাড়ির পুরুষেরা থিয়সফিস্ট, তাঁদেরই স্ত্রী ও বাড়ির মেয়েরা আসতেন। কলকাতার নানা পরিবারের মেয়েদের আনাগোনায় মায়ের সঙ্গে তাঁদের বেশ সখিত্ব স্থাপন হল। মাদাম ব্লাভাটস্কি ও কর্নেল অল্‌কটের শুভাগমনও প্রায়ই হতে থাকল আমাদের বাড়িতে। তাঁরা এসে মেয়েদের দীক্ষা দিতেন।

একদিন সবাই হলঘরে বসে আছেন। অল্‌কট সাহেব একটা কি কথা কইতে কইতে হঠাৎ উঠে সোঁ করে চলে গেলেন পাশের ঘরে। সেটা আমাদের ছেলেদের শোবার ঘর। দুই-এক মিনিট সেখানে থেকে আবার হলঘরে ফিরে এলেন। সবাই আশ্চর্য হয়ে গেল—কি ব্যাপার? অল্‌কট বল্লেন—মহাত্মা কুথোমির আবির্ভাব হয়েছিল ঐ ঘরে, তাঁকে একটা বার্তা দিতে এসেছিলেন। তাঁর ডাক পেয়ে অল্‌কট গিয়েছিলেন ঐ ঘরে। যা শোনাবার তা শুনিয়ে চলে গেছেন কুথোমি। আমরা বিস্ময়ে আনন্দে শিউরে উঠলুম। আমাদের শোবার ঘর পবিত্র হয়ে গেছে মনে হল। মহাত্মা কুথোমি এসেছিলেন ঐ ঘরে? কি সৌভাগ্য আমাদের। আমি থিয়সফিতে দীক্ষা পাবার জন্যে আকুল হলুম। দিদি দীক্ষিত হয়েছেন, কিন্তু আমার বয়স কম বলে তখনও অনধিকার। আমি ভাবতে লাগলুম কবে বড় হব, কবে দীক্ষার অধিকার হবে! অল্‌কট সাহেব একদিন কুথোমির একখানি ছবি—অয়েল পেণ্টিং নিয়ে এলেন। ছবির চোখে একটি অসাধারণত্ব আছে বটে। সে চোখ তোমার বাহির-অন্তর ভেদ করে তোমাতে প্রবেশ করছে যেন। অনেকদিন ধরে সে চোখের দৃষ্টি আমার haunt করত।

একবার সকালবেলা ঘুম থেকে উঠতে গিয়ে হঠাৎ আমার ঘাড়ে একটা মোচড় আসে, ঘাড় তুলতে পারি না আর, বিছানা থেকে উঠতে পারি না। একটু নড়লে-চড়লে ব্যথা হয় ভয়ানক। বাবামহাশয় অল্‌কট

সাহেবকে আনালেন—তিনি মেস্‌মেরাইজ করে সারিয়ে দেবেন বলে। মেস্‌মেরিস্ট বলে অল্‌কট সাহেবের বিশেষ খ্যাতি ছিল। তিনি এসে দুটো-চারটে 'পাস' দিয়ে আমায় বল্লেন—'ওঠ!' আমি বল্লুম—'অসম্ভব। ঘাড় তুলতে পারছিনে, এপাশ-ওপাশ করতে পারছি নে, উঠব কি করে?' তিনি বল্লেন—'পারবে। ওঠ।' বলে আমার হাত ধরলেন। আমি ভয়ে ভয়ে মাথা তুলতে চেষ্টা করলুম—দেখলুম, আশ্চর্য—পারছি ত; ঘাড়ে লাগল না ত! আমার হাতে হাত রেখে অল্‌কট আমায় একেবারে উঠিয়ে বসালেন—ঘাড়ে তখন খট্‌ করে একটা শব্দ হল, এক মুহূর্তের জন্যে তীব্র ব্যথা বোধ হল, কিন্তু উঠতে পারলুম। অল্‌কট একটা গ্লাসে খানিকটা জল মন্ত্রপূত করে রেখে গেলেন, দু-তিন ঘণ্টা অন্তর একটু একটু খেতে বল্লেন। তার পরদিন সন্ধ্যেবেলায় আর একবার এলেন, বল্লেন—"ভাল হয়ে গেছ। দেখ কিচ্ছু ব্যথা নেই।" সত্যিই তাই দেখলুম। মেস্‌মেরিজমের উপর বাড়িসুদ্ধ সকলের শ্রদ্ধা খুব বেড়ে গেল। তখন থেকে মেস্‌মেরিজমের নানারকম phenomena পরখ করার জন্যেও সকলের ভারি আগ্রহ হল। থিয়সফির সভায় যেসব মেয়েরা আসতেন, তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন—ভবানীপুরের নবীন বাঁড়ুয্যের বোন বলে প্রখ্যাতা। তিনি সন্ন্যাসিনীর বেশ ধারণ করতেন। তাঁর একটি ভাইঝি সঙ্গে আসত, সে তার স্বামীকে ত্যাগ করেছিল, স্বামী তাকে চায়; কিন্তু সে স্বামীকে চায় না—সে চায় নির্বাণের পথে যেতে। এই পরিবারের সবাই অদ্ভুত। নবীন বাঁড়ুয্যের ছেলেটি মেস্‌মেরিজমে সিদ্ধপুরুষ হয়ে গিয়েছিল। সে এক একদিন এসে তার কেরামতি দেখাত। একজন ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে আধঘুমন্ত অবস্থায় সাপ-ব্যাঙ যা খুশি দেখাত, নিজের ইচ্ছামত উঠাত বসাত, হাসাত কাঁদাত।

দিনুর মা সুশীলা বৌঠানও থিয়সফিক্যাল সোসাইটির মেম্বর ছিলেন। একদিন আবিষ্কার হল যে তাঁর ভিতরও মেস্‌মেরাইজ করার ক্ষমতা আছে। তাঁর একটি পালিতা দাসীপুত্রী ছিল—নাম তার নির্মলা। তাকে তিনি মাঝে মাঝে মেস্‌মেরাইজ করতে লাগলেন। বৌঠান আড়াল থেকে তিত-মিষ্টি যা কিছু খেতেন—ঘুমন্ত নির্মলার মুখে সেই স্বাদ আসত। এ বিষয়ে যাতে সে ঠকাতে না পারে, যাতে মট্‌কা মেরে পড়ে থেকে মিট্‌মিট্‌ করে চেয়ে দেখে টের না পায় কি খাওয়ান হল বৌঠানকে, তার জন্যে আমরা অনেক কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করতুম। ঠকাবার উপায়ই ছিল না। সত্যি-সত্যিই সে মেস্‌মেরিক নিদ্রাগ্রস্ত অবস্থাতেই সব

কিছু করত, বলত। বৌঠান কোন কোন দিন তাকে আদেশ দিতেন—"হিমালয়ে চলে যাও, সেখান থেকে ঘুরে এস।" সে খানিকক্ষণ পরে যেন অত্যন্ত শীতার্ততা প্রকাশ করত। ক্রমে বাড়িশুদ্ধ সকলে বৌঠানকে এই বশীকরণক্রিয়া থেকে নিরস্ত করতে লাগল। ইচ্ছাশক্তির এরূপ অযথা অপব্যয়ে নিজের শরীর দুর্বল হয়ে পড়ার সম্ভাবনা।

মাদাম ব্লাভাটস্কির প্রতি শ্রদ্ধায় যখন মান্দ্য পড়ল, থিয়সফির দল ভঙ্গ হল, তখন থিয়সফির সূত্রেই যাঁদের সঙ্গে পরিচয় আরম্ভ হয়েছিল, সেই সব মহিলাদের নিয়ে 'সখি-সমিতি' নাম দিয়ে মা একটি সমিতি স্থাপন করলেন। 'সখি-সমিতি' নামটি রবিমামার দেওয়া। কুমারী ও বিপন্না বিধবাদের বৃত্তি দিয়ে পড়ান, পড়া সাঙ্গ হলে তাদের শিক্ষয়িত্রী-রূপে বেতন দিয়ে অন্তঃপুর-মহিলাদের শিক্ষার জন্যে নিযুক্ত করা, মফঃস্বলে ধর্ষিতা নারীদের জন্যে প্রয়োজন হলে উকিল ব্যারিস্টার নিযুক্ত করে মোকদ্দমা চালান, বাঙলার বিভিন্ন জেলা থেকে শিল্প সংগ্রহ করে মেলা করা, তাতে মেয়েদের দ্বারা অভিনয় করান প্রভৃতি নানা আয়োজনে 'সখি-সমিতি' বিখ্যাত হয়ে উঠল। 'মায়ার খেলা'র প্রথম অভিনয় 'সখি-সমিতি'তে হয়। সেবার দাদা ও সুরেন স্টেজ ম্যানেজার ছিলেন। মায়াকুমারীদের মাথায় অলক্ষ্য তারে বিজলীর আলো জ্বালান তাঁদের একটি বিশেষ কারিগরি ছিল। আর সবাই অতি ভয়ে ভয়ে ছিল—পাছে বিজলীর তার জ্বলে উঠে মায়াকুমারীদের shock লাগে! কিন্তু তাঁরা নতুন বৈজ্ঞানিক, নির্ভীক! আশুবাবুর বিয়ের বাসরেও তাঁরা মসলন্দের তলায় বিজলীর তার পেতে তাঁকে চমক দিয়ে দিয়ে ক্ষেপিয়ে তুলেছিলেন—জামাইবাবু স্থির হয়ে বসতেই পারছেন না—শ্যালীরা হেসে হেসে অস্থির। মেলাটি বেথুন স্কুলের চাতালে হয়। মেলা সুন্দর করে সাজান, স্টেজ বাঁধা, স্টল ঘেরা প্রভৃতি সব কাজেই দাদাদের ব্যাপৃত থাকতে হয়েছিল কদিন ধরে। তাতে তাঁর পড়ায় খুব অমনোযোগ হত।

আমাদের সংস্কৃতের চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত বলতেন,—মা, পড়ার ক্ষতি করে ছেলেকে এই সব কাজে লাগিয়ে ছেলের মাথাটি খাচ্ছেন। সত্যি দাদা সেবার এন্ট্রান্স ফেল করলেন। আমি পাস হয়ে গেলুম। আমরা সমান ক্লাসে পড়তুম, দাদা আমার চেয়ে এক ক্লাস নীচে হয়ে গেলেন। পরের বছর এন্ট্রান্স দেবার সময় সময় দাদার হল বিষম জ্বর। দাদা আরও এক বছর পেছিয়ে গেলেন। আমি যে বছর দিলুম এফ-এ, তিনি সে বছর দিলেন এন্ট্রান্স। যাহোক সব ক্ষতি পুষিয়ে গেল যখন সেই বছর তাঁকে

বিলেত পাঠান হল, আর কয়েক বছর পরে তিনি সেখান থেকে সিভিল সার্ভিস পাস হয়ে এলেন।

দিদির বিয়ের পূর্বে কাশিয়াবাগানে পাড়ার মেয়েদের জন্যে আমরা দুজনে মিলে একটা পাঠশালা খুলেছিলুম। দিদি হলেন প্রধানা শিক্ষয়িত্রী, আমি হলুম তাঁর এসিস্ট্যাণ্ট। তখন তাঁর বয়স চৌদ্দ-পনের, আমার বয়স দশ-এগার। আমরা নিজেরা তখন দিনের বেলা বেথুন স্কুলে যাই, সকালে-সন্ধ্যায় বাড়িতে সতীশ পণ্ডিতের কাছে স্কুলের পড়া তৈরি করি, সংস্কৃতের পণ্ডিতের কাছে সংস্কৃত, ওস্তাদ ও মেমের কাছে গান, সেতার ও পিয়ানো শিখি, আর ইস্কুল থেকে ফিরেই তাড়াতাড়ি মুখ-হাত ধুয়ে কিছু খেয়ে নিয়ে সাড়ে চারটে থেকে সাড়ে ছটা পর্যন্ত দুই ঘণ্টা রীতিমত ইস্কুল চালাই। বাঙলা, ইংরেজি, অঙ্ক ও সেলাই—এই চারটি বিষয়ই শেখাতুম আমরা নিজে। প্রায় কুড়িটি মেয়ে আসত, কেউ কুমারী, কেউ বা বাল-বিধবা। চাঁদনির সিঁড়ির উপর ধাপে ধাপে বসান হত তাদের ঠিক যেন কোন বড় ইস্কুলের গ্যালারীতে বসেছে। তারা যখন খিড়কির দুয়োর দিয়ে পুকুরে জল তোলার জন্য নিত্য আনাগোনা করত, তখনি তাদের দেখে আমাদের মনে তাদের জড় করে পড়ানর কল্পনা উদয় হয়। সন্ধ্যের পূর্বে যোড়াসাঁকোর আত্মীয়দের প্রতিদিনই সমাগম হত। আমরা তাঁদের কারো কারো দ্বারা মেয়েদের পরীক্ষা গ্রহণ করাতুম—একবার রবি-মামার হাত দিয়ে প্রাইজ দেওয়ার সমারম্ভেরও ত্রুটি হয়নি। দিদির বিয়ের পর আমি কিছুকাল একলা সে স্কুল চালালুম। যখন আমার এণ্ট্রান্স পরীক্ষার দিন ঘনিয়ে এল, তখন সে স্কুল বন্ধ করতে হল।

উপর্যুপরি অনেকগুলি সন্তানবিয়োগ হয় দিদির। তাঁর হৃদয় স্নেহ-দানের জন্য বুভুক্ষিত ছিল। তিনি সখি-সমিতির আশ্রিত কোন কোন অনাথ বালিকাদের নিজের কাছে রেখে পালনের জন্য উন্মুখ হলেন। তারাই তাঁকে "মা" বলে। ঠিক নিজের মেয়ের মতো তাদের জন্যে সব করেন তিনি। এই সময় বরানগরে শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিষ্ঠিত বিধবাশ্রমের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। মায়ের প্রতিষ্ঠিত সখি-সমিতি যখন কাল-প্রভাবে ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ল, তখন তাকে সঞ্জীবিত রাখার চেষ্টায় দিদি তাকে নাম ও আকারের নানা পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে চালিয়ে বর্তমান বিধবা শিল্পাশ্রমে পরিণত করলেন। এই শিল্পাশ্রমটি তাঁর একান্ত উদ্যম, বিপুল অধ্যবসায় অনেক দ্বন্দ্ব ও অনেক প্রীতি দিয়ে গড়া।

তাঁর দেশসেবার অনুপ্রেরণা মাতৃভক্তি হতে এসেছিল; মাতার কীর্তি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে সখি-সমিতিকে কালোপযোগী রূপান্তর দেওয়ার প্রচেষ্টায় বিধবা শিল্পাশ্রমের জন্ম। নিজের বলে যা কিছু তার প্রতি তাঁর যেমন অনুরাগ, সেই নিজের কিছুটার বিরুদ্ধে যে কেউ এতটুকু হাত তুলতে আসছে বলে সন্দেহ হয়েছে, তাঁর তার প্রতি তেমন খরদৃষ্টি, তার বিরুদ্ধতা থেকে নিজেরটিকে বাঁচানর দৃঢ়তা। তাই প্রখরে-মধুরে মিশ্রিত ছিলেন দিদি। যারা তাঁর মাধুর্যের স্পর্শে এসেছে, তারা চিরমুগ্ধ, অন্যেরা চিরক্ষুব্ধ।

একবার মা যাচ্ছিলেন মেজমামার সঙ্গে কারোয়ারে। কতদিন ধরে তার জন্যে উদ্যোগ-আয়োজন চলছিল। বাড়িতে দর্জি বসে গিয়েছিল, মায়ের জন্যে নতুন নতুন কাপড় সেলাই চলছিল। সঙ্গে সঙ্গে দিদিরও দু-চারখানা হয়ে যাচ্ছিল। মা যাবার দুদিন আগে থেকে দিদির চোখে জল এল। মা তাঁর সঙ্গিনী ছিলেন—তাই মায়ের সঙ্গহীন দিনগুলোর কল্পনায় তাঁর চোখ জলে ভরল। আমার পক্ষে মা এ-বাড়ি থাকুন বা মেজমামার বাড়িতে কারোয়ারে গিয়ে থাকুন--কোন তফাৎই হয় না। তাঁর সঙ্গ আমি কখনো পাইনে—দূরে দূরে ঝি-চাকর, পণ্ডিত-মাস্টার, পড়াশুনার মধ্যেই থাকি। তাই তাঁর বিরহ-সম্ভাবনা আমার মনে কোন ঢেউ তুললে না। দিদি বিয়ের কয়েক বছর পরে নিজের বাড়ি চলে গেলে আমি একা যখন মায়ের কাছে থাকতে লাগলুম—দাদাও যখন বিলেতে, তখন থেকে মায়ের বেশী কাছাকাছি হলুম। সেদিন কিন্তু দিদির কান্নায় ও আমার চোখ শুকনো থাকায় প্রমাণ হয়ে গেল, আমি ভালবাসতে জানিনে। দিদিই খোঁটা দিলেন।

মার জন্যে সব করতে পারেন বলে সকলের জন্যেই কি পারেন? তা নয়। মা ছাড়া অধিকাংশেরই প্রতি দিদি পরম উদাসীন। কলকাতায় যে বছর জুবেয়ার সাহেবের অনুষ্ঠিত প্রকাণ্ড প্রদর্শনী হয়—মা তাঁর 'বকুলফুল'কে তাতে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে দিদির কাছাকাছি থাকতে বলেন—দিদি ভাল করে সব দেখাতে শুনতে পারবেন বলে। এদিকে সে প্রদর্শনী এত বড়, আর তাতে চিত্তাকর্ষক এত কিছু দ্রষ্টব্য রয়েছে যে, সেসব ফেলে বকুলফুলকে গাধাবোটের মত টেনে বেড়ান তাঁর পক্ষে কতক্ষণ সম্ভব? দিদি আপন মনের বেগে এ-ঘর ও-ঘর এ-আঙ্গিনা ও-আঙ্গিনায় ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছেন। এদিকে হেঁটে হেঁটে বকুলফুলের পা ব্যথা হয়ে গেছে, মাঝে মাঝে বেঞ্চে বসে যে বিশ্রাম করে করে যেতে

পারেন সে খেয়াল তাঁর মাথায় আসেনি। হঠাৎ আমাকে এক জায়গায় দেখতে পেয়ে ডাকতে আমি তাঁর কাছে গেলুম, আমার হাত ধরে ধরে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর অনুরোধে আমি তাঁর সঙ্গে সঙ্গে রইলুম। কিছু অসাধারণ কাজ করিনি, এ ছাড়া আর কিছু করা সম্ভবই ছিল না এ অবস্থায়। বাড়ি ফিরে গিয়ে বকুলফুল মার কাছে দিদির বিরুদ্ধে নালিশ আর আমার সম্বন্ধে তারিফ করলেন। উল্টো পুরাণ হল। আমি পেলুম ভীষণ লজ্জা—যেন দিদি ও মার কাছে অপরাধী! জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বকুলফুলের আমার প্রতি টান ও দিদির প্রতি মান যায়নি।

দিদির ভিতর নেতৃত্ব ভাব ছিল বলেছি—সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থাশক্তিও ছিল। তাঁর প্ল্যান করা, তাঁর দ্বারা "Conducted tour"এ ফণিদাদার কলেজের ছুটির সময় আমরা বছর বছর দেশভ্রমণে বেরতে লাগলুম। ফণিদাদাকে টেনে হিঁচড়ে দিদিই নিয়ে যেতেন। যা-কিছু বন্দোবস্ত করার দিদিই করতেন—স্টেশনে স্টেশনে নামা, ব্রেকভ্যান থেকে লগেজ নামান, সঙ্গী চাকরকে দিয়ে খাওয়া-দাওয়ার যোগাড় করা—এ সবেরই কর্তা দিদি। ফণিদাদা বড় স্টীমারে জোড়া ঢেউয়ে ঢেউয়ে ধাক্কা খাওয়া একখানা জলি-বোটের মত বিরক্ত হয়ে গজর গজর করতে করতে চলতেন। শেষ গন্তব্যে পৌঁছে থিতিয়ে বসে তবে স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে বাঁচতেন। আমি দিদিকে ঝঞ্ঝাট পোহাবার কতকটা সাহায্য করতুম। দাদা বিলেত চলে যাওয়ায় আর বাবামহাশয় আমাদের সঙ্গে যেতে অনিচ্ছুক হওয়ায় মা ও আমি এই দুজনেই কেবল দিদিদের সহযাত্রী হতুম। আমাদের ছেড়ে কোথাও যেতে দিদির সুখই হত না।

দিদি "ভারতী"তে মাঝে মাঝে প্রবন্ধ লিখে মায়ের সাহায্য করতেন। মৌলিক প্রবন্ধ তিনি লিখতেন না, কিন্তু প্রয়োজনীয় সাময়িক তথ্যের ইংরেজি হতে অনুবাদ করে বাঙলা পাঠকের সহজসাধ্য করা তাঁর কাজ ছিল। তাঁর নিজস্ব মৌলিক রচনা ছিল কতকগুলি সনেট। যেমন কারো কারো গানের গলা মিষ্টি ও করুণ, অথচ সে বড় গাইয়ে নয়—তাঁর কবিতা-গুলি ছিল সেই রকম সুমিষ্ট ও সকরুণ।

আমি যখন বি-এ পাসের পর মহীশূরে যাবার জন্যে ধরাধরি করলুম, আর অতিকষ্টে বাবামহাশয়ের সম্মতি পেয়ে সেখানে যাত্রা করলুম, দিদির প্রাণের সৌরভ আমার জন্যে দুটি সনেটের আকারে 'ভারতী'তে বেরিয়ে আমার হাতে মহীশূরের প্রবাসে পৌঁছল। দিদি

কিন্তু আমাকে ছাড়ান দিলেন না—'ভারতী'র যুগ্ম-সম্পাদকের কাছে ফেলে আমাকে দূর থেকে বাঁধলেন ঘরের সঙ্গে।

তাঁর হৃদয়ের কোরকে যে মাতৃস্নেহ আত্মোৎসর্গের জন্যে নিজের ছেলেমেয়ের অপেক্ষা করছিল, তার চরিতার্থতা হল অনেক বছর পরে। জগতের কাছে তাঁর শেষ মূর্তি তাঁর 'মা' মূর্তি। তাঁর ঘর আলো-করা বুকে ভরা দুটি ছেলে ও একটি মেয়েকে রেখে তিনি অনন্তশয়নে গেলেন।

॥ দশ ॥

উৎসব

বাঙালী ঘরের বার মাসে তের পার্বণ আমাদের জীবনে ছিল না। যোড়াসাঁকোর ছেলেমেয়েদের উৎসবের মধ্যে ছিল এক ১১ই মাঘ। সেটা অন্যদের দুর্গাপুজোর মত। অথচ দুর্গাপুজো উৎসবের অনেক অঙ্গ-বিচ্যুত আমাদের ১১ই মাঘ। প্রথমতঃ কুমোরের হাতে গড়া কালো মাটীর ঠাকুর ঢাকঢোল বাজিয়ে ঘরে এনে পুজোর দালানে স্থাপন করা, তারপর তাতে চোখের সামনে রং লাগান, চক্ষুদান—এসবের আমোদ ছেলেদের মোটেই হত না। এইতেই ত সাকার পুজোয় ও নিরাকার ব্রহ্মোপাসনায় তফাৎ হয়ে গেল দ্বারকানাথ ঠাকুরের স্ট্রীটস্থ ৬নং বাড়িতে ও অন্যান্য ঠাকুর বাড়িতে—এমন কি পাশাপাশি ছয়ের এক—৬। ১—নম্বরের বাড়িতে। এটি ছিল আমাদের প্রমাতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুরের সময় বাড়ির সব পুরুষদের বৈঠকখানা বাড়ি। পরে ভাইদের সঙ্গে মাতামহ দেবেন্দ্রনাথের বিষয় বিভাগ হলে—এটি হয়ে গেল তাঁর ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রদের বাড়ি। গগনেন্দ্র সমরেন্দ্র ও অবনীন্দ্রের পিতা গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর আমার মা ও মাতুলদের খুড়তুত ভাই ছিলেন। তাঁদের ৬। ১নংয়ের বাড়িতে সবরকম পুজো আর্চা চলতে থাকল—শুধু ৬নংয়ে বন্ধ হয়ে গেল। তাঁরা অন্যান্য শাখার ঠাকুর গোষ্ঠী জ্ঞাতিদের স্রোতে গা ঢেলে দিলেন—৬নং সে স্রোত থেকে উঠে তীরে এসে দাঁড়াল একা। শুধু ধর্মগত বিশ্বাস ও পারিবারিক আচার-ব্যবহারে মহর্ষির বাড়ি আলাদা রইল তা নয়, সামাজিক মেলামেশা, পরস্পরের ক্রিয়াকর্মে যৌতুকাদি আদান-প্রদান, যাতায়াতাদিও বন্ধ হয়ে গেল। কেবল

গুণ মামার সঙ্গে বড়মামা মেজমামাদের সোদরোপম ভ্রাতৃস্নেহ থাকায় এ দুবাড়ির পুরুষদের সামাজিক সম্বন্ধ একেবারে বিচ্ছিন্ন হতে পারেনি—মেয়েদের হয়ে গিয়েছিল। পারিবারিক আচার অনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাপক বাড়ির কর্তারা হলেও, তার ধারক, চালক ও পোষক মেয়েরাই হন—গীতায় তাই বলা হয়েছে—বাড়ির মেয়েরা বিগড়লে বা বিমুখ হলে কুলাচার টেঁকে না। ও-বাড়ির কোন পুজাপার্বণে এ-বাড়ির বৌঝিরা যাওয়া বন্ধ করলেন, মহর্ষির কুলাচার স্বতন্ত্র হল, মহর্ষির ভাইদের কুলাচার পূর্ববৎই রইল। কিন্তু হিন্দু সাকারবাদীর পক্ষে নিরাকারেও ভগবদুপাসনা লঘুস্মন্য নয়। তাই এ-বাড়ির ১১ই মাঘের উপাসনায় যোগ দিতে ও গান শুনতে ও-বাড়ির সবাই আসতেন—মেয়েরাও। পাথুরিয়া-ঘাটা থেকে রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর প্রভৃতি বাড়ির কর্তারাই কিন্তু শুধু দুপুরবেলা একবারটি এসে মহর্ষির নিমন্ত্রণ রক্ষা করে চলে যেতেন, মেয়েরা নয়, মেয়েদের কাছে নিমন্ত্রণ পৌঁছতও না। বিজয়ার প্রণামও তাঁরা দিতে আসতেন। বাইরেই আসতেন, বাইরেই বসতেন, বাইরে থেকেই চলে যেতেন। তাঁদের আগমনবার্তা অন্দরে পৌঁছলেই বাড়ির মেয়ে বউয়েরা খড়খড়ি দিয়ে উঁকিঝুঁকি মেরে তাঁদের দেখতে ধাবিত হতেন। ক্রমেই বেশি ছাড়াছাড়ি হতে লাগল। উত্তরপুরুষে মহর্ষির পরিবারের সঙ্গে অন্যান্য ঠাকুর পরিবারের ব্যবধান উত্তরোত্তর বাড়তে থাকল, আর মহর্ষির ভাইয়ের পরিবারের সঙ্গে কমতে থাকল। ৬।১নং পাথুরিয়াঘাটা কয়লাহাটার সঙ্গে বৈবাহিকসূত্রে আবদ্ধ হতে লাগল। ৬নং রইল উন্নতশিরে দাঁড়িয়ে একা, নিজের বিশ্বাসে অটল, বিচারে স্বাধীন, আচারে স্বতন্ত্র। এমন দিন এল ব্যবহারগত যেসব সংস্কারে মহর্ষির পুত্রকন্যরা অগ্রণী হয়েছিলেন সমস্ত ঠাকুরগোষ্ঠীর শাখা-প্রশাখায় তা অনুপ্রবিষ্ট হল—অন্তঃপুর-প্রথা উঠে গেল, স্ত্রী-শিক্ষার প্রচার হল, সঙ্গীতানুশীলন মেয়েদের জীবনের অঙ্গ হল। ভেদ রয়ে গেল শুধু পুজা ও উপাসনাপদ্ধতিতে—এক কথায় ব্রহ্মোৎসবে বা দোল-দুর্গোৎসবে।

আমরা তাই আর কিছু জানিনে, দেখিনি—শুধু ব্রহ্মোৎসব দেখেছি। অতবড় কথাটা আমাদের মুখ দিয়ে বেরোত না—আমাদের মুখে ও মনে ছিল শুধু একটি কথা "১১ই মাঘ"। সাধারণ ব্রাহ্ম ও নববিধানীদের কারো ছিল ১০।১৫ দিনব্যাপী, কারো একমাসব্যাপী ব্রহ্মোৎসব, আমাদের ছিল শুধু একটি দিন, ১১ই মাঘ। কিন্তু আমাদের শৈশবে সেদিনের

আগমনীস্বরূপ আসত একমাস আগে থাকতে উঠানে লোহার থাম। অতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ও অত্যন্ত ভারি ভারি থাম, তার একটু ধাক্কা লাগলেই মাথা ফেটে যেতে পারে। সেগুলিকে দিনকতক ধরে খানিকটা তফাৎ তফাৎ করে উঠানধারে লাইন টেনে ফেলে রাখা হত। তারপর অনেক হাত নীচু পর্যন্ত গর্ত খুঁড়ে বনিয়াদ মজবুত করে সেগুলি পোঁতা হত। ১০ই মাঘে এক থাম থেকে আর এক থামে গাঁদাফুলের মালা লম্বা করে ঝুলিয়ে দেওয়া হত, আর তার মাঝে মাঝে থামের গায়ে শামাদান ও দেওয়ালে বেলোয়ারের ঝাড় লাগান হত। উপরের দুদিককার বারান্দায়ও ঝাড় টাঙ্গিয়ে রাখা হত। মোমবাতি কিন্তু মাত্র একদিন আগে বসান হত, বেশী আগে বসালে পাছে চুরি হয়ে যায়।

৯ই মাঘের দিন বিকেলবেলায় তেতালার ছাদ থেকে উঠানের উপর শামিয়ানা খাটান হলে সমস্ত বার বাড়িটা অন্ধকারে ছেয়ে যেত। কিন্তু সেই অন্ধকারই আমাদের মনে উৎসবের ভাবকে ঘনিয়ে আনত। বিজলীর প্রচলনে যেবার প্রথম উঠানে থাম আনা ও পোঁতা বন্ধ হল আমাদের আনন্দের একটা বড় অংশ কেটে ফেলে দেওয়া হল। বিজলীর দীপ-মালাতে চোখ অভ্যস্ত হতে ও মন তাকে মঞ্জুর করতে কয়েক বৎসর কাটল।

এ-বাড়ির ১১ই মাঘের উৎসব এবং ও-বাড়ির পূজায় একটা কিন্তু বড়রকম পার্থক্য ছিল ছেলেমেয়েদের পক্ষে—নতুন কাপড় পরা না পরায়। ১১ই মাঘে আমাদের নতুন কাপড় পরার কোন রেওয়াজ ছিল না, ভাল সাজগোজ করা হত এই পর্যন্ত। একমাস আগে থাকতে ঘুরে ঘুরে 'পূজোর বাজার' করে করে বাড়ির প্রত্যেক লোকটির হাতে নতুন কাপড় জামা উপহার দেওয়ার জন্যে সমগ্র বাঙালী জাতি যে নিযুক্ত থাকে, কলকাতার রাজপথে সেই সময় বড়মানুষদের ঘর থেকে মেয়ের শ্বশুর বাড়ি যে পূজোর তত্ত্ব বাহিত হয়—আমাদের বাড়িতে সে সবের কিছুই ছিল না। তাই প্রিপ্যারেটরি ক্লাসে উঠলে যখন একদিন আমাদের রচনার বিষয় দেওয়া হল, "A comparison between Xmas & Durgapuja"—আমার মাথায় বিশেষ কোন কথাই জুটল না। যে বিষয়ে জানি না কিছু, সে বিষয়ে লিখব কি? শিক্ষয়িত্রী আমাকে চুপ করে বসে থাকতে দেখে ইঙ্গিত দিলেন—"Xmasএ বাড়ির লোকের সঙ্গে মিলনের জন্যে ইংরেজরা যেমন উন্মুখ থাকেন পূজোর ছুটিতে বাঙালীরাও তেমনি। Xmasএ খ্রীস্টানেরা পরস্পরকে যেমন উপহার দেন—পূজোর সময় হিন্দুরাও তেমনি।" এই মোটা রকমের কতকগুলি সাদৃশ্যের ইঙ্গিত

পেয়ে একটা কিছু ধরতে ছুঁতে পেলুম—নয়ত ও বিষয়ে মাথা আমার একেবারে ফাঁক ছিল। যা লিখলুম এবার তাতে একটা রচনা খাড়া হয়ে উঠল বটে—কিন্তু লেখাটা নিজের অভিজ্ঞতাপ্রসূত হল না, নিজের হৃদয়-রসে জড়ান হল না।

আমার বোধ হয় নতুন কাপড় পরাটা দুর্গাপূজোর আনুষঙ্গিক ছিল বলেই দাদামশায় ১১ই মাঘের ব্রহ্মোপাসনায় সে জিনিসটা একেবারে স্থানই দেননি। কিংবা হয়ত ১১ই মাঘের উৎসব একটি বীজের ক্রমোদ্ভব—তাঁর বাড়িতে রামমোহন রায়ের প্রবর্তিত প্রথম ব্রহ্মোপাসনার সাম্বৎসরিক অনুষ্ঠানের অনুবৃত্তিমাত্র, মূলত পারিবারিক কোন ব্যাপার নয়, সুতরাং এতে পারিবারিক কোন বিশেষ বিধানের স্থান নেই, এই জন্যে সেদিন পরিবারে সকলের নতুন কাপড় পরার অবশ্যকর্তব্যতা বিবেচিত হয়নি—বলতে পারিনে। ফলে ঐ দিনে নতুন কাপড় পরার সংস্কার আমাদের রক্তেমজ্জায় বসে যায়নি। বিজয়ায় পরস্পর-মিলন এবং সম্পর্ক-অনুযায়িক প্রণাম বা আলিঙ্গনাদি ব্যাপারও এ পরিবারের সংস্কারভুক্ত হয়নি। সেটা পরিবারের কারো কারো মধ্যে প্রচলিত হল আশু চৌধুরী ও তার ভ্রাতাদের সঙ্গে বিবাহসূত্রে জড়িত হয়ে তাঁদের পরিবারের অনুকরণে। কিন্তু আমাদেরও একটি পারিবারিক উৎসবের দিন ছিল যেদিন পরস্পরকে আলিঙ্গন প্রণামাদি করা হত। সে নববর্ষে, ১লা বৈশাখে। নতুন কাপড় পরার কতকটা রেওয়াজও সেইদিনটিতে ছিল। এক হিসেবে এই আমাদের যথার্থ পারিবারিক মিলনের দিন। সেদিন অতি ভোরে ব্রাহ্ম-মুহূর্তে দেউড়িতে ঘণ্টা বেজে উঠত। ঘুমিয়ে থাকলেও জেগে উঠে, বাড়িসুদ্ধ পুরুষেরা সকলে প্রস্তুত হয়ে নবশুভ্রবস্ত্র পরিধান করে, উঠানে উপাসনা-সভায় সমবেত হতেন, আর মেয়েরা খড়খড়িতে। উপাসনাদি হয়ে গেলে বয়সের তারতম্য অনুসারে প্রণাম আলিঙ্গনাদি শেষ করে—মেয়েমহলেও—সরবৎ পান করান হত বাইরে—তার বাড়ির লোকদের সেদিন সকলের একত্র ভোজন হত মধ্যাহ্নে। এক হিসেবে নববর্ষের মিলনোৎসবটি বেশি অন্তরঙ্গভাবে পারিবারিক হলেও ১১ই মাঘের উৎসবটিই উৎসব বলে আমাদের মনে প্রতিভাত হত। যাই হোক গুণে গেঁথে এই দুটি সামাজিক উৎসব ছিল আমাদের। বাকি যা ছিল—পৌষ-সংক্রান্তিতে পিঠে গড়া—সেটা একটা বিরাট অনুষ্ঠান বটে—এতবড় পরিবারের অনুকূল—কিন্তু বাইরের সঙ্গে সংযোগের অভাবে ততটা উৎসবের মত নয়—ঘরোয়া আনন্দ, ননদ-ভাজ মেয়ে

বৌরা মিলে গড়া ও বামুনেরা ভেজে দিলে এ-ঘর ও-ঘরে বণ্টন করা।

১১ই মাঘের উৎসব ছিল উপাসনা ও সঙ্গীত-প্রধান উৎসব। সেকালের ১১ই মাঘের বেদীতে উপবিষ্ট হতেন তিনজন আচার্য—তার মধ্যে কখনো কখনো দ্বিজেন্দ্রনাথ বা সত্যেন্দ্রনাথও একজন আচার্য হতেন—তাঁদের সমবেত কণ্ঠে বিশুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণের বেদমন্ত্রধ্বনিতে কর্ণ [তৃপ্ত হ'ত। ভক্ত দর্শকে] অর্ধেক উঠান ভরে যেত। বাকী অর্ধেক আগন্তুক আসত সঙ্গীতের মোহে। এমন বেদধ্বনিও বাঙলায় কেউ কোথাও শোনেনি ইতিপূর্বে, আর এমন গুরুগম্ভীর অথচ সুমধুর সঙ্গীত-রসে প্লাবিত হয়নি বাঙলার অঙ্গন। নদীয়ার কীর্তন এক জিনিস—এ আর এক জিনিস। বৈষ্ণব ভক্তদের কীর্তন ভাবেতে মজে দশাপ্রাপ্ত হয়ে ধুলায় অবলুণ্ঠন প্রধান, আর ১১ই মাঘের সঙ্গীত ভাবেতে উড্ডীন হয়ে মর্ত হতে স্বর্গে আরোহণ প্রধান। বিশেষত রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর ভ্রাতাদেরসহ ১১ই মাঘের সঙ্গীতের আসরে নামলেন তখন ব্রহ্মের উপাসনায় হৃদয়ের কোণে কোণে যেখানে যত নদী খাল বিল শুকনো ছিল সব ভরে উঠল। আর "মনে কর শেষের সেদিন কি ভয়ঙ্কর" নয়, শুধু "তুমি অগম্য অপার" ইত্যাদি বর্ণনামূলক নির্গুণ ব্রহ্মের স্তুতি নয়। এখন হল সমস্ত বাহ্য বা অন্তর-প্রকৃতিতে প্রতিভাত সগুণ ঈশ্বরের আবাহন। বৈষ্ণবদের লক্ষ্মী বিষ্ণু বা শাক্তদের শিব কালীর স্থলে খ্রীস্টানদের Personal God-এর অবতারণা—

"বিশ্ববীণা-রবে বিশ্বজন মোহিছে
স্থলে জলে, নভতলে বনে উপবনে,
নদী নদে, গিরি গুহা পারাবারে।"

* * * *

"আজ আনন্দ প্রেমচন্দ্রে নেহারো
হৃদি-গগন-মাঝে!
করি জীবন সফল।"

* * * *

হল— "তোমার কথা হেথা কেহত বলে না
করে মিছে কোলাহল,
সুধা-সাগরের তীরেতে বসিয়া
পান করে শুধু হলাহল!"

* * * *

হল— “অনেক দিয়েছ নাথ!
আমার বাসনা তবু পূরিল না
দীন দশা ঘুচিল না, অশ্রুবারি মুছিল না
গভীর প্রাণের তৃষা মিটিল না মিটিল না!
দিয়েছ জীবন মন, প্রাণপ্রিয় পরিজন
সুধাস্নিগ্ধ সমীরণ, নীলকান্ত অম্বর
শ্যাম শোভা ধরণী!
এত যদি দিলে সখা,
আরো দিতে হবে হে,
তোমারে না পেলে আমি
ফিরিব না, ফিরিব না!”

Personal God-এর অনুভূতি নিরাকারত্বে হয় না। যিনি চক্ষুষঃ চক্ষুঃ শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং তাঁকে চক্ষুকর্ণবান চরণহস্তবান বলে কল্পনায় না আনলে অন্তরে তাঁকে অঙ্গবান করে না দেখলে তাঁকে পাওয়াই হয় না। তাই রামমোহন যুগের পরবর্তী ব্রহ্মোৎসবের রবীন্দ্রের ব্রহ্ম বা ঈশ্বর ‘অপাণিপাদ’ নন, তিনি ‘সর্বতো অক্ষি’ ‘সর্বত্র শিরোমুখ’। তাই তাঁর পরিচালিত ১১ই মাঘে পর পর গাওয়া হয়েছে—

“বড় আশা করে এসেছি গো
কাছে ডেকে লও
ফিরায়ো না জননি।
আর আমি যে কিছু চাহিনে,
চরণতলে বসে থাকিব,
আর আমি যে কিছু চাহিনে,
‘জননী’ বলে শুধু ডাকিব।”

* * * *

“আজি শুভ দিনে পিতার ভবনে
অমৃত সদনে চল যাই।”

* * * *

“সকাতরে ঐ কাঁদিছে সকলে
শোন শোন পিতা।”

* * * *

"হেরি তব বিমল মুখভাতি
দূর হল গহন দুখরাতি।"
* * * *

"এস হে গৃহদেবতা এ ভবন
পুণ্য প্রভাবে কর পবিত্র!"
* * * *

"তব প্রেম-আঁখি সতত জাগে
জেনেও জানি না।"
* * * *

হল— "এ কি অন্ধকার এ ভারতভূমি
বুঝি পিতা তারে ছেড়ে গেছ তুমি
প্রতি পদে পদে ডুবে রসাতলে
কে তারে উদ্ধার করিবে।"

আর কত তুলব? আদি ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্মসঙ্গীত পুস্তকের প্রথম ভাগ থেকে দশম একাদশ ভাগ পর্যন্ত যত দূর ছাপান হয়েছে সগুণ সাকার ঈশ্বর ভাবের সব রকম সঙ্গীত স্তরে স্তরে সঞ্চিত আছে। ভাবের ও ভাষার পার্থক্য দেখলে চিনতে পারা যাবে রামমোহন রায়ের সময়কার নিরাকার ব্রহ্ম কেমন করে ভাবের ঘরে একদম সাকার হয়ে নেমে ব্রহ্মবাদীর আকার-নিরাকার অভেদ জ্ঞানের ভিত্তিই পুনঃস্থাপিত করলেন। অথচ ভাবের ছবির চৌকাঠ পেরিয়ে গেলেই—মাটি-খড়ে, ধাতু-প্রস্তরে, বর্ণে-চিত্রে ভাবের উপলক্ষ্য ভগবানকে পূর্ণ লক্ষ্য করে মূর্ত করে আঁকড়ে ধরলেই রবীন্দ্রনাথ উত্ত্যক্ত বিচলিত হয়ে উঠতেন। তাঁর আজন্ম 'নিরাকার' পূজার সংস্কারে ঘা লাগত। আশু চৌধুরী ও তাঁর ভাইদের সঙ্গে যোড়াসাঁকোর বৈবাহিক সংযোগ স্থাপনের কিছু পরে তাঁর ভগ্নী ডাক্তার উমাদাস বাঁড়ুয্যের পত্নীর সঙ্গে আমরা অনেকে ছুটী যাপনে বেনারসে যাই। প্রমথ চৌধুরীর তখন ইন্দিরার সঙ্গে সদ্য বিবাহ হয়েছে। তাঁরাও ছিলেন। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রকাণ্ড বাড়ি হরধাম-এ আমরা সবাই ছিলুম। বৌবাজারের বসু মল্লিক পরিবারের হেম মল্লিকও সেবার সপরিবারে বেনারস গিয়েছিলেন। এক রাত্রি আমাদের বিশ্বেশ্বর মন্দিরের প্রসিদ্ধ আরতি দেখানর জন্যে তিনি বন্দোবস্ত করলেন। আমরা সবাই মন্দিরের সামনে বসলুম। পাণ্ডারা আমাদের চারিদিক ঘিরে রক্ষে করতে লাগল—যাতে ভিড় ভেঙ্গে আমাদের উপর না পড়ে। সে কি আরতি! আর

ভক্তের কি ভিড় ও জয়োল্লাস! বিশ্বেশ্বরের সে আরতি দেখে চিত্ত পুলকিত নমিত না হয়ে যায় না। এতদিন শুধু গুরু নানকের পদভাঙা রবীন্দ্রের ব্রহ্মসঙ্গীত বলে গাইতুম—

"তাঁর আরতি করে চন্দ্র তপন
দেব মানব বন্দে চরণ
আসীন সেই বিশ্ব শরণ
তাঁর জগৎ মন্দিরে।"

আজ সেই গানের ভাবেরই সত্যবৎ অনুভূতি লাভ হল। আরতি শেষে শত সহস্র বৎসর ধরে অগণ্য ভক্তের ভক্তিভাব-ভরিত সেই গগনতলে বিশ্বেশ্বরের মন্দির-দ্বারে আজকের সহস্র সহস্র ভক্তদের ভক্তি-তরঙ্গে ভক্তি মিলিয়ে আমরাও উদ্দেশে প্রণত হলুম।

এই কথাটা কলকাতায় ফিরে গেলে রবিমামার কানে যখন পৌঁছল তিনি আমাদের প্রতি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও রুষ্ট হয়ে বললেন—"তোরা এই রকম করে পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় দিলি? মিথ্যাচার করলি?"

হায়! ৬নং যোড়াসাঁকোর বাঁধা অবিশ্বাসের পথ থেকে সরে অনেক ছেলেমেয়ে বউই যে যুক্তির অবলম্বনেই পুরোন বিশ্বাসের valley-তে চলে এসেছেন সে বিষয়ে ক্রমেই যত পরিচয় পেতে থাকলেন ততই রবিমামা ক্ষুন্ন হতে থাকলেন।

ছেলেবেলায় ১১ই মাঘের সঙ্গীতে আমরা যে অংশ গ্রহণ করতুম, সে বড়দের দ্বারা চালিত নিয়ন্ত্রিত হয়ে যতটুকু করবার ততটুকু মাত্র; দিন পনের আগে থেকে গান-অভ্যাসের আসরে বসে গান শেখা ও সে রাত্রে গান গাওয়া এবং গানের সঙ্গে সঙ্গে বাজান। কিন্তু কয়েক বছর পরে নিয়ন্ত্রণের ভার কিছু কিছু আমরাও নিলুম। আমাদের সঙ্গীতপ্রেম সেদিনটাকে কিছুটা নিজের নিজত্ব না দিয়ে পারলে না। আমরা চারজনে —সুরেন, বিবি, দাদা ও আমি—প্রত্যেকে একটা না একটা কিছু যন্ত্র বাজাতুম—কেউ কেউ দুটো তিনটেও বাজাতে পারতুম—হার্মোনিয়ম্ বাজানটা ত আমাদের গণ্যর মধ্যেই ছিল না! আমরা আপনা-আপনির মধ্যেই ইংরেজী গতের কন্‌সার্ট প্রায়ই করতুম। ১১ই মাঘের সঙ্গীত প্রোগ্রামে প্রতি গানের আরম্ভে সেই গানের রাগ বা রাগিণীর খানিকটা আলাপ মিলিতযন্ত্রে খানিকক্ষণ ধরে করে তারপর গানটি ধরতে লাগলুম। আমাদের এই দলে প্রতিভা দিদির কোন কোন বোনও থাকতেন। সে সময়ে এবিষয়ে এত উৎসাহ ছিল আমাদের মনে পড়ে—একবার সকালের

উপাসনায় যোড়াসাঁকোয় এসে, খেয়েদেয়ে আবার আমরা বির্জিতলায়—তখন মেজমামীরা সেখানে থাকতেন—ফিরে গেলুম, সেখানে সন্ধ্যের কন্সার্টের জন্যে খানিকক্ষণ নিরিবিলি প্র্যাকটিস করে জিনিসটা সর্বাঙ্গশোভন করতে পারব বলে। আবার সন্ধ্যের পূর্বেই যন্ত্রপাতি ঘাড়ে করে আমরা এসে স্ব স্ব স্থান গ্রহণ করলুম। গানের পূর্বে ইংরেজী ধাঁচের এই রকম খানিকটা উপক্রমণিকার দস্তুর এখন Radio এবং Gramophone Record গানে ঢুকেছে। সে সময় বাঙলা গানে এটা সম্পূর্ণ নতুন ছিল।

একেই যোড়াসাঁকোর ছেলেমেয়েরা উৎসব-আনন্দে পরিক্ষীণ ছিল, ১১ই মাঘ ছাড়া কোন বড় উৎসব তাদের ছিল না—তার উপর লাহোর থেকে একবার ফিরে দেখি সেটিও তাদের প্রায় চলে গেছে। শান্তিনিকেতনে রবিমামার আশ্রম জমে উঠবার পর থেকে তিনি বাড়ির ছেলেমেয়েদের ত্যাজ্য করে তাঁর আশ্রমের ছেলেমেয়েদের প্রাধান্য দিতে লাগলেন। ১১ই মাঘের উৎসবের জন্যে গান ও বাজনার প্র্যাকটিসে বাড়ির ছেলেমেয়েদের আর যোগ রইল না। বোলপুর আশ্রমের ছেলেমেয়েরাই একেবারে সেখান থেকে তৈরি হয়ে এসে গাইতে বসে যায়। আগেকার সঙ্গীতের অংশবহনে প্রতিভা দিদির যে বোনেরাও যুক্ত ছিলেন—তাঁদের কাছে অনুযোগ শুনলুম—আমরা এ বাড়ির মেয়েরা কোথায় যাই? আমাদের আর পালপার্বণ নেই, ঐ একটি ১১ই মাঘ। হিন্দু বাড়িতে দুর্গাপূজার উৎসবে বাড়ির সব ছেলেমেয়েদের কি আহ্লাদ। লোকজনের আনাগোনা, আদর-অভ্যর্থনা, খাওয়া-দাওয়া, নতুন কাপড় পরে ঘুরে ঘুরে বেড়ান—তাদের কত রকমের আনন্দ! আমাদের ১১ই মাঘে পারিবারিক খাওয়া-দাওয়াও কবে থেকে উঠে গেছে, বাকী ছিল ঐ গানবাজনায় যোগটুকু। রবিকাকা তা থেকেও আমাদের বঞ্চিত করে দিলেন। সারা বছরের এই একটিমাত্র পারিবারিক উৎসব আমাদের—তাও রইল না। আমরা কি সাধারণ সমাজের দলে ঢুকব এখন, না নববিধানের? আমরা যদি হিন্দুসমাজের বক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়ি, তাতেও গঞ্জনা দেন। আমাদের ভাগ্যে তাঁর ঠাট্টা বিদ্রূপ অবজ্ঞা ঔদাসীন্য—পরের বাড়ির মেয়েদের ভাগ্যে ১১ই মাঘের উৎসব।

এ বড় ভীষণ মর্মব্যথার অনুযোগ। বাস্তবিকই কর্তা দাদামশায় থাকতে থাকতেই ব্যয়সঙ্কোচের উদ্দেশ্যে ১১ই মাঘের উৎসবের কায়া মলিন ও ক্ষীণ হতে আরম্ভ হয়েছিল। তাঁর দেহাবসানের পর থেকে ওটি

শীর্ণ-বিশীর্ণ হতে হতে এখন ত একরকম গতাসুই হতে চলেছে। যোড়াসাঁকোর উঠানখানা যতদিন রয়েছে, ততদিন বোধহয় কর্তা দাদা-মশায়ের উইল অনুসারে নমো নমো করেও ১১ই মাঘ চালাতে হবে। সে উঠান কিন্তু এখন রাজপথ। সেজমামার ছোট ছেলে ঋতুদাদার অংশ একজন মারোয়াড়ীর কাছে বিক্রীত। তাদের উঠান দিয়ে যাতায়াতের অধিকার আছে। ১১ই মাঘের উপাসনা ও গান যখন চলছে ঠিক সেই সময় সেই অংশের ছাদ ও খড়খড়ি বেয়ে মাড়োয়ার গিন্নীর উনুন জ্বালানর ধোঁয়া ও ফোড়নের গন্ধ উঠানে চলে আসে। আর নীচেরতলায় উঠানের গায়ে সংলগ্ন বাড়ির ভিতরমুখো সব অন্ধকেরে ঘরগুলি খোট্টা ও দেশ-বিদেশী ভাড়াটাতে ভরা। তাদের আগমন ও নিষ্ক্রমণের কোন সময় নির্ধারিত নেই। ১১ই মাঘ ব্রহ্মোপাসনা সভার ভিতর দিয়ে যার যার যখন খুশী সভা ভেদ করে গতায়াত করতে পারে ও করবে। এই দুর্যোগের দিন বোলপুরের ছেলেমেয়েরাও আর গাইতে আসে না—বোলপুরেই ধুমধাম করে ১১ই মাঘ হয়, এখানে কলকাতার বিভিন্ন রবীন্দ্র-সঙ্গীত-প্রতিষ্ঠানের ছেলেমেয়েদের জড় করে গানের যোগান হয়। যে সকল উৎসব অনুষ্ঠান যোড়াসাঁকোতে ছিল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পরিবারগত, তাঁর মৃত্যুর পর থেকে ক্রমশ হয়ে গেল তাঁর কীর্তিমান কনিষ্ঠ পুত্রের প্রতিষ্ঠানগত। যেমন ঐ বাড়ির ইমারৎখানার [ভিটাতে] মহর্ষির সম্পর্কিত যে কোন লোকের অধিকার নেই, তেমনি তাঁর প্রচলিত উৎসবাদিতেও আর তাঁর রক্তের বলেই কারো রক্তগত অধিকার নেই।

পদ্মা যেমন কত প্রাচীন কীর্তি ও কীর্তিমান বংশের অবলোপ করে সরে গেছে আর এক প্রান্তে, মহর্ষি ও তাঁর বংশের যোড়াসাঁকোস্থ কীর্তি-কলাপ তেমনি পাশ কাটিয়ে গেছে চলে শান্তিনিকেতনে—যার ছাতিম-তলার বুনিয়াদের উপর গড়ে উঠেছে অভ্রভেদী রবীন্দ্র তাজমহল। যোড়াসাঁকো এখন কুর্জনের কানুনের দ্বারা রক্ষণীয় ধ্বংসাবশেষ।

॥ এগার ॥

সংগীত

আজকাল বাঙলাদেশে মেয়েদের সঙ্গীত-বিদ্যা-বিশারদতায় কেউ কি কল্পনা করতে পারেন এমন দিন ছিল যখন এই বাঙলায় ভদ্রপরিবারের মেয়েদের মধ্যে সঙ্গীত-চর্চা একেবারে নিষিদ্ধ ছিল—যখন নিজের বাড়ির মেয়েদের কণ্ঠেও প্রকাশ্যে গান শোনা নিতান্ত দুর্লভ ছিল? তাইত ১১ই মাঘে ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের গানের আকর্ষণে কলকাতা ভেঙ্গে পড়ত। কিন্তু সে গান ধ্রুপদী চালের গাম্ভীর্য রক্ষা করা গান--সে পেশাদারী গায়িকাদের টপ্পা ঠুংরি খেয়ালের মূর্ছনায় মূর্ছনায় চিত্তবিঘূর্ণক গান নয়। রবিমামার সঙ্গে একবার আর একজনদের বাড়ি ব্রহ্মোৎসব সভায় গান গাইতে যাওয়া আমার মনে পড়ে—সে কাশিয়াবাগানের কাছাকাছিই কাশীশ্বর মিত্রের বাড়িতে। সেকালে খালি যোড়াসাঁকোয় ১১ই মাঘ হ্ত বটে কিন্তু আদিসমাজী দুই-একজন ভক্ত ব্রাহ্মের বাড়ি নিয়মিত ব্রহ্মোৎসব হ্ত। তাঁরা আদি ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্ম—তার অর্থ তাঁরা সাধারণ ব্রাহ্মদের মত আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম নন—আদি ব্রাহ্মসমাজের বেদীতে যেসব আচার্যরা বসেন তাঁরাও নন—তাঁরা সমাজের উপাসনা-গৃহে বা উৎসবের সভায় অমূর্ত ব্রহ্মের আরাধক বটে; কিন্তু পারিবারিক ও সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে পূর্ববৎ পৌত্তলিক বিধানের অনুবর্তক। থিওরিতে ও প্র্যাকটিসে তাঁরা এক নন। এইরকম একটি ব্রাহ্ম ছিলেন নন্দবাগানের কাশীশ্বর মিত্র। আমাদের কাশিয়াবাগান বাড়ির ফটকের বাইরেই একটা মস্ত লম্বা পুকুর ছিল। তার আশপাশে গৃহস্থদের বাস। এ পুকুরে তাদের স্নান করা বাসনমাজাদি কাজ চলত, কিন্তু এর জল মিঠে নয় বলে খাওয়া চলত না। সেই জন্যে আমাদের বাড়ির পুকুর থেকে পাড়ার মেয়েরা খাবার ও রাঁধবার জল নিয়ে যেত। আমাদের পুকুরের নাম ছিল পাড়ায় "মিছরি পুকুর"। কাশীশ্বর মিত্রের বাড়ির ঘাট ঐ পুকুরের উপর। তাঁর বড় ছেলে শ্রীনাথ মিত্রের স্ত্রীর সঙ্গে আমার মায়ের 'বকুলফুল' পাতান হয়েছিল। সে বছর তাঁদের বাড়ির ব্রহ্মোৎসবে রবিমামার ও আমার দুজনেরই গান হল। রবিমামার গলা তখন কি সুমিষ্ট আর তাঁর গান গাওয়া কি ভাব দিয়েই—১১ই মাঘের অক্ষয়বাবুদের দলের গানের সঙ্গে কি তফাৎ! রবিমামা ত একদিন গেয়েই চলে গেলেন, আমার ডাক

পড়তে লাগল হপ্তায় হপ্তায় তাঁদের রবিবারের অধিবেশনে। তাছাড়া মধ্যে মধ্যে তাঁদের বাড়ির ভিতরে পারিবারিক আসরেও। ঘণ্টার পর ঘণ্টা গানের পর গান গেয়ে যাই নানা রকমের—শ্রান্ত হইনে। সেকালে যোড়া-সাঁকোয় পাতানর রেওয়াজটা খুব ছিল—আমার মায়ের অনেকগুলি পাতান সখী ছিলেন। কাশিয়াবাগানে এসে বকুলফুলের পর হলেন "মিষ্টি হাসি!" ইনি বৌবাজারের এটর্নী শ্রীনাথ দাসের পুত্র 'সময়'-সম্পাদক জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের পত্নী। এঁদের বাড়িতে আমার জন্যে গানের আড্ডা জমতে লাগল। অবিরাম non-stop গান—চার-পাঁচ ঘণ্টা ধরে। গলা ব্যথাও হত না, শরীর ক্লান্তও হত না। তখন ১০।১১ বছর বয়স আমার। এর পর ব্যারিস্টার ডবলিউ সি ব্যানার্জির পত্নীর বাড়ি মধ্যে মধ্যে সখি-সমিতির অধিবেশন হতে লাগল—তাঁর ননদরা অনেকেই থিয়সফিস্ট ছিলেন। সেখানেও আমার উপর গানের ফরমাসের শেষ নেই। সেকালে মেয়েদের মধ্যে গাইয়ের অপ্রাচুর্যতাবশতঃই আমার এত ডাক ছিল। মনে পড়ে মনোমোহন ঘোষ ব্যারিস্টারের ওখানে বঙ্গ নাটকে ও অন্যান্য বড় সাহেব-মেমকে ডিনার ও ঈভনিং পার্টি দেওয়া উপলক্ষে মিসেস ঘোষ ৪নং থিয়েটার রোড থেকে ছুটে ছুটে কাশিয়াবাগানে আসতেন মা-বাবা ও আমাকে নিমন্ত্রণ করতে। ইংরেজী কায়দা অনুসারে তখনো আমার ডিনার পার্টিতে যাবার বয়স হয়নি—১৪ বছরেরও কম বয়সী আমি। ষোলর আগে কেউ বাইরে ডিনারে বসার উপযুক্ত গণ্য হয় না। কিন্তু necessity has no law—দিশী গান শোনাতেই হবে—সাহেব-মেমদের দেখাতে হবে আমাদের দেশের মেয়েরাও সঙ্গীতবিদ্যায় নিপুণা। তাই ইংরেজী গান ও বাজনার জন্যে প্রতিভাদিদি ও দিশীর জন্যে আমার প্রয়োজন ছিল। প্রতিভাদিদি খুব ভাল পিয়ানো বাজাতেন আর চমৎকার ইংরেজী গান গাইতেন। এমন কি প্রথম প্রথম তাঁর ইংরেজীয়ানা গলায় দিশী গান মানাত না, পরে ইংরেজী ছেড়ে হিন্দী গানেরই চর্চা আরম্ভ করলে তাতেই সুপটু হয়ে উঠলেন।

এর চেয়েও নিকটস্থ দিনের একটি ঘটনা মনে পড়ে। আমি লাহোর থেকে সেবার কিছু দিনের জন্যে কলকাতায় এসেছি। স্যার রাজেন মুখুয্যের বাড়ি হারকোর্ট বাটলারের বর্মায় গবর্নর হয়ে যাওয়ার উপলক্ষে বিদায় ডিনার পার্টিতে আমার নিমন্ত্রণ হয়েছে। প্রায় একশ লোকের ডিনার। স্যার ও লেডি আর এনের বিশেষ ইচ্ছা সে রাত্রে আমি গান গাই। সে রাত্রে হঠাৎ যাবার মুহূর্তে মায়ের মোটর গাড়ি বিগড়ে গেল—

ডিনারে যাত্রার সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে। ইংরেজী ডিনারপার্টি দেশী ভোজের পার্টি নয় যাতে যে যখন খুশী ধীরে সুস্থে গিয়ে উপস্থিত হল। এতে একেবারে ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় মিলিয়ে নিমন্ত্রণ-গৃহে উপস্থিত হওয়া চাই। বাড়ির গাড়ির আশা ছেড়ে ট্যাক্সি আনতে পাঠান হল। ট্যাক্সি আসতে দেরী হচ্ছে, আমি ছটফট করছি। সামনেই আশু চৌধুরীর বাড়ি, সব জানলায় আলো ঝকমক করছে। সেখানে লোক-সমাগম হয়েছে বুঝলুম—নিশ্চয়ই অনেক জানাশুনা লোকের গাড়ি এসেছে। চাকর পাঠান হল, আশুবাবুকে বলে একখানা বাইরে থাকা গাড়ি নিয়ে আসতে—গেরাজ থেকে তাঁর নিজের গাড়ি বের করে আনতে দেরী হবে বলে। চাকর ভিতরে ঢুকতেই পারলে না, আশুবাবুর সঙ্গে দেখা করতে পারা ত দূরের কথা। আমি হতাশ্বাসে বসে রইলুম—স্যার ও লেডি রাজেন মুখুয্যেরা কি ভাববেন! এতদূর অভদ্রতা! ইংরেজী ডিনার টেবিলে প্রত্যেকের আসন নির্দিষ্ট থাকে, কে কার পাশে বসবে নাম লেখা থাকে—কেউ অনুপস্থিত হলে শেষ মুহূর্তে সব বন্দোবস্ত উল্টেপাল্টে যায়, একটা বিশৃঙ্খলা এসে পড়ে। ট্যাক্সি এল কিছু বিলম্বে। আমি কোনক্রমে পৌঁছলুম—সবাই টেবিলে বসতে যাচ্ছেন—আমার জন্যে অপেক্ষা করে করে। যথেষ্ট লজ্জিত হলুম। রাজেন মুখুয্যে বিলম্বের কারণ শুনে বল্লেন—"আমায় একটা টেলিফোন করে দিলেন না কেন—তক্ষুনি গাড়ি পাঠাতুম।"

ডিনারের পর আমার গান হল। ওঁদের ফরমাস ছিল—ইংরেজী রকমে হার্মোনাইজ করা কোন গান গাইবার। আমি প্রথমে "ওগো বিদেশিনি" পরে "সুন্দর বসন্ত বারেক ফিরাও" গাইলুম। বিদায়কালে অতীব ভদ্র স্যার হারকোর্ট আমার কাছে এসে গভীরভাবে দেহ অবনত করে bow করে আমায় সুমধুর সঙ্গীত-এর জন্য ধন্যবাদ দিলেন। এটার আবশ্যকতা ছিল না, সেইজন্যেই ভদ্রতার অত্যাধিকতা।

স্যার হারকোর্ট বাটলার গবর্নর হিসেবে কি রকম লোক ছিলেন জানিনে—কিন্তু বিলেতের এই বাটলার পরিবার অনেক পুরুষ যাবৎ শিক্ষা ও সৌজন্যে তাঁদের নিজের দেশেও প্রসিদ্ধ। এঁরই ছোট ভাই মণ্টেগু বাটলার লাহোরে ডেপুটি কমিশনার ছিলেন। তাঁর আসার কিছু পূর্বে লাহোরে অনেক রাজনৈতিক বিপ্লব ঘটে গেছে, অনেক লোককে জেলে পাঠান হয়েছে। তাঁর শাসনকালেও কিছু কিছু গণ্ডগোল জারি ছিল—কিন্তু ক্রমাগত জেল ভর্তি করার পলিসি তাঁর ছিল না।

এই সময় "হিন্দুস্থান" নামে লাহোরের সাপ্তাহিক উর্দু রাজনৈতিক পত্রিকা প্রবলপ্রতাপী ছিল। ঘটনাচক্রে আমি তার স্বত্বাধিকারিণী এবং আমার স্বামী ও আমি দুজনে তার পলিসির নিয়ন্তা। অনেক খয়ের-খাঁ 'মুলাকাতের' দিন আমার স্বামী ও আমার নাম ডেপুটি কমিশনারের কানে তুলত। সর্দার অজিৎ সিংহের সহকর্মী সুফি অম্বাপ্রসাদ একজন বিখ্যাত উর্দু লেখক। তিনি ও তাঁর কয়েকটি সাঙ্গোপাঙ্গ জেল থেকে ছাড়ান পেলেই সেইদিনই আমি তাদের 'হিন্দুস্থান'এর সম্পাদনা কার্যে নিযুক্ত করলুম। সেটা অতি সাহসিকতার কার্য হল। কিন্তু ডেপুটি কমিশনার মণ্টেগু বাটলার সেজন্যে উতলা হয়ে আমায় রাতারাতি জেলে পাঠালেন না। তার পরদিন আমার স্বামীকে ডেকে বল্লেন, "তোমাদের শত্রু অনেক—বিশেষত তোমার স্ত্রীর। সুফি অম্বাপ্রসাদকে 'হিন্দুস্থানে' রেখেছ। সাবধানে কাজ নিও, শেষ পর্যন্ত আমায় যেন এরকম একজন মহিলার বিরুদ্ধে কঠোরতা অবলম্বন করতে না হয়।"

সুফি অম্বাপ্রসাদকে ডেপুটি কমিশনারের কথাটা শোনালে তিনি বল্লেন, "লোহা আমি, গায়ে মধু মেখে বসলেও আমার গা চাটলে জিবে শক্ত লোহারই পরশ লাগবে।" ওডায়ারের রাজত্বকালে সর্দার ও সুফি ভারতবর্ষ থেকে পালিয়ে মুসলমানবেশে তুর্কীতে পৌঁচেছিলেন এই গুজব। তখন ওডায়ারের হুকুমে 'হিন্দুস্থান' বন্ধ হয়েছে। শুনতে পাই ওডায়ারের সময় মণ্টেগু বাটলার পঞ্জাবের এককোণে অনাদৃত হয়ে পড়ে ছিলেন—তাঁর সিনিয়রিটির উপযুক্ত পদ তাঁকে দেওয়া হয়নি। শাসনকর্তার পরিবর্তন হলে অনেককাল পরে তিনি নাগপুরের গবর্নরের পদ পেলেন। তাঁরই ছেলে মিস্টার আর বাটলার বিলাতে Under Secretary of State ছিলেন কিছুকাল। Franchise Commission-এ ভারতবর্ষে আসেন, আমার সঙ্গে কলকাতায় দেখা হয়।

বম্বে অঞ্চলে মেজমামার কাছে যতবার গিয়ে থেকেছি খাস বম্বেতে যাইনি, বম্বে প্রেসিডেন্সীর মহারাষ্ট্র বিভাগের কোন না কোন শহরে বা লোকালয়ে গেছি—যেমন সোলাপুর, সেতারা, পুণা, পণ্ডরপুর, মহাবলেশ্বর ইত্যাদি। সেসব জায়গার বাসিন্দা মারাঠীদের সঙ্গীত-কুশলতার যথেষ্ট পরিচয় পেয়েছি। মেয়েদের নয়, পুরুষদের। তাঁদের কণ্ঠে মারাঠী বা হিন্দী উঁচুদরের গান শুনতেই সময় অতিবাহিত হয়েছে। ভাল গলায় ভাল গানের গন্ধ কোথাও পেলে হয়। বিড়াল যেমন মাছের গন্ধে বিহ্বল হয়, আমিও তেমনি গানের গন্ধে উতলা হতুম, যত

পারি লিখে নিতুম, শিখে নিতুম। নিজের ভাণ্ডারে না ভরলে আনন্দ পুরো হত না। সেতারায় সোহনি বলে একজন সাবজজ ছিলেন সুগায়ক। তাঁর কাছ থেকে সংগৃহীত একটি হোলির গান চমৎকার—পাঁব লগে কর যোড়ি শ্যাম মুঝে খেল ন হোরি। আর একটি গান ছিল কালী আর গোরীর ঝগড়া। এখানে আমার নিজের গানে সময় নষ্ট হওয়ার প্রশ্রয় দিতুম না, তাতে আমার সংগ্রহের সময়ে অকুলান হয়ে যাবে।

কিন্তু খাস বম্বে শহরে যখন একবার হপ্তা দু-তিনের জন্যে গিয়ে রইলুম একটি ভাটিয়া ক্রোরপতি বন্ধুর গৃহে—সমুদ্রতীরে 'দরিয়া মহলে' তখন আমার নিজের গান শুনান থেকে আর বিশ্রাম পেলুম না। গৃহপতি নারাণজী দ্বারকাদাস, তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গোবর্ধন দাস তেজপাল—যিনি অন্য এক প্রভূত ধনী পরিবারে দত্তক গৃহীত হওয়ায় পরিবর্তিতনামা হয়েছিলেন—তাঁদের তিন-চারটি ভগ্নী ও স্ব স্ব পত্নীসহ পুরীর জগন্নাথ দর্শনে তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে কিছুদিন কলকাতায় যাপন করেছিলেন। সেই সময় তাঁদের সুপরিচিত মিত্র এলাহাবাদের চারু মিত্র মহাশয়কে তাঁরা সংবাদ পাঠান। চারুবাবু আমার পিতার পরম বন্ধু ছিলেন। বম্বের মেয়েদের কলিকাতা পরিদর্শনে সাথী হওয়ার ভার দিলেন তিনি আমার উপর। তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে আলিপুরের চিড়িয়াখানা, বোটানিক্যাল গার্ডেন, মিউজিয়ম এইসব ঘুরে ঘুরে আমার সঙ্গে তাঁদের ভাব হয়ে গেল। বোনেরা কেউ কেউ কৃষ্ণভক্ত পরিবারে বিবাহিত, কেউ কেউ শিবভক্তর ঘরে। বম্বেতে এই দুই সম্প্রদায়ে সেকালে তুমুল বিতণ্ডা চলত—রামপ্রসাদের "পাঁচেই এক, একেই পাঁচ, মন কোরো না দ্বেষাদ্বেষি"র উপদেশে কেউ কান দিত না। নারাণজীর এক বড় বোন নন্দীবাঈ বৈষ্ণবের ঘরে পড়েছিলেন। আর তিনি গান গাইতেন ভারি সুন্দর, তাঁর গানের পুঁজিও অনেক ছিল, তার মধ্যে "যা যারে ভম্‌রা দূর দূর যা" আমার এখন মনে পড়ছে, কেননা সেটা আমিও আগেই জানতুম। এঁরা সপরিবারে আমার গানের উপর ঝুঁকে পড়লেন। যদিও বাঙলা ভাষায় গান আমার, তবু গুজরাটি ও হিন্দীর সঙ্গে কথার সাদৃশ্যে তাঁরা খুব উপভোগ করতে লাগলেন। খুব রসগ্রাহী রসিক তাঁরা। আমিও যেমন তাঁদের ফরমাস করি, তাঁরাও তেমনি আমাকে একটার পর একটা গানের ফরমাস করেন। দু-একটা গান তাঁদের কণ্ঠস্থ হয়ে গিয়েছিল—"সে আসে ধীরে, যায় লাজে ফিরে, রিনিকি রিনিকি

রিনিঝিনি, মঞ্জু মঞ্জু মঞ্জীরে, রিনিঝিনি ঝিন্নিরে!" এ গানটা যে কতবার আমাকে দিয়ে গাইয়েছেন ঠিক নেই। আমার সঙ্গে তাঁদের খুব মনের মিল হয়ে গেল। নন্দীবাঈ শুধু গান না, গান রচনাও করেন। আমার প্রেমিক হয়ে পড়লেন তিনি, আমার উপর একটা গানই বেঁধে ফেল্লেন। এই পরিবারের সঙ্গে ভাব আমার আজ পর্যন্ত অটুট আছে। অনেকেরই অবস্থান্তর ঘটেছে—ক্রোরপতি থেকে প্রায় কপর্দকহীন হয়েছেন, অনেকেই ইহলোক থেকে চলে গেছেন। কিন্তু যাঁরা বাকী আছেন, অর্থবান হোন নিঃস্ব হোন—আজও বম্বে গেলে আমি তাঁদের খুঁজে পেতে বের করে দেখা করি।

পুণায় যেবার কংগ্রেস হয়, বাবা-মহাশয়ের সঙ্গে মেজমামা-প্রমুখ আমাদের যেসব আত্মীয়রা দর্শক হয়ে যান, নারাণজী তাঁদের সকলকে নিজের অতিথি করে রাজার হালে রাখেন। আমি সেবার সদ্য মহীশূরে গেছি, তাই পুণায় আসতে পারিনি। কিন্তু শুনলুম তাঁদের অতিথি-সৎকার যে মাত্রায় হয়েছিল তা বর্ণনীয় নয়।

বম্বের আর এক পরিবারে আমার গান জমেছিল খুব। সে সম্পূর্ণ বিপরীত circle-এ—মুসলমান মণ্ডলে। জস্টিস বদ্রুদ্দিন তায়েবজীর ভাইঝি-জামাই মিস্টার আকবর হায়দরী কলিকাতায় Accounts Department-এর বড় অফিসার হয়ে আসেন। ইনিই পরে হায়দ্রাবাদের প্রধান মন্ত্রী হন। তাঁর পত্নী আমিনাও স্বামীর সঙ্গে কলকাতায় আসেন। আমার এক পার্শী পরম বন্ধু ছিলেন বরজোরজি পাদশা, বৃদ্ধ জমসেটজি টাটার দক্ষিণ হস্ত। ইনি হায়দরীদেরও বন্ধু। তাঁর কাছ থেকে পরিচয়পত্র নিয়ে হায়দরীরা আমার উপর call করে আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। অতি সরল সহজ বন্ধুত্ব হয়ে গেল ওঁদের সঙ্গে আমার—এমন কি তাঁদের ছেলেমেয়ের জন্যে যে মৌলবী সঙ্গে এসেছিল, সেই 'ওস্তাদজি'র কাছে হপ্তায় ২।৩ দিন মূল ফার্সিতে ওমর খৈয়ম পড়ার বন্দোবস্ত করে দিলেন আমার। আমার ফার্সি পড়ার সখ অনেক দিন থেকে। একবার মেজমামার সঙ্গে বম্বের Watson Hotelএ গিয়ে যখন হপ্তাখানেক থাকি, তার স্বত্বাধিকারী মেজমামার একজন মুসলমান বন্ধু হোটেলে প্রায়ই একবার করে আসতেন আমাদের তদারক করতে। তিনি একদিন একটা কার্ডে চার লাইন উর্দু কবিতা লিখে আমায় উপহার দিলেন। উর্দু পড়তে পারিনে, তিনিই পড়ে শোনালেন ও উর্দু কবিতার রসমাধুর্য বুঝিয়ে দিলেন। উর্দু লেখাটি যেন ছবির টানের মত সুন্দর, কিন্তু

আমার অপাঠ্য। সেই পর্যন্ত আমার সখ গেল উর্দু পড়তে ও লিখতে শিখতে। বাড়ি ফিরে এসে কাশিয়াবাগানে উর্দু ওস্তাদ কোথা পাই? একজন মুসলমান ডাকপিয়নকে ধরে, তাকে মাসে দুটাকা বক্সিস দেওয়ার প্রলোভন দিয়ে তার কাছে উর্দু অক্ষর পরিচয় আরম্ভ করলুম। উর্দু প্রথম ভাগ সেই-ই শেষ করালে। উর্দু শিশুপাঠ্য পুস্তক দেখলুম বাঙলার মত নীরস নয়, হাস্যরসে রসাল। সে বইগুলির যদি এখনও চল থাকে, কেউ আনিয়ে দেখতে পারেন। একটা পাঠের মর্ম আমার মনে পড়ে—একজন রুগী হাকিমের কাছে গিয়ে জিজ্ঞস করলে, "হাকিম সাহেব! খাওয়ার প্রশস্ত সময়টা কি বাৎলে দিন।"

হাকিম বললেন—"গরীবের যে সময় খাওয়া জুটবে, আর ধনীর যে সময় ক্ষিদে লাগবে।"

আর একটি—একজন কৃপণ রাধাবাঈয়ের নাচ দেবে ভেবেছে। তাতে কি কি আয়োজন করতে হবে খোঁজ করে শুনলে—তিন মণ তেলের যোগাড় সব প্রথমে দরকার। সারারাত ধরে নাচ চলবে, তাতে আলো জ্বালিয়ে রাখতে হলে তিন মণ তেলের কম হবে না। শুনেই সে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে বললে—"তিন মণ তেলও পুড়বে না, রাধাও নাচবে না।" এইসব পাঠগুলি আমার ডাকপেয়াদা ওস্তাদটির সামনে পড়তে বাধ বাধ ঠেকত। চাকর শ্রেণীয়র কাছে ত হেসে গড়াগড়ি যেতে পারিনে, তার সামনে গুরুগম্ভীর হয়ে বানান করে করে পড়ে সে চলে গেলে হেসে বাঁচতুম।

দাদামশায় সেকালের শিক্ষাবিধি অনুসারে ফার্সিতে অধীত-বিদ্য ছিলেন। সব কবিদের মধ্যে হাফেজ তাঁর প্রিয়তম ছিলেন। হাফেজের একখানি কাব্য-সংগ্রহ সর্বদা তাঁর হাতের কাছেই থাকত। তার থেকে আবৃত্তি করে করে নিজের এক একটা psychological phase ব্যক্ত করতেন।

যেবার আমি ভারতীতে 'আহিতাগ্নিকা' কবিতা ও ঋগ্বেদের মন্ত্র অবলম্বনে 'শুনঃশেফের বিলাপ' লিখি দাদামশায়কে ওদুটি পড়ে শোনান হয়। তিনি শুনে খুব প্রীত হন এবং আমায় বলেন—"আমি তোমায় হাফেজের এই কটি লাইন দিচ্ছি, এতে সুর বসিয়ে আমায় গেয়ে শোনাতে পারবে?" আমি বিনম্রভাবে স্বীকৃত হলুম। এক সপ্তাহ পরে তাঁর কাছে খবর গেল—"সুর দেওয়া হয়েছে, যেদিন বলবেন শোনাতে যাব!"

দ্বিপুদাদার উপর হুকুম জারী হল আয়োজন করতে। বড়মাসিমা প্রভৃতি বাড়ির বড়রা এসে বসলেন ঈজিচেয়ারে ঠেসা দেওয়া অর্ধশায়িত দাদামশায়ের দুপাশে। তাঁর কানে ear trumpet লাগান হল। আমি বেহালা বাজিয়ে হাফেজ গাইলাম আমার দেওয়া সুরে। দাদামশায় মজে মজে শুনতে লাগলেন। তার কিছুদিন পরে দ্বিপুদাদা এলেন আমাদের বাড়িতে কাশিয়াবাগানে। এসে বললেন—"চল আমার সঙ্গে হ্যামিল্টনের দোকানে। কর্তা হুকুম করেছেন তোর জন্যে হাজার টাকার মধ্যে একটা গয়না কিনে দিতে। তোকে এখন জানান বারণ ছিল—যেদিন দেবেন একেবারে হঠাৎ সেদিন জানবি—এই তাঁর ইচ্ছে। কিন্তু আমি ভেবে দেখলুম কি কিনতে কি কিনব শেষকালে তোর যদি না পছন্দ হয়, সুতরাং তোকে বলে দেখিয়ে তোর পছন্দ মত কেনাই ভাল। আর কাউকে বলিসনে এখন—আয়।" হাজার টাকার মধ্যে আমার পছন্দসই জিনিস হ্যামিল্টনে নেই, তাই পাশের দোকানে নিয়ে গেলেন দ্বিপুদাদা। সেখানে একটা হীরে ও চুনির সেট, নেকলেস ও এক জোড়া ব্রেসলেট আমার পছন্দ মত কিনলেন। তারপর প্রকাশ্যভাবে আমার একদিন ডাক পড়ল। বাড়ির লোকের সভা লাগল। দাদামশায় নেকলেসটি বের করে আমার হাতে দিয়ে বললেন—"তুমি সরস্বতী। তোমার উপযুক্ত না হলেও এই সামান্য ভূষণটি এনেছি তোমার জন্যে।" আমি তাঁর স্বভাবসুলভ সৌজন্যপূর্ণ কথা কয়টিতে অভিভূত হয়ে তাঁর স্নেহের দান অবনতমস্তকে গ্রহণ করলুম। হাফেজের সেই গানটির স্বরলিপি শত গানে আছে। কথাগুলি নিম্নে দিচ্ছিঃ—

দেশাবে চেহেরয়ে জাঁ মেশবদ্ গোবারেতনম্
খোশাদমেকে জাঁ চেহ্রা পরদা বরফগনম্ ॥
চ'ণী কফস ন সজায়ে চুমনে খোসেল হানেস্তে
রবম্ বগোলসনে রেজোঁয়া কে মুরগে চমনম্ ॥

ইহার সংক্ষেপার্থ এই যে, আমার মত এমন সুকণ্ঠ পাখীর উপযুক্ত এই মর্তলোক নয়, আমি সেই যুগের কাননে যাব, যেখানকার আমি। এই গান তার পরের বছর কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট মিস্টার সিওয়ানি সাহেব যেদিন আমাদের বাড়ি চা খেতে আসেন তাঁকে শোনান হয়েছিল। হিন্দু বাঙালী মেয়ের মুখে বিশুদ্ধ উচ্চারণে (দাদামশায়ের কাছে শেখা) ফার্সি গান শুনে তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন। এই গান বম্বের মুসলমান পরিবারে আনন্দের তরঙ্গ তুলেছিল, আমাকে তাঁদের আরো নিকটতর

করেছিল। কিন্তু এ গান তাঁদের মজলিসে গাওয়া অন্যতম একটি গান মাত্র। আমাদের যেমন সংস্কৃত গান শুনতে ভাল লাগে, কিন্তু তাতে পেট ভরে না—তাঁদেরও তেমনি। অন্যান্য বহু গান হিন্দী ও বাঙলা দুইই—তাঁদের ফরমাসে গেয়ে গেয়ে শেষ হত না। তাঁদের একটি প্রিয় গান ছিল যা প্রতিদিনই একবার করে গাওয়াতেন—সেটি আমার "নমো হিন্দুস্থান"। তার কোরাসে সবাই মিলে যোগও দিতেন।

বদ্রুদ্দিন তায়েবজীর ছয় ভাই ও তিন-চার বোন, তাঁদের পুত্রকন্যা ও তাঁর নিজেরই দশবারটি সন্তান নিয়ে শাখাপ্রশাখায় বিস্তৃত বৃহৎ পরিবার তাঁদের। হপ্তায় একদিন করে এর বাড়ি ওর বাড়ি বড়দের একত্র ভোজনের একটি নিয়ম বেঁধেছিলেন তাঁরা যাতে পারিবারিক সংহতিটা ঠিক থাকে। তাই পালা পালা করে এ-বাড়ি ও-বাড়িতে আমারও নিমন্ত্রণ থাকত। আমি আসলে অতিথি ছিলুম হায়দরীদের, কিন্তু 'rage' বা আগ্রহের বস্তু হলুম সকলের—আমায় নিয়ে কাড়াকাড়ি করা ফ্যাশন হয়ে পড়ল। মিসেস হায়দরীর পিসতুত বোন জঞ্জিরা দ্বীপের নবাবের বেগম হয়েছিলেন। তাঁর নাম নাজ্‌লি বেগম ও তাঁর ছোট বোন আতিয়া বিবি। নাজ্‌লি বেগমের অনুরোধ আমিনা এড়াতে পারলেন না। কিছুদিনের জন্যে আমায় জঞ্জিরায় নিয়ে যেতে দিলেন। আমার সঙ্গে পরিচয়ের পর তায়েবজী পরিবারে সঙ্গীতচর্চা ভালরকম করে আরম্ভ হল। আতিয়া ওস্তাদ রেখে গান শিখতে লাগলেন ও ভারতের ক্লাসিকাল সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষকতার সূচনা করলেন। কংগ্রেস-বিখ্যাত আব্বাস তায়েবজী বদ্রুদ্দিন তায়েবজীর ভ্রাতুষ্পুত্রও বটে, জামাতাও বটে। তাঁর একটি কন্যার গান কংগ্রেসের অনেকেই শুনেছেন—অতি মৃদু মধুর কণ্ঠ তার। তার মুখে মীরাবাঈয়ের গান শুনে সকলে মুগ্ধ হন।

পঞ্জাবেও আমি যাবার পর থেকে মেয়েদের সঙ্গীতচর্চা ভাল রকম করে হতে থাকল। মাদ্রাজ, মহীশূর ভিন্ন ভারতের আর কোন অংশে মেয়েদের সঙ্গীতজীবন একেবারে বিকশিত দেখিনি—সে সঙ্গীতের তুলনা উত্তর ভারতে নেই। "বন্দে মাতরম্"ও আমার গাবার পর থেকে ক্রমে ক্রমে ভারতে সর্বত্র মেয়েদের কণ্ঠে ধ্বনিত হতে লাগল। "বন্দে মাতরম্"-এর কথায় মনে পড়ে দিল্লী থেকে একজন বৃদ্ধ বড় ইংরেজ ব্যারিস্টার একবার লাহোরে একটা মকদ্দমায় এসেছিলেন। আমাদের বাড়ি চা-য়ে এসে সেই সময় বাঙলার অফিসারদের দ্বারা স্থানে স্থানে নিষিদ্ধ গানটি শুনতে কৌতূহল প্রকাশ করেন। আমি গাইলুম—পিয়ানো সহযোগে।

তিনি শুনে বললেন—By Jove! কথা বুঝি না বুঝি তোমার গাওয়া শুনে বুঝছি কি তুমুল আলোড়ন আনতে পারে মনে। আমার স্বামীর দিকে ফিরে বললেন—"আমি যদি Bengal Government হতুম তোমার স্ত্রীর বিরুদ্ধে externment order জারী করতুম, যাতে আর কখনো বাঙলায় গিয়ে বাঙালীদের মাতিয়ে তুলতে না পারে।"

আমি ছাড়াও মাতাবার আরো অনেক লোকের জন্ম হল। বাঙলায় গায়িকার বন্যা এল। আলমোড়া পাহাড়ের উপর বিবেকানন্দ আশ্রমের অধিনেত্রী মিসেস সেভিয়র একবার বলেছিলেন—আর কিছু না, শুধু যদি জাতীয় গান গেয়ে গেয়ে ফেরো তুমি ভারতের নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে সমগ্র দেশকে মাতাতে পার। সে কথাটা আমার মনে লেগেছিল। অনেক সময় ভেবেছিলুম, একটি চারণ-দল গড়ে ঘুরে ঘুরে গেয়ে গেয়ে দেশকে জাগ্রত করব। কিন্তু তার জন্যেও আমার অপেক্ষায় দেশ বসে থাকেনি। সে কাজ আপনা-আপনি হয়ে উঠেছে।

সঙ্গীত-ক্ষেত্রে উপস্থিত হওয়ার সাময়িক প্রাথমিকতায় আমার গান ঘরে ঘরে লোকের মনে আসন পেয়েছে, তাদের আনন্দ দিয়েছে। কণ্ঠগুণের প্রাথমিকতায় নয়। আজ যদি এ কালের মেয়েদের সঙ্গে পরীক্ষায় নামতে হত কলকে পেতুম না। আমার দ্বারা যা কাজ নেবার তা দেশের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা নিয়ে নিয়েছেন। এখন পালা এসেছে আধুনিক মেয়েদের।

॥ বার ॥

স্থলে জলে

স্কুলের বন্ধু মেয়েদের মধ্যে দুচারজনের আমাদের বাড়িতে এসে মধ্যে মধ্যে থাকার কথা বলেছি। আমরা কিন্তু কোথাও গিয়ে থাকবার অনুমতি পেতুম না—একটি বাড়িতে ছাড়া—সে খুসীর পিতৃগৃহ দুর্গামোহন দাসের বাড়ি। তখন তাঁরা সাহেবীপাড়ায় রডন স্ট্রীটে একটা প্রকাণ্ড তিনতলা বাড়ির উপরতলায় থাকতেন। স্বামী ও কন্যাগণসহ খুসীর বড়দিদি সরলা রায়—ডাক্তার পি কে রায়ের পত্নী—ঐ বাড়ির মাঝতলায় থাকেন। খুসীর মেজদিদি অবলা দাসের জগদীশ বসুর সঙ্গে বিয়ে হয়ে

গেছে। তিনি নিজের বাড়িতে থাকেন। খুসীদের মায়ের মৃত্যু অনেকদিন আগে হয়েছে। তখন খুসীর দুই কনিষ্ঠ ভাই সতীশ ও জ্যোতিষ—পরে এস আর দাস ও জে আর দাস বলে সুবিদিত,—খুব ছোট ছোট ছিলেন। শুনতে পেতুম তাদের পিতা দুর্গামোহন দাস মাতৃহীন বালকদের এত সযত্নে ও সস্নেহে পালন করতেন, অনেক সময় মা বেঁচে থাকলেও শিশুরা অত আদরযত্ন পায় না। একবার জ্যোতিষের অসুখের সময় ডাক্তাররা মাসাবধি তার সন্দেশ রসগোল্লা খাওয়া নিষেধ করে দেন। সেই সময় দুর্গামোহনবাবু নিজেও তা খাওয়া বন্ধ করলেন—পাছে তাঁকে খেতে দেখলে ছেলের লোভ হয়। প্রতি পদে পদে সন্তানদের সঙ্গে তাঁর সহানুভূতির যোগ। তাই জন্যে সন্তানদের পিতৃভক্তিও তাঁর স্মৃতিতর্পণে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। এমন কি বৃদ্ধ পিতার সঙ্গিহীন দোসরহীন জীবনের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা তাঁর সেবা, শুশ্রূষা ও একটি জীবনসঙ্গিনী লাভের প্রতি দৃষ্টি রেখে অতুলপ্রসাদ সেনের বিধবা মাতার সঙ্গে তাঁর বিবাহ সংঘটন করেন। অতুলপ্রসাদ ও তাঁর তিনটি বোনের পালনপোষণের ভার তিনিই গ্রহণ করলেন, ঠিক যেন নিজের ছেলে ও মেয়েদের মতই তারাও হল।

আমাকে খুসী যখন তাদের বাড়িতে নিয়ে যেতে লাগল, দেখলুম এদের বাড়ির চালচলনে অনেকটা সাহেবিয়ানা ঢুকেছে—বিশেষতঃ মিসেস পি কে রায়ের। তাঁর তিনটি মেয়ে লরেটো কন্‌ভেণ্টে পড়তে যায়। আমাদের বাড়ির থেকেও প্রতিভাদিদি, তাঁর দুই-একটি বোন ও বিবি—এঁরা লরেটোতে পড়তেন। কিন্তু বাড়ির হাওয়ায় ইংরেজীয়ানা মাথা তুলতে পারত না। এখানে বাঙালী মেয়েদের বাড়িতেও পরস্পরের সঙ্গে সদাসর্বদা ইংরেজীতে কথোপকথন সর্বপ্রথম শুনতে পেলুম। তার বেশ একটা চটক ছিল, বাঙালী ছোট মেয়েগুলির মুখে ফুট ফুট করে ইংরেজী ভাষণ বেশ মিষ্টি লাগত। কিন্তু সে মিষ্টতা আপাতমধুর—দেশপ্রিয়তার উজানে টেনে নিয়ে যাওয়া মিষ্টতা। বড় হয়ে যখন কালের হাওয়ার ধাক্কা খেয়ে আবার দেশের দিকেই চলতে ইচ্ছা হবে, তখন অনেক খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে অগ্রসর হতে হবে। ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের যে সব মেয়েরা শুধু ইংরেজীতেই শিক্ষা পেয়েছেন—গোড়ার দিকে বাংলা লেখাপড়া মোটেই শেখেন নি—পরজীবনে আহরিত বাঙলার উচ্চারণে তাঁদের একটা আড় থেকে যায়—না সেটা মেমেদের স্পষ্ট বিকৃত উচ্চারণ—না বাঙালীর স্বাভাবিক বাঙলা উচ্চারণ।

খুসী ও অবলাদিদি—লেডি বোস—বাঙালী মেয়েদের সঙ্গে বাঙলা স্কুলে মানুষ। অবলাদিদি উত্তরজীবনে তাঁর কার্যে-কলাপে আচারে-অনুষ্ঠানে প্রতি পদে পদে স্বদেশ ও স্বদেশী-প্রেমের পরিচয় দিয়েছেন। আর সরলাদিদির সম্বন্ধে জনশ্রুতি এই যে, বেঙ্গল পার্টিশন আন্দোলনের সময় একদিন তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের সামনে দিয়ে গাড়ি করে যাচ্ছিলেন। তাঁর গাড়িতে হোয়াইটওয়ে লেডলর দোকান থেকে নেওয়া বিদেশী সওদা বোঝাই করা ছিল। স্বদেশীমত্ত একদল ছেলে তাঁর গাড়ি রুখে গাড়ির সামনে রাস্তায় শুয়ে পড়ে তাঁকে অনুরোধ করলে—"মা বিদেশী জিনিসগুলো ফেলে দিন, নয়ত আমাদের বুকের উপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যান।" সেদিন ফলে কি হল ইতিহাসে তা লেখে না। কিন্তু সরলাদিদির বিদেশী ব্যবহার কোনদিন কম হতে দেখি নি! 'গোখলে মেমোরিয়াল স্কুল'—তাঁর কীর্তি, যেমন 'ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়' বলতে গেলে—অবলাদিদিরই কীর্তি। এই দুই স্কুলের পরিচালনার বিভিন্ন আদর্শেই দুই বোনের মনস্তত্ত্বের ভিন্নতা সুপরিস্ফুট।

খুসীর ভিতর কর্মবেগ ছিল না, কিন্তু আমাদের বাড়ির সংসর্গে ভাবেতে ও রুচিতে স্বদেশী হয়ে উঠেছিল। কর্মের দিক থেকেও একটি কর্মে সে আমার মায়ের সহায়কতা করেছিল। পূর্বে বলেছি বৃত্তি দিয়ে শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করে অন্তঃপুরে পাঠানর লক্ষ্য সখিসমিতির ছিল। সে লক্ষ্য সিদ্ধ হওয়া সময়-সাপেক্ষ; কারণ যে সব মেয়েদের বৃত্তি দেওয়া হতে লাগল, তারা নিজেদের পড়াশুনা সাঙ্গ করে উপযুক্ত হলে তবে ত বাড়ি বাড়ি গিয়ে পড়াবে। ইতিমধ্যে কিন্তু দুই এক বাড়ি থেকে আবেদন আসল শিক্ষয়িত্রীর জন্যে। খুসীর তখন বিয়ে হয়েছে—বিডন স্ট্রীটে বাঙালী পাড়াতে থাকে। তখনও তার সন্তানসন্ততি হয় নি। সে মাকে বললে—"আমার হাতে অনেক সময় রয়েছে, আমি যাব পড়াতে। ছাত্রীরা যে মাইনে দেবে সেটা সখিসমিতির ফণ্ডে জমা হোক।" খুসী যতদিন যেতে পারলে ততদিনই কিন্তু সখিসমিতির এই কাজটি চলল। কারণ বৃত্তিধারিণী মেয়েরা কেউ কার্যক্ষেত্রে নামেন নি। বৃত্তিবলে শিক্ষাপ্রাপ্তা মেয়েদের ভাগ্যে বর জোটার ছোঁয়াচ লাগল। বৃত্তি গ্রহণের সময় একটা সর্তে তাদের বা তাদের অভিভাবকদের স্বাক্ষর দিতে হয়েছিল। তার মর্ম ছিল যে—এত বছর ধরে লেখাপড়া শিখে উপযুক্ত হবার পর এত বছর সখিসমিতির কাজ করতে হবে, না করলে তার জন্য সখিসমিতি যত টাকা খরচ করেছে ততটা টাকা সখিসমিতিকে ফিরিয়ে দিতে হবে।

কিন্তু সর্তটা শুধু কাগজে লেখাই রয়ে গেল। না কেউ কাজ করলে, না কারো পূর্ব অভিভাবক বা স্বামী তার হয়ে টাকাটা সখিসমিতিকে ফিরিয়ে দিলে—একজন মাত্র কিয়দংশ ছাড়া। সখিসমিতির পক্ষ থেকে তাদের বিরুদ্ধে মকদ্দমা আনা যেতে পারত—কিন্তু সখিসমিতি তার থেকে বিরত রইল। যারা চুক্তি ভঙ্গ করলে, তাদের পাপ তাদের শিরে বোঝাই করে রাখলে, এবং অন্তঃপুরে শিক্ষয়িত্রী পাঠানর কল্পনাটি সখিসমিতির প্রোগ্রাম থেকে একেবারে মুছে ফেলা হল। একাজ বহু বৎসর পরে হাতে নিলুম আমি—'ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল' খুলে।

সাহেব পাড়ায় একটি বাঙালী পরিবারের মেয়েদের সঙ্গে খুসীর বিশেষ বন্ধুতা ছিল—তাঁরা জস্টিস চন্দ্রমাধব ঘোষের পত্নী, মেয়ে ও বৌ। তাঁর ছোট মেয়ে জগদীশ রায়ের স্ত্রী নলিনীর সঙ্গে খুসীর 'জ্যোৎস্না' পাতান ছিল। একবার খুসীদের বাড়ি যখন গেছি সে আমাকে তাদের বাড়ি নিয়ে যেতে চাইলে। এ বিষয়ে মায়ের অনুমতি নেওয়া হয় নি, তাঁকে না জানিয়ে কারো বাড়ি বেড়াতে যেতে খুব দ্বিধা আসতে লাগল মনে। খুসী বললে—"তোমার ভয় নেই, আমি গিয়ে তোমার মাকে বলব, কিছু বলবেন না তিনি।"

গেলুম সেখানে। গিয়ে যে অপূর্ব আনন্দ পেলুম তা আর বলবার নয়। চন্দ্রমাধব ঘোষের বড় মেয়ে—'দিদিমণি' সকলেরই দিদিমণি, তিনি টাকীর জমিদারনী, অল্প বয়সে বিধবা, নিঃসন্তান। বৈধব্যের পর পিতৃগৃহে মেম গবর্নেসের কাছে ইংরেজীতে সুশিক্ষিতা, বাঙলা ত ভালরকম জানেনই। আমাদের বাড়ির ধরনধারণ, শিক্ষাদীক্ষা, সাহিত্য ও সঙ্গীত—সব কিছুর প্রতি তাঁদের বিপুল শ্রদ্ধা। সেই বাড়ির একজন মেয়েকে—স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যাকে—নিয়ে আসাতে খুসীর প্রতি ভারি কৃতজ্ঞ হলেন, যেন আকাশের চাঁদ হাতে এনে দিয়েছে। আমার সঙ্গে তাঁদের স্নেহবন্ধন এত সুদৃঢ় হল—আমাকে এত চাইতে লাগলেন—খুসী যেন পিছনে পড়ে গেল। সত্যি তা নয়। তাঁদের হৃদয়ে খুসীর আসন তেমনি অটল রইল, শুধু আর একজনের জন্যে আরো একখানা আসন পাতা হল।

তারপরে আমার গান গাওয়ার পালা আরম্ভ হল—সেই যেমন অন্যান্য বাড়িতে হত; গায়িকার পক্ষে একটা তফাৎ এই যে, অন্যান্য বাড়িতে পুরুষ শ্রোতা ও সমজদার—এ বাড়িতে রসগ্রাহিণী মেয়েরা শুধু—যাঁদের সঙ্গে আমার রুচিতে রুচিতে হৃদয়ে হৃদয়ে মিল হয়ে গেল। নলিনীর

ছেলেমেয়েরা দিদিমণিরই ছেলেমেয়ে যেন। তার দুটি ছেলে রবি, ছবি ও দুটি মেয়ে বীণা, বিভা। ছবির ভাল নাম অশোক—যিনি এখন স্যার এ কে রয়। তাকে দিদিমণি পোষ্য নিয়েছেন, লোকে দিদিমণিকেই তাঁর মা বলে জানে—বাড়িসুদ্ধ ছোটদের সবারই তিনি 'মামণি'।

বীণা স্কুলে যাবার যোগ্য হলে তাকে লরেটোতে পাঠান হল। সুন্দর মেয়েটির সুন্দর ঢলঢলে হাবভাব—সেজন্যে প্রাপ্য প্রশংসা প্রকৃতিদেবীর —আর সুন্দর তার পরিচ্ছদ—সেজন্যে প্রাপ্য প্রশংসা দিদিমণিদের সুরুচির। ছেলেবেলা থেকে লরেটোতে গিয়েও, ফিরিঙ্গি মেয়েদের সঙ্গে মেশামিশি করেও, বাড়িতেও ফিরিঙ্গি গবর্নেসদের দ্বারা পরিবৃত হলেও বীণার ভিতর এতটুকু ফিরিঙ্গিয়ানা প্রবেশ করতে পারলে না, দিদিমণিদের সুচারু অভিভাবকতায়।

রসায়নশাস্ত্রে বলে এমন এক একটা ধাতু আছে যা সবেতে dissolve হয়ে যায়—মিশ খায়। আমার ভিতর বোধহয় সেই রকম কোন একটা পদার্থ ছিল যাতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির লোকের সঙ্গেও মিশ খেয়ে যেতুম। খুসীর বড়দিদি মিসেস পি কে রায় আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়—আর আমার জাতীয় আদর্শ ও তাঁর আদর্শে মিল ছিল না—তবু তিনি আমাকে টানতে লাগলেন। তাঁর কতকগুলি গুণে আমি মোহিত হলুম। খুব আমুদে মজলিসী, হাসিখুশিতে ভরা, লোককে যত্ন করতে আপনার করে নিতে অদ্বিতীয়। তাঁর অন্তরে একটা seriousness—একটা গভীরতা ছিল, যা সচরাচর দেখা যায় না। বড় রকম কিছু-না-কিছু একটা করবার ইচ্ছা ভিতরে ভিতরে তাঁকে সর্বদা অনুপ্রেরিত করত। যদিও বাঙলা বেশী পড়েন নি—কিন্তু ইংরেজী ভারি সাহিত্যে Emerson প্রভৃতির রচনায় বিশেষ অনুরক্ত। তাঁদের লেখা নিয়ে আমার সঙ্গে মাঝে মাঝে আলোচনা করতে বসে যেতেন। সবচেয়ে ভাল লাগত আমার তাঁর একাধারে ইংরেজীয়ানা ও দিশীয়ানা। যখন বালিগঞ্জে ছিলেন, তখন রবিবার দুপুরে মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্যে তাঁর বাড়িতে প্রায়ই লোকসমাগম হত ও বিকেলে টেনিস খেলা হত, অনেক বাইরের লোক আসতেন। রাঁধুনে নেই হয়ত, অসুখ করেছে। ঘর্মাক্তদেহে সারাদিন নিজে রেঁধেবেড়ে—বাঙাল দেশের নানা সুস্বাদু ব্যঞ্জন ও বিকেলে চায়ের জন্য নানারকম খাবার—গা হাত ধুয়ে কাপড় ছেড়ে ফিটফাট হয়ে টেনিস কোর্টে যথা-সময়ে উপস্থিত হয়ে দুচার হাত টেনিস খেলতেন, অতিথিদের আপ্যায়িত করতেন, পীড়াপীড়ি করে এটা ওটা সেটা খাওয়াতেন। রোগীর সেবায়ও

একান্ত তৎপর দেখেছি তাঁকে। বিদেশীরা তাঁর গৃহে স্বগৃহের মত আরাম ও যত্ন পেত। একজন নরউইজিয়ান খৃস্ট অর্থাৎ ব্রাহ্ম একবার কলকাতায় আসেন। গরীব, অর্থসম্বল বিশেষ নেই। আমাকে বলে তাকে আমায় ফ্রেঞ্চ পড়াবার জন্যে রাখালেন। কিছুদিন পরে কঠিন কলেরা হল তার। সেই সময় সরলা রায় তাকে যেভাবে নার্স করলেন—না দেখলে অনুমান করা যায় না। বেচারাকে কিন্তু বাঁচাতে পারলেন না। মৈসোর থেকে রামস্বামী আয়েঙ্গার এসে তাঁরই বাড়িতে আশ্রয় পেয়েছিলেন। অতুলপ্রসাদ সেনের বোনের সঙ্গে তার বিবাহবন্ধন তিনিই বেঁধে দেন। গোখলে আর এক বিদেশী তাঁর আতিথ্য-নিগড়ে ধরা পড়লেন। শেষাশেষি কলকাতায় এলেই সরলা রায়ের গৃহই গোখলের আবাসস্থান হত। গোখলের সঙ্গে তাঁর সম্প্রীতির চরম নিদর্শন "গোখলে মেমোরিয়াল স্কুল"।

এ সব অনেক পরের ঘটনা। আমার পঠদ্দশাতেই খুসীর সঙ্গে তাদের বাড়ি আনাগোনায় তার বড় দিদির সঙ্গে আমার বেশ বন্ধুত্ব হল। দুর্গা-মোহন দাস ও চন্দ্রমাধব ঘোষ এই দুই পরিবারের সঙ্গে আমার সৌহার্দ্য বৃদ্ধিতে আমার মায়ের অনুমোদন ত রইলই, তিনি নিজেও সংযুক্ত হলেন। সরলাদিদি সখি-সমিতির একজন উৎসাহী মেম্বর হলেন। দিদিমণিরাও হলেন।

একবার পূজার ছুটিতে ডাক্তার পি কে রায় ও মিসেস রায় মাদ্রাজ হয়ে মহীশূরে যাত্রার সংকল্প করলেন—রামস্বামী আয়েঙ্গার এ বিষয়ে তাঁদের উৎসাহদাতা। সরলাদিদি আমায় বললেন—"যাবে সরলা আমাদের সঙ্গে? চল না।" আমি বললুম—"মা-রা কি যেতে দেবেন।" তিনি বললেন—"আমি বলে মত করিয়ে নেব।" সেকালে জলপথে ছাড়া মাদ্রাজ যাওয়া যেত না। আমি কখনো সমুদ্র দেখিনি, জলযাত্রাও করিনি। এ ভয়ানক সুযোগ—ওঁদের মত অভিভাবকের সঙ্গে যাওয়া। মা-বাবামহাশয় অনুমতি দিলেন। এই প্রথম বড় স্টীমারে চড়লুম আমি। এর আগে গঙ্গায় নতুনমামার 'সরোজিনী' বোটে মেজমামীদের সঙ্গে জলের উপর বাস কখনো কখনো করেছি। স্থির ধরণীর বক্ষে স্থল-বাস ছেড়ে, কূলে বাঁধা তরণীর বক্ষে জলবাসের স্বাদ পেয়েছি। নিঝুম রাত্রে কোন স্টীমার বা বড় নৌকার ধাক্কায় যখন আমাদের বোট হঠাৎ দোলায়িত হয়ে উঠে তখন ঘুম ভেঙে অন্যান্য নৌকা থেকে মাঝিরা নানা-রকম কলরব করে, তাদের কণ্ঠধ্বনি-মুখরিত আকাশের স্পর্শ পেয়ে

মনে আসে বাড়িতে শুয়ে নেই, এক অভিনব পারিপার্শ্বিকে রয়েছি। ভোর হলে কুয়াসায় ছাওয়া গঙ্গার স্বচ্ছতা নিরোধ হয়ে যায়, কুয়াসা সরে সূর্যোদয়ের অনেক পরে সূর্য দৃশ্যমান হলেও সে সূর্যের সঙ্গে বাড়ির চেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠতা বোধ হয়, আর বোটের জানলার ধারে বসে জলের তলায় চলায়মান জলজীবদের গতিবিধি দেখতে মজা লাগে—আমাদের নিত্যপরিচিত নিত্যঅভ্যস্ত স্থূলজগৎ নয়, আর এক সম্পূর্ণ বিভিন্ন জগতে যে এসেছি তা হৃদয়ঙ্গম হয়। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্টীম ন্যাভিগেশন কোম্পানির সমুদ্রগামী এক বৃহৎ জাহাজে মাদ্রাজ অভিমুখে যাত্রা করলুম। যেন হঠাৎ বিলেতের একখণ্ডে পদার্পণ করেছি। এখানে একেবারে ইংরেজী জীবনযাত্রা প্রণালী। ভোরের বেলায় ক্যাবিনের ভিতর স্টুয়ার্ডেস চা ও বিস্কুট দিয়ে যায়। তারপর উঠে স্টীমারের সরকারী স্নানাগারে লম্বা টবে স্নান করে সারাদিনের মত বেশভূষা করে নিয়ে ৯টার সময় ভোজনাগারে যাওয়া। সেখানে প্রত্যেকের আলাদা স্থান নির্দিষ্ট আছে। আমাদের তিনজনের একটা টেবিল। ইংরেজী রকম প্রাতরাশের পর ডেকের উপর গিয়ে স্ব স্ব আরামকেদারায় বসে বা অর্ধশয়ান হয়ে বই পড়া, দৃশ্য দেখা, মধ্যে মধ্যে উঠে ডেকে পায়চারি করা, সহযাত্রীদের কারো সঙ্গে আলাপ পরিচয় হলে তাদের সঙ্গে গল্প করা—এই কাজ। কলকাতার জানাশুনা ইংরেজ ও আর্মানী দুই একজন ব্যারিস্টারও এই জাহাজে মাদ্রাজ বেড়াতে যাচ্ছিলেন। এই করতে করতে ১টা হয়ে যায়—তখন মধ্যাহ্নভোজনের জন্যে ভোজনাগারে পুনঃপ্রবেশ। এটা একটা গুরুভোজ, প্রাতর্ভোজনের মত লঘু নয়। এর পর স্ব স্ব ক্যাবিনে গিয়ে বিশ্রাম এবং ঘণ্টা তিনচার পরে কেকাদি-সমন্বিত বৈকালিক চা-পান হয় ক্যাবিনেই বা স্টীমারের ড্রইংরুমে। তারপর ডেকের উপর গিয়ে পাদচারণ বা কোন ব্যায়াম কিংবা ক্রীড়ার দ্বারা সান্ধ্যভোজনের জন্যে ক্ষুধা সঞ্চার। ডিনার খেতে ভোজনাগারে আসার সময় ডিনার সাজ পরে আসা চাই—নয়ত অভদ্র দেখাবে। মেয়েরা সেই সময় নিশ্চয়ই রেশমের পোশাক পরবেন—সূতির নয়। এই হল কায়দা। সেই কায়দা অনুসরণ করে যে যত চলবে, সে তত সভ্য বলে গণ্য হবে—নয়ত অসভ্য আখ্যা পাবে। চতুর্থ দিনে মাদ্রাজ পেঁৗছন গেল। এর মধ্যে দেড় দিন মাত্র আমি খাড়া ছিলুম ও স্টীমারের জীবনপদ্ধতি অনুসরণ করেছিলুম। তারপরেই সমুদ্রব্যাধির কবলে পড়লুম। ক্যাবিনেই আমার দিনরাত্রি কাটতে লাগল —কোন কিছু খাওয়ার রুচি আর রইল না—খাদ্যবস্তু দেখলেই গা-বমি

করে উঠত। স্টুয়ার্ডেস অনেক ভুলিয়ে ভালিয়ে আমাকে একটু কিছু খাওয়াত। এই খাওয়ার প্রাচুর্যের জন্যেই অনেক সাহেব-মেম সমুদ্রযাত্রায় যেতে চায়। যাতায়াতের কয়লা খরচের চেয়ে খাবার যোগানতেই স্টীমার কোম্পানীর বেশি খরচ হয়। তাই খাবারের দামটা ভাড়ার অন্তর্গত। খাও আর না খাও—খাবারের দামটা ভাড়া থেকে কাটান যায় না।

চতুর্থ দিনে মাদ্রাজের উপকূল দেখা গেল। বন্দরের কাছাকাছি পৌঁছল জাহাজ। এবার জাহাজ থেকে তীরে পৌঁছতে 'কাটামারন' নামে এক জাতীয় দিশী নৌকার আশ্রয় নিতে হবে। জাহাজ থেকে কাছি ধরে খালাসিদের সাহায্যে কোনরকমে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাইতে বাহিত হয়ে তীরে উঠতে হবে। তাতে ঝাঁপান, ঝাঁপিয়ে পায়ের ব্যালান্স রেখে দাঁড়ান বা বসা—এসবই মারাত্মক ব্যাপার। এ 'কাটামারন' কিন্তু মারণ উচাটনের দ্বারা কোন যাত্রীর কোনদিন অপঘাত মৃত্যু ঘটায়নি। মাদ্রাজের বন্দরে আর কোন উপায়ে সেকালে যাওয়া অসম্ভব ছিল—উপকূলের সমীপস্থ জল ভীষণ দুরন্ত—তার বশীকরণ এই কাটামারনের দ্বারাই নির্বিঘ্নে হত। আমাদের অভ্যর্থনা করতে কূলে দাঁড়িয়েছিলেন বাঙালী বন্ধু—রজনী রায় মহাশয়—মাদ্রাজের তদানীন্তন একাউণ্টাণ্ট জেনারেল। তিনি দাস পরিবারের বিশেষ বন্ধু—তাঁর স্ত্রী বিধুমুখী দেবী সুশীলা-দিদির সম্পর্কে আমার সঙ্গে সম্পর্কিত। তাঁদের ওখানে আট-দশদিন কাটল আমাদের। রজনীবাবু তাঁর মাদ্রাজী বন্ধুদের পালা করে প্রতিদিন নিমন্ত্রণ করতে লাগলেন। আমাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার জন্যে। এঁরা কিন্তু সবাই প্রায় শিক্ষিত খ্রীস্টান বা ব্রাহ্মসমাজী। তাঁদের হিন্দু উচ্চশ্রেণীর কোন মাদ্রাজী বন্ধু দেখলুম না। মাদ্রাজের হিন্দুরা তখন অত্যন্ত গোঁড়া।

রজনীবাবুদের হাতায় একজন সাধারণ মাদ্রাজীর গান শুনতে পেয়েছিলুম একদিন। আমার আর কাজকর্ম নেই—তাকে বাড়ির বারান্দায় ডাকিয়ে তার দুই একটা গান শিখে নিলুম, একটা হচ্ছে—

"বারুং নালুঙ্গুড়া কৈধাঁন্নি লে
বাসুদেব কি বরপুত্র!
রত্নসিংহাসন তল রাজয়ি রূপরিম্না
রি—রি—রি—রি—রি!"

কথা আমাদের পক্ষে উৎকট—কিন্তু সুর চমৎকার। একদিন ডিনার পার্টিতে সমাগত মিস্টার রায়ের মাদ্রাজী অতিথিদের তাঁদের দেশের

গানই আমার মুখে শুনিয়ে দিলুম। তাঁরা অবাক হলেন, নিজেরা খ্রীস্টান, তাই ইংরেজী গান ছাড়া নিজের দেশের গান তাঁরা গান না। আমার 'রি—রি—রি—রি'র আবৃত্তিতে বিশেষ আমোদ পেলেন, বললেন মাদ্রাজী সঙ্গীতের চেহারাটি একেবারে ঠিকঠাক ধরে ফেলেছি। যেমন ইতিপূর্বে বাঙাল মাঝিদের গানে "মনমাঝি সামাল সামাল ডুবল তরী ভবনদীর তুফান ভারি—ই—ই মনমাঝি"তে 'ই'র টান ধরায় তাদের গানের চেহারা ফুটেছিল। এই আমার দাক্ষিণী গান সঞ্চয়ের সূত্রপাত। রজনীবাবুর কন্যারাও গান করতেন—বিশেষত বড়মেয়েটি—সুকুমারী সুগায়িকা, কিন্তু আমার মত বাতিকগ্রস্ত ত নয়। নাহলে কয়েক বৎসর মাদ্রাজে থাকতে কত মাদ্রাজী সুর পুঁজি করে বাঙলাদেশে আনতে পারতেন। তা করেননি তাঁরা—বাঙালীসুলভ অন্য জাতির প্রতি ঘৃণাবশত তাদের সঙ্গীতে কোন চমৎকারিতা পান না, যা পান শুধু একটা হাসিকৌতুকের অবসর।

মাদ্রাজ থেকে আমরা মহীশূরে গেলুম। সেখানে ডাক্তার রামস্বামী আয়েঙ্গারের মাতুল দরবার বক্সী। তিনিই আমাদের অভ্যর্থনার সব আয়োজন করেছেন। আমরা সেখানে রাজ-অতিথি। মহীশূরে পদার্পণ করে দেখলুম একেবারে সঙ্গীতের রাজ্যে প্রবেশ করেছি। সারাদিনরাত্রি বায়ুতরঙ্গে সঙ্গীত ভেসে আসছে। উত্তর ভারতের সঙ্গীতের মত নয়, দক্ষিণের একটি নিজস্ব অপূর্বতাসম্পন্ন। 'মহারাণী গার্লস স্কুল' দেখতে গেলুম। সেখানে দেওয়ানের পৌত্রীর তরঙ্গায়িত কণ্ঠে ত্যাগরাজ নামে প্রসিদ্ধ তেলেগু কবির রচিত অনেকগুলি ওদেশী ক্লাসিকাল গান শুনে মুগ্ধ হলুম এবং মেয়েটিকে বাড়িতে আনিয়ে তার কাছ থেকে সেগুলি আদায় করলুম। দেশে ফিরে রবিমামাকে উপঢৌকন দিলুম। তিনি তাদের ভেঙে ভেঙে ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করলেন—বাঙলার সুররাজ্য বিস্তৃত হল। ইতিপূর্বে গুজরাট থেকে তাঁদের নিজে সংগৃহীত গুজরাটি ভজনের কথা ও সুর এবং শিখগুরুদের পঞ্জাবী গীতের ভাব ভাষা ও সুর নিয়ে মাতুলেরা আগেই বাঙলা সঙ্গীতের ভাণ্ডারে প্রাচুর্য এনে-ছিলেন। নারীনাং মাতুলক্রমঃ। আমি তাঁদেরই গতানুগতিক হয়েছিলুম।

॥ তের ॥

(দ্বিতীয় পর্যায়)

শান্তিনিকেতন ও লেখকতার প্রারম্ভ

দিদি যখন কলকাতার বাইরে নিজের ঘর-সংসার করতে গেলেন আমি তখন মার কাছে একা রইলুম। তখন থেকে মার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হল। বিলেত যাওয়ার আগে পর্যন্ত দাদাও ছিলেন, কিন্তু দাদা ব্যাটাছেলে তাঁর বহির্মুখী জীবন। তাঁর সখ অনুসারে তাঁকে আরবী ঘোড়া কিনে দেওয়া হয়েছিল। ভোরে উঠে ঘোড়ায় চড়ে বেড়িয়ে আসা, বিকেলে হয় সুরেনদের বাড়ি যাওয়া নয় নিজেদের বাড়িতে তাকে ও অন্যদের এনে খেলাধুলা, সন্ধ্যায় মাঝে মাঝে বাগানের গর্ত থেকে বেরন শেয়াল শিকার করা—এই সব তাঁর মুখ্য কাজ ছিল। পড়াশুনাটা গৌণ। সেই সময় 'সখা' নামে বালকবালিকাদের জন্যে মাসিক পত্রিকায় একটা কবিতা প্রতি-যোগিতা ঘোষিত হল। মা উৎসাহ দেওয়ায় আমি সেই প্রতিযোগিতার জন্যে দাঁড়ালুম। নির্দিষ্ট বিষয়ে কবিতা রচনা করে সখা-অফিসে পাঠিয়ে দিলুম। ফার্স্ট আমিই হলুম, প্রাইজ পেলুম একখানা ইংরেজী 'ক্লাসিকাল ডিক্‌শনারী', যত প্রাচীন গ্রীক ও রোমান মাইথলজির গল্প। প্রকাশ্যে রচনায় এই আমার হাতে খড়ি। লিখতে আরম্ভ করেছিলুম কিন্তু কয়েক বছর আগেই। আমাদের শৈশবে সেই সময় একবার সপরিবারে বোলপুর যাওয়া হয়। সেকালের শান্তিনিকেতন সত্যই শান্তিনিকেতন ছিল, ছেলে-বুড়ো সকলেরই মনোমোহন। কর্মকোলাহল ও জনকোলাহলশূন্য, শুধু শান্ত মৌন প্রকৃতির অবাধ রাজত্বের বিস্তার।

শান্তিনিকেতন বাড়িটির গাড়িবারান্দার কার্নিসের উপর অনেকগুলি বড় বড় সমুদ্র-শামুক সাজান ছিল। এমন শামুক এর আগে আমরা কখনও দেখিনি, কি রহস্যময় মনে হত। তার ছিদ্রের ভিতর কান পাতলে এমন একটা শব্দ পাওয়া যেত ঠিক যেন সমুদ্র-কল্লোল। সমুদ্র নিজের তরঙ্গঘন চিত্ত যেন চিরদিনের মত তার ভিতর রুদ্ধ করে রেখেছে। 'সমুদ্র' নামটাই তখন আমাদের পক্ষে রহস্যময় ছিল। কর্তা দাদামশায়ের চীন ভ্রমণে যাত্রার বার্তার সঙ্গেই সে নামটি আমাদের পরিচিত হয়েছিল। হয়ত সেই সময়ই তাঁর সংগৃহীত এই শামুকগুলি। আর রহস্যময় ছিল বোলপুরের খোয়াই পাহাড় ও তাদের মধ্যে দিয়ে বালির ভিতর থেকে

ঝির ঝির করে বেরন জলের ছোট ছোট ধারাগুলি। ভূতত্ত্ব-বিজ্ঞানের প্রথম পাঠ আরম্ভ হল আমাদের এখানকার প্রকৃতির ক্রোড়ে। প্রত্যেক বিজ্ঞানশাস্ত্রই মানুষের চিন্তারাজ্য প্রসারিত করে দেয়, কিন্তু ভূতত্ত্ব আর গ্রহনক্ষত্রতত্ত্ব এই দুটির মত মনকে সুদূরগামী, বুদ্ধিকে প্রশস্ত করার সহায়ক বিজ্ঞান আর নেই। দেশের ও কালের গভীর থেকে গভীরতর স্তরে নিয়ে যাওয়ার জন্যে ভূতত্ত্ব, আর উচ্চ থেকে উচ্চস্তরে উঠানর জন্যে গ্রহনক্ষত্রতত্ত্ব। আকাশ আকাশ আকাশ! ফাঁক ফাঁক ফাঁক! কি অন্তহীন ফাঁকা! যেদিকে চাও সেই দিকেই ফাঁকা! কোথাও কিছুতে আটকান নয়। মনকে একেবারে অনন্তের ধারণায় পাকা করে দেয়। কিন্তু অনন্ত খালি শূন্যতায় ভরলে পর্যাপ্ত হয় না, তার ভিতর একটি পূর্ণতার ভাবও চাই। তাই ল্যান্ডস্কেপ পেণ্টররা বলেন সুবিস্তৃত ফাঁকার মধ্যে একটু জীবনের চিহ্ন থাকলেই তবে তার সৌন্দর্যের সম্পূর্ণতা হয়—সুদূরে একটি পাখী, একটি জানোয়ার বা একটি মানুষ। নয়ত অনন্ত একঘেয়ে ও শ্রান্তিকর হয়ে পড়ে। জীবশরীরবৎ শরীরে আবদ্ধ জীবনের ধারণা না হলেও চলে বোধ হয়। শুধু জীবন্ততার একটি ধারণা চাই। যে অনন্ত অসীম প্রাণ সান্ত সীমাবান সকল প্রাণীর প্রাণের উৎস সেই এক অদ্বিতীয় প্রাণময়কে যদি এই ফাঁকায় ধরতে পারি তবেই আমার অনন্ত শূন্যতা অনন্ত পূর্ণতায় ভরে থাকে। তাই হয়েছিল আমার যখন আমি একবার হিমালয়ে কুলু পাহাড়ে যাচ্ছিলুম আমার পাঁচ বছরের পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে। তখন সেই অবাধ ফাঁকে ছিলুম শুধু আমরা দুটি ও সারা আকাশব্যাপী জীবন্ত ভগবান। কেমন ভগবান আমার? সুপ্ত নয়, জাগ্রত। অপানিপাদ নয়, সর্বতো চক্ষু সর্বত্র শ্রুতিমান গতিবান ব্যাপ্তিবান অন্তর ও বাহিরের আকাশে। আমাদের একটা চোখের জ্যোতি নয়, এমন সহস্র চক্ষের জ্যোতি তাঁর চোখে, একটা কানের শ্রবণশক্তি নয়, এমন সহস্র কানের শক্তি। সেই চোখে আমাদের প্রতি নির্নিমেষে চেয়ে আছেন, সেই কানে প্রতি কথাটি শুনছেন। প্রাণময় প্রেমময় তিনি, মৃত নন, কালা কানা হাবা নন—মননময়, বিজ্ঞানজানাময়, জ্ঞানময়, সদা সচেতন, সদাজীবন্ততাময়। এই অনুভূতিটি আমি তখন আমার এক ইংরেজ বান্ধবীকে বর্ণনা করেছিলুম। তাঁর মনে ঐ বর্ণনাটি একটি গভীর রেখা কেটেছিল। বার বার সেটি ফিরে ফিরে আওড়াতেন।

আমাদের সঙ্গে বোলপুর যাত্রার পার্টিতে সেবার অনেক লোক ছিলেন। আমাদের প্রায় সমবয়সী, আমাদের চেয়ে অনেক বড়, সব রকমের।

নতুনমামী, সরোজা দিদি, মোহিনীবাবু, এটর্নি কবি অক্ষয় চৌধুরী ও তাঁর স্ত্রী—মায়ের সঙ্গে পাতান নাম যাঁর "বিহঙ্গিনী"—এঁদের মনে পড়ে। বোলপুরের ছোট ছোট স্রোতস্বতীর ধারে মাঝে মাঝে এক একটি সুন্দর নুড়ি পাওয়া যেত। আমাদের কে একজন বিজ্ঞ লোকে বলেছিলেন একদিন—"এই যে সব নুড়ি দেখছ, এরা এককালে কোন ফল-ফুল ছিল, এখন জলের তলায় পড়ে থেকে জমে জমে পাথর হয়ে গেছে। এদের বলে ফসিল।" তাই শুনে জায়গাটা চিহ্নিত করে আমরা এক একটা আমলকী পুঁতে পুঁতে রাখতে লাগলুম। একদিন অন্তর বালি খুঁড়ে খুঁড়ে দেখি সেটা কতদূর প্রস্তরায়িত হয়েছে। কে একজন বললেন—"আরে মূর্খরা অমন করে থেকে থেকে বালির থেকে বের করলে ও কি কখন পাথর হবে? চুপ করে পড়ে থাকতে দাও এখন। পঞ্চাশ বছর পরে এলে দেখবে আমলকী আর নেই, একটা নুড়ি পড়ে আছে ঐ জায়গাতে।" আমরা সেই পঞ্চাশ বছরের পরে ফিরে এসে নুড়ি দেখার আশায় আপাত চেষ্টা ছেড়ে দিলুম। পঞ্চাশ বছর যথাসময়েই অতিক্রান্ত হল, সে নুড়ির খোঁজে বেরুতে কিন্তু আর মনেও রইল না, বেরোইওনি কেউ। সে খোয়াইয়ের স্তূপ, সে বালির বাঁধ, সে জলের ধারা কোথা দিয়ে কোথায় সরে গেছে কেউ নির্ধারিত করেনি। সারা সকালটা বেড়িয়ে ঘুরে ফিরে খাবার ঘরে লম্বা টেবিলের ধারে বসে সকলে মিলে স্তূপীকৃত লুচি তরকারী ও বোলপুরের প্রসিদ্ধ পাতক্ষীরের প্রতি সদাচরণ করে খানিকক্ষণ ধরে বিশ্রাম করতুম সবাই।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ে—আমার পিতৃদেবের অশুচ জাতিদের বিনা আড়ম্বরে শুচি করে নেওয়া, তাদের হাতে খাওয়া-দাওয়া ও সর্ব রকম ভৃত্যাগিরিতে তাদের নিযুক্ত করা। প্রায় বিশ বছর পরে পঞ্জাবের আর্যসমাজের সংস্পর্শে এসে অছুত উদ্ধার মহাঘটার সঙ্গে সম্পন্ন হতে দেখেছি—কিন্তু বোলপুরে বাবামহাশয় বিনা বাক্যব্যয়ে ডোম বরকন্দাজ স্বরূপ সর্দারের পুত্রকে নিজের খানসামা নিযুক্ত করে, ট্রেনিং দিয়ে দিব্যি উপযুক্ত চাকর তৈরি করে নিলেন। সে-ই টেবিলে আমাদের সবাইকে খাওয়াত, দরকার হলে লুচি ভাজা, মাংস রোস্ট প্রভৃতিও সে-ই করত। এতে উপস্থিত দলের কারো কোন আপত্তি হল না।

শান্তিনিকেতনে এই সময় আমায় সব প্রথম লেখা পেয়ে বসল। 'সখা' আমাদের সত্যিকার সখা ছিল তখন। দুপুর বেলা ঘরের ভিতর বিশ্রাম করতে করতে তার সব রচনা পড়ে পড়ে আমায় রচনা চাপল। দুতিন

দিন ধরে অন্যদের লুকিয়ে দু-একটা ছোট গল্প লিখলুম। সরোজা দিদি একদিন ধরে ফেললেন। আমার খাতা কেড়ে নিয়ে সকলকে দেখিয়ে দেখিয়ে ঠাট্টা করে করে বলতে লাগলেন—"লেখিকা হবেন সরলা! গল্প লেখা হয়েছে! কাগজে বেরুবে নাকি?"

বড়দের ঠাট্টা-বিদ্রূপ ছোটদের মর্মবিদারক হয়, তাঁর ঠাট্টায় আমার লেখবার প্রবৃত্তি বন্ধ হয়ে গেল। তার অনেক পরে মায়ের উৎসাহে 'সখা'তে কবিতা প্রতিযোগিতায় কবিতা পাঠালুম। লেখার স্রোতটা কিন্তু ধারাবাহিকভাবে তখন থেকে চলল যে তা নয়। তখন আমি বেশী নিযুক্ত থাকতুম পড়তে। স্কুলের পড়া বলছিনে—বাঙলা সাহিত্য, বিশেষ করে পুরনো ভারতী। একেবারে মগ্ন হয়ে থাকতুম তার ভিতর। ঈলিয়াডের অনুকল্পে 'রামিয়াড' প্রভৃতি নতুন মামার কৌতুক রচনা হাসিগত উচ্চ সাহিত্য-রসে আমায় একেবারে ভরপুর রাখত। তখন ভারতীতে প্রতি মাসে হাস্যপ্রধান 'নক্সা' বেরত। আমি একবার বিনা নামে একটা নক্সা লিখলুম। মা ভারতীতে বের করলেন। চলে গেল বড়দেরই কারো লেখা বলে। সেই পর্যন্ত নিজের উপর একটা ভরসা এল—লিখতে পারি। বহু বর্ষ পরে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের হাসির গান যখন আমার কর্ণকুহরে এল—সেগুলো আর মজলিসী আমোদ-প্রমোদের কোটরে পড়ে থাকতে পেল না। মহীশূর প্রবাসের অব্যবহিত পূর্বে সেগুলি সংগ্রহ করে নিয়ে গিয়ে সেখান থেকে 'ভারতীতে' একটি প্রবন্ধ পাঠালুম—'বাঙলায় হাসির গান ও তার কবি'। সাহিত্যের সমুচ্চস্তরে তাদের আসন পাতা হয়ে গেল। দ্বিজু রায় শেষ পর্যন্ত আমার সে বন্ধুকৃত্যটি ভোলেন নি।

'সখা'য় কবিতার পর 'বালক'-এ আমার দু-একটা রচনা বেরয়। গিরীন্দ্রমোহিনীর সঙ্গে মার তখন ভাব হয়েছে ও 'মিলন' পাতান হয়েছে। তাঁর দেবর অক্রূর দত্ত পরিবারের গোবিন্দ দত্ত রবিমামার বন্ধু ও সাহিত্য-রসিক। 'বালকে' প্রকাশিত আমার একটি লেখার তিনি খুব রসগ্রাহী হলেন ও রবিমামাকে সে বিষয়ে লিখে একটি ভবিষ্যদ্বাণী করলেন—"একদিন এই নবীন লেখনী বঙ্গ সাহিত্যে প্রবীণতায় নিজের স্থান নেবে।" রবিমামাই তাঁর চিঠি আমায় পড়ে শোনালেন একটু হাসতে হাসতে। সে হাসি ঐ ভবিষ্যদ্বাণীর অনুমোদনে বা সন্দিহানে জানিনে। তখন আমার বয়স বার বছর।

ইতিমধ্যে আমার এণ্ট্রান্সের টেস্ট পরীক্ষার দিন কাছাকাছি এল। মা শুনে না ভেবে চিন্তেই একটা মন্তব্য করে ফেললেন—"নিশ্চয়ই ফার্স্ট

হবি।" আমার শুনে হাসি পেল। এমন অদ্ভুত কথা মা কি করে বললেন? হেমপ্রভা থাকতে আমি ফার্স্ট হব! কিন্তু আশ্চর্য এই যে মাতৃবচনই সত্য হল। শুধু টেস্টে যে ক্লাসে প্রথম হলুম তা নয়, সেবার এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় আমিই পাস হলুম এবং স্কলার্শিপও পেলুম—আর হেমপ্রভা বেচারী কোন্ একটা বিষয়ে কম নম্বর পাওয়ার সবসুদ্ধ একবারে ফেল হয়ে গেল। এই আঘাতে তার brain fever হল। দুবছর ধরে তার পড়া বন্ধ রইল।

এবারকার এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় ইতিহাসের কাগজ পড়েছিল এন ঘোষ, ব্যারিস্টারের হাতে। তিনি সেকালের ইংলিশ পাঠ্যপুস্তকের একজন 'নোট' লেখক ও 'ইণ্ডিয়ান নেশন' সাপ্তাহিক কাগজের সম্পাদক। সেবার ইতিহাসের প্রশ্নাবলীর মধ্যে মেকলের 'লর্ড ক্লাইভ' নামক পাঠ্যপুস্তকের উপর ভিত্তি করে ক্লাইভের বঙ্গবিজয় সম্বন্ধে একটি প্রশ্ন ছিল। তাতে খুব বেশী নম্বর নির্ধারিত ছিল। আমি মেকলের প্রতিপাদ্য বাঙালী চরিত্রের হেয়তার প্রতিবাদ করে পাঠ্যপুস্তকের লিখিত মন্তব্যের বিপরীত নিজের মন্তব্যপূর্ণ উত্তর দিয়েছিলুম। পরম্পরায় কানে এল মিস্টর এন ঘোষ তার দরুন আমার নম্বর না কেটে আমায় খুব ভাল নম্বরই দিয়েছিলেন, আর খোঁজ করেছিলেন এ মেয়েটি কে? কাদের বাড়ির? ইতিহাসের কাগজে নাকি আমি সেবার প্রথম হয়েছিলুম। তখন আমার বয়স তের বছর। বাঙালী জাতি সম্বন্ধে আমার আত্মাভিমান তখনই মাথা খাড়া করেছিল। এরই পূর্ণ বিকাশ দেখা দিলে বছর দশ-বার পরে কিপলিং-এর একখানা ছোট গল্পের বইয়ের একটা গল্পে বাঙালী জাতিকে ভীষণভাবে অবমানিত পেয়ে তার প্রতিবিধানকল্পে আমি যে দেশ ও জাতিব্যাপী প্রচেষ্টা আরম্ভ করলুম তাতে। সে বিষয়ে বিস্তারিত কথা যথাসময়ে আসবে। ইতিমধ্যে আমার বাঙালী জাত্যভিমানের মধ্যবিকাশ হল প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি বঙ্গবীরদের স্মৃতি উদ্বোধক উৎসবের প্রবর্তনায়।

আমি যখন এণ্ট্রান্স পাস করলুম ফণিদাদা তখন রাজসাহী কলেজে প্রোফেসর। মাকে দিদি সেখানে নিজের কাছে কয়েক মাসের জন্যে নিয়ে যাবার আয়োজন করলেন। সেবার এলাহাবাদে বোধ হয় প্রথম কংগ্রেসের অনুষ্ঠান চলছে। বাবামশায় সেখানে। আমি তাদের স্টেশনে পেঁছে দিতে গেলুম। গাড়ি যখন ছাড়ে ছাড়ে আমার হঠাৎ কান্না পেল, আমি খুব কাঁদতে লাগলুম। মায়ের দয়া হল। তখনো সময় আছে, তাড়াতাড়ি

আমার জন্যেও টিকিট নেওয়া হল। আমার কাপড়-চোপড় পরের ট্রেনে পাঠানর বন্দোবস্ত হল। আমি চল্লুম তাঁদের সঙ্গে। সেই প্রথম কলকাতা থেকে দূরে বাঙলার অভ্যন্তরে যাওয়া আমার।

সেদিন কেঁদে আমি জিতে গেলুম।

কিন্তু ঐ বয়সে কান্নাটা আমার স্বভাবসিদ্ধ ছিল না—হাসিটাই আমার প্রকৃতিগত ছিল। কথায় কথায় কারণে অকারণে আমার হাসি পেত। ক্লাসে বসে প্রোফেসারের কাছে পড়ছি, হঠাৎ দক্ষিণের বারান্দার কার্নিসে বসে কাক কা কা করে ডেকে উঠলে হাসি সামলাতে পারতুম না। সর্বদা হাসিখুশির ও গল্প জমান স্বভাবের দরুনই বোধ হয় আমি স্কুলে ছোট-বড় সকলের লোকপ্রিয় ও বন্ধু ছিলুম।

রাজসাহীতে স্যার তারকনাথ পালিতের পুত্র সিভিলিয়ান লোকেন পালিত এ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে আমাদের অনেক দিনের পারিবারিক বন্ধুত্ব। আমরা গিয়ে অবধি দিদির বাড়িতে তাঁর প্রায় সারাদিন কাটত। একবার করে কোর্টে যাওয়া ছাড়া। তাঁর পিতার মত তিনিও ভারী গল্পুড়ে ছিলেন, আর কি চিত্তহারক সব গল্প করতেন তাঁর কেম্ব্রিজের বন্ধুদের। তাঁর এক একজন বন্ধু নাম ধাম গুণ ও কর্মে আমাদের এত পরিচিত হয়ে পড়েছিলেন ঠিক যেন আমাদেরই ব্যক্তিগত বন্ধু। লোকেন ছিলেন অত্যন্ত 'intellectual', ইংরেজী কাব্য ও সাহিত্যে গভীরভাবে প্রবিষ্ট, তাঁর সঙ্গে নানা কথার আলোচনায় সুখ ছিল। তিনি বললেন একদিন—"এত যে ভাব ছিল আমার ইংরেজ ও স্কচ সহপাঠীদের সঙ্গে নিজেদের মধ্যে কোন পার্থক্য বোধই আসত না—তবু যেদিন একদিন তাঁদের গান শুনলুম,

> Rule Britannia! Britannia rules the waves!
> Britons never shall be slaves.

—সেদিন অন্তরের গভীরতম স্তর থেকে অনুভব করলুম—আমি কত দূরে ওদের থেকে, কত পর ওদের।"

সাহিত্যিক বা রাজনৈতিক আলোচনায়, আহারে-বিহারে, আমোদে-প্রমোদে সবতাতেই লোকেন আমাদের সঙ্গী ছিলেন। একবার দিদিকে ও আমাকে ইংরেজীতে একটি প্রবন্ধ রচনার প্রতিযোগিতা দিলেন, "Love & Friendship."—আমি যা লিখেছিলুম, তার একটা সেণ্টেন্স আমার মনে পড়ে—"Friendship is love without its wings"—নিশ্চয়ই কোন ইংরেজ লেখকের লেখা থেকে ভাবটা পাওয়া—নয়ত ও বিষয়ে

ওরিজিন্যাল গবেষণা তখন আমার মাথায় আসা সম্ভব নয়। সে সময় জর্জ ইলিয়ট প্রভৃতির বই খুব পড়তুম। যা হোক লোকেন জানালে প্রতিযোগিতায় আমার জিৎ হয়েছে এবং নির্ধারিত প্রাইজটি আমায় দিলে। দিদি রেগে গেলেন, বললেন লোকেন পক্ষপাতিতা করেছে, আগে থাকতে ঠিক করা ছিল ওর যে আমাকেই প্রাইজ দেবে—তার প্রমাণ এই যে, জিনিসটার উপর আগে থাকতেই আমার নাম লিখে রেখেছিল। জিনিসটা হচ্ছে প্রায় একশখানা ছবি সমেত একটা spectroscope, যার দুভাগে দুখানা একই রকম ছবি রাখলে focus হয়ে একখানা অতি সুস্পষ্ট বড় ছবি দেখা যায়।

লোকেনের কৈফিয়ৎ তলব হল। সে বললে, তার জানা ছিল—আমি বেশী ভাল করে লিখতে পারব। দিদির রাগ তাতে কমল না, আমি কিন্তু ওঁদের দুজনের ঝগড়া শুনে হেসে কুটিকুটি হলুম। চিরকালই আমার এই স্বভাব—আমায় বা আমার সম্পর্কে কেউ রেগে কিছু বললে আমি হাসি।

বিকেলে আমরা সবাই হেঁটে বেড়াতে বেরতুম। রাজসাহীর একটা দিকে তখন খুব জঙ্গল ছিল। একদিন জঙ্গলে বেড়াতে যাওয়া স্থির হল। অনেকে ভয় দেখালে—ও জঙ্গলে এখনও বাঘ থাকে। সাবধান করলে—সবাই একসঙ্গে কাছাকাছি থাকি যেন, আগে-পিছে না হই, জোরে জোরে শব্দ করে কথা কইতে কইতে আর হাততালি দিতে দিতে যাই যেন, আর সন্ধ্যা হবার আগেই যেন ফিরে আসি। শহুরে মেয়ে আমরা, বাঘ বেরনর ব্যাপারটা একটা কাল্পনিক কথা মাত্র, তার সত্যতায় বিশ্বাস নেই। সুতরাং তার ভয়াবহতাও আমার মনে বসল না। বরঞ্চ হাততালি দিয়ে চলতে হবে শুনে ভারি মজা লাগল। চিড়িয়াখানায় পিঁজরের ভিতর দেখা বন্ধ বাঘ যে জলজ্যান্ত খোলা বাঘ হয়ে আমাদের সামনে আসতে পারে, এমন অভূতপূর্ব অবস্থা হাস্যকরই ঠেকল। আমি একটা বোকা-ন্যাকার মত বললুম—"বাঘ বেরলে যদি তাকে দেখে আমার হাসি পায়।" "ওঁর সবতাতেই হাসি পায়!" দিদি বল্লেন—"আহামরি—শিশু!" লোকেন বললে—"হ্যাঁ তাই বটে! বাঘ বেরলে হাসি পাবে না আরও কিছু।"

চিত্ত তখন একেবারে লঘু, ভয়-ভাবনার ধার ধারিনে, সবই মজার বিষয়, হাসির বিষয়! ভয়ের ভয়ঙ্করতা জানা না থাকার দরুনই নির্ভীক হয় মানুষ। কিন্তু যখন জানলুম, তখনও ভয়কে দুঃখকে চোখরাঙানিকে

হাসি দিয়ে বঞ্চিত করার স্বভাব আমার রয়ে গেল; গভীর রাজনৈতিক বিপদের দিনেও মহাত্মা গান্ধী তাই একবার বলেছিলেন আমায়—"Your laughter is a national asset! Laugh away!" জীবনে কাঁদিনি তা নয়,—সে লুটোপুটি খেয়ে অন্তরের অন্তঃপুরে অনেকবার—লোকের সামনে নয়। বৌদ্ধ ত্রিপিটকে একটা গল্পে আছে, একজন বোধিসত্ত্ব বলছেন—"জনমে জনমে যত কান্না কেঁদেছি, তাতে অনেকানেক অশ্রুর সমুদ্র রচিত হয়েছে।" আমাদেরও একটা জন্মেরই কান্না জড় করলেও তাই হয়।

॥ চৌদ্দ ॥

নানা কথা—নানা লোক

জীবনের মোড়ফেরা

বলেছি কাশিয়াবাগান আমাদের বহু আত্মীয় সমাগমের একটা আড্ডা ছিল। যোড়াসাঁকোর সবাই প্রায় আসতেন। আত্মীয় ছাড়া কুটুম্বদেরও নিত্য আগমন ছিল। মোহিনীবাবুর চারটি ভাই আপনার লোকেরই মত আনাগোনা করতেন। তার মধ্যে তাঁর দ্বিতীয় ভ্রাতা রমণীবাবুর সঙ্গে সরোজাদিদির ছোট বোন ঊষাদিদির বিয়ে হয়ে গেল। রমণীবাবু আত্মীয়শ্রেণীভুক্তই হয়ে গেলেন এবং আজীবন আমাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কবান রইলেন। মোহিনীবাবু যখন বিলাত প্রবাসে, রমণীবাবুই তখন তাঁদের বৃহৎ পরিবারটি পালন করতেন। আমার বাবা-মশায়ের সাহায্যে তিনি মিউনিসিপ্যাল কমিটিতে একটি বড় চাকরি পেলেন। তাঁদের চতুর্থ ভ্রাতা রজনীর আবিবাহ কাশিয়াবাগানে আনাগোনা ছিল। তখন তার ছাত্রজীবন। পড়াশুনায় খুব ভাল ছিল—আর আমাদের নানা বই থেকে মুখে মুখে গল্প শোনাত। আইভানহোর গল্প বোধহয় প্রথম তার কাছে শুনি, পুকুরে একটু একটু সাঁতার দিতে সে-ই শেখায়। আমি তখন ছোটর দলে, তার বেশি ভাব ছিল দিদির সঙ্গে। কলেজে পড়তে পড়তেই বোধহয় তার গগনদাদাদের ছোট বোন সুনয়নীর সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ হল। কাশিয়াবাগানে আনাগোনা কমে এল। যে রাত্রে তার

বিয়ে, আমরা যোড়াসাঁকোর বাইরের বারান্দা থেকে খুব ঘটা করে, খাসগেলাসের বাতি জ্বালিয়ে, গড়ের বাদ্যি বাজিয়ে বর-আগমন দেখলুম। বর জুড়িঘোড়ার গাড়িতে বসা, মাথার উপর ছত্র ধরা—দেখতে খুব সুন্দর, সব ভাইদের মধ্যে সেই সবচেয়ে গৌরবর্ণ। গাড়ির থেকে নেমে ৬।১ নম্বরের অন্তঃপুরে সে যে প্রবেশ করল—সেই অবধি অন্তরাল হয়ে গেল আমাদের চোখের থেকে ও জীবনের থেকে। গগন-দাদাদের সঙ্গে যোড়াসাঁকোর এ বাড়ির সামাজিকভাবে মেলামেশা নেই, আদান-প্রদান নেই, তখন পর্যন্ত—প্রাইভেটভাবে ছেলেদের যাতায়াত থাকলেও। পাথুরেঘাটার, কয়লাহাটার ও মদনবাবুদের বাড়ির পুরুষ ও মেয়েরাই তাঁদের বেশি আপন--মহর্ষির বাড়ির সবাই রক্তেতে নিকটতর হলেও ব্যবহারে পর। অথচ একদিন এল যেদিন এই রজনী ও সুনয়নীর মেয়ের সঙ্গেই দ্বিপুদাদার ছেলে দিনুর বিয়ে হল। দিনুর সেই প্রথমা পত্নী। তার অকালমৃত্যুর পর দিনুর দ্বিতীয়বার বিবাহ হল মদনবাবুদের বাড়িতে, ঠাকুর গোষ্ঠীর এমন একটি ঘরে যাদের সঙ্গে সামাজিকতা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কাল যেমন নিকটকে দূরে করে, তেমনি আবার দূরে সরাকে কাছে টেনে আনে। গগনদাদাদের বড় বোন বিনয়নীরই মেয়ে প্রতিমা—রথীর স্ত্রী। সে কিন্তু অনেক পরের কথা। সুনয়নীর সঙ্গে বিয়ের পর থেকে রজনী ঘরজামাই হয়ে সেই যে ৬।১নং-এ বাস করতে লাগল—আর আমাদের সঙ্গে তিলমাত্র সম্পর্ক রইল না। ওবাড়ির মেয়েদেরই মত সেও অসূর্যম্পশ্য হল এ বাড়ির সম্পর্কিত সকলের। তখনো তার ছোট ভাই সজনী ও সেজদাদা যোগিনীর কিন্তু মোহিনী রমণীবাবুদের সঙ্গে সঙ্গে কাশিয়াবাগানে সমান গতিবিধি রইল। যোগিনীর শুধু গতি নয়, একেবারে স্থিতি বল্লেও চলে। মোহিনীবাবু সুবিজ্ঞ, সুপণ্ডিত: রমণীবাবু প্র্যাকটিক্যাল কমনসেন্সবান—তিনিও পড়াশুনায় অগ্রণী, তখনই বিদ্যাসাগর কলেজে অধ্যাপক। এন্ট্রান্সের সময় ইংরেজী বইগুলিতে তিনি আমাকে খুব তৈরী করে দিয়েছিলেন। সজনী ছেলেমানুষ, পাগলাটে, পরে বোধহয় একেবারেই পাগল হয়ে গিয়েছিল। আর যোগিনী—কি বলব? কখনো একান্ত মৌন—তখন দাদারা ঠাট্টা করতেন—"পিঞ্জরে বসিয়া শুক মুদিয়া নয়ন, কি ভাবিছ মনে?" চটত না কিন্তু, একেবারে নির্বিকার। কখনো খুব বাক্যবাগীশ। দশ-পঁচিশ প্রভৃতি খেলায় যে দানটা চায়, ঠিক সেইমত কড়ি ফেলতে একেবারে সিদ্ধহস্ত। তর্কে ও তাসে তাকে পরাস্ত করা প্রায় অসম্ভব।

জীবনের শেষভাগে আমার মায়ের সাহায্যে বিলেত গিয়ে ব্যারিস্টার হয়ে এসেছিল। একটা কোন আশা নিয়ে গিয়েছিল। সে আশা পূর্ণ হবার নয় তাও জেনেছিল সেখানে থাকতে থাকতেই। ব্যারিস্টার হয়ে হাইকোর্টে যাতায়াত করত; কিন্তু জীবিকা অর্জন তার ব্রিজ খেলার জিতের উপরই বাঁধা ছিল। বিলেত থেকে ফেরবার আগে সকলের অগোচরে এক মেমকে বিয়ে করে তাকে ও একটি কন্যাকে রেখে এসেছিল, নিজের রোজগারে তাদের পালন পোষণ করত, সে বিষয়ে কর্তব্যশীল ছিল, কেবল স্বভাব-সুলভ মৌনবৃত্তি অবলম্বন করে পাঁচজনকে জানায়নি। অনেক পরে মায়ের মৃত্যুর পর এক ডাগর কন্যা যখন জাহাজে করে কলকাতায় উত্তীর্ণ হয়ে, মোহিনীবাবুদের গৃহে উপস্থিত হল, তখন সকলে জানতে পারলে। মেয়েটি খুব ভাল, এখন লেডি ডাক্তার। আর একজনকে মনে পড়ে, সে-ও আপন লোকের মত অকাতরে আসা-যাওয়া করত। সে হচ্ছে অবিনাশ চক্রবর্তী—কবি বেহারী চক্রবর্তীর অতি আদরের বড় ছেলে। তার উপর বেহারীবাবুর একটি কবিতা ছিল—"বাছনি আমার"—তাই দিয়ে সে সকলের পরিচিত। ভারি সরল, ভারি সাদাসিধে ও ভারি সঙ্গীত-প্রিয় ও সঙ্গীতের রসজ্ঞ সে। আমি একদিন একলা বসে বসে আপন মনে পিয়ানোতে বিথোভনের প্রসিদ্ধ ক্লাসিকাল রচনা "Moon-light Sonata" বাজাচ্ছিলাম। সে পাশের ঘরে বসে চুপ করে শুনছিল। আমার বাজনা শেষ হয়ে গেলে আমার কাছে এসে বল্লে—"মরি! মরি! কি সুন্দর।" তার পরদিন আমার উপর একটি কবিতা লিখে নিয়ে এসে আমায় উপহার দিলে—"প্রাণের বোনটি আমার সরলা সুন্দরী।" তার আসা-যাওয়া ক্রমে কমে এল, একেবারে বন্ধ হল। শেষে নাকি সে উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল।

কাশিয়াবাগানে আর এক পরিবারের নতুন করে যাতায়াত আরম্ভ হল—সে আশু চৌধুরী ও তাঁর অনুজদের। এঁদের ভিতর আর এক রকমের চটক ছিল সেকালের "আধুনিকতা"। যত না পাবনাই এঁরা, তারচেয়ে বেশী কৃষ্ণনাগরিক। এঁদের বাঙ্গলা উচ্চারণে সেই মনোমোহন-লালমোহন-ঘোষীয়তা, ঐ দুই ভাইয়ের মতই এঁদেরও বচনপ্রাচুর্য। এঁদের মনস্তত্ত্ব অনেক নতুন ভাবের রাজ্যে ঘোরাফেরার গাঁথুনির উপর দাঁড়ান। সব ভাইদের মধ্যে আশুবাবুই সবচেয়ে চটকদার। তাঁর ভিতর এমন একটি মোহিনী ছিল, যাতে সবাইকে বশ করতেন। তাঁদের সেজভাই কুমুদ-বাবুরও সেটা কতক কতক ছিল।

এঁরা ছাড়া লোকেন ত আসতই—যখনি ছুটি পেত। চৌধুরী ছোট ভাইদের সঙ্গে তার পরিচয় ছিল না আগে, এখানে হল। আশুবাবু কিন্তু তার পরম বন্ধু বিলেত থেকেই। এঁদের সকলের আসা-যাওয়ার সমসাময়িক আমার লেখার হাত খুলে যাওয়া।

অন্যত্র একবার বলেছি—'বালকে' প্রকাশিত আমার প্রথম প্রথম রচনা উদ্যমের পর ভারতীতে 'প্রেমিক-সভা' বলে স্বাক্ষরিত হাস্যরসান্বিত একটি লেখা লিখে Byron-এর মত আমি একদিন হঠাৎ জেগে উঠে দেখলুম বড় লেখক হয়ে গেছি, চারদিক থেকে প্রশংসা বর্ষণ হতে থাকল, এবং আর সবাইকে ছাপিয়ে রেখে রবিমামা অপ্রত্যাশিতভাবে অভিনন্দন করে লিখলেন—"নাম দিসনি বলে তোর এ লেখার ঠিক যাচাই হল। নতুন হাতের লেখার মত নয়, এ যেন পাকা প্রতিষ্ঠ লেখকের লেখা। এ যদি আমারই লেখা লোকে ভাবত, আমি লজ্জিত হতুম না।" এত বড় সমাদরে আমি আহ্লাদে লজ্জায় মৌন হয়ে গেলুম। কিন্তু এ-লেখা লিখে একটু বিপদেও পড়লুম। কেউ কেউ নিজের মাথায় টুপি খাপ খেয়ে বসছে সন্দেহ করে মাথা চুলকাতে লাগল, কেউ বা কথঞ্চিৎ মাথা-গরম হয়ে আমার দিকে কটমট করে তাকাতে লাগল। কিন্তু এ চায়ের পেয়ালার ঝড় শীঘ্রই শান্ত হয়ে গেল। 'চিরকুমার সভা'র মত প্রেমিক-সভা ভেঙ্গে গেল না, সমানই কার্যকরী রইল।

কলম আমার খুলে গেল। এর পর সংস্কৃত কাব্যের আলোচনামূলক লেখা বেরতে থাকল। প্রথমেই কুমারসম্ভবের 'রতি-বিলাপ'। হীরেন দত্ত পরম্পরায় বলে পাঠালেন—"ভারি একটা নূতনত্ব আছে এ-লেখায়।" তাঁর মৃত্যুর দু-তিন বৎসর পূর্বেও—যখন 'নীলের উপোস' শোনাচ্ছিলুম তাঁকে—তার প্রতিপাদ্য বিষয় ও ভাষার তারিফ করতে করতে বললেন—"আপনার সব লেখা বই আকারে ছাপান না কেন? বাঙলার সাহিত্য-জগৎকে বঞ্চিত করে রাখছেন। আপনার 'রতি-বিলাপ' একটা sensation এনেছিল—সেসব ত আজ পর্যন্ত বই করে গেঁথে রাখলেন না। এখনো ছাপিয়ে ফেলুন।"

তার পরে 'মালবিকা-অগ্নিমিত্র'। বঙ্কিমবাবুকে এইটি পড়তে পাঠিয়েছিলুম আগে লিখেছি। তাঁর এ বিষয়ে যে দুর্মূল্য চিঠি পেলুম, সে চিঠি গেছে পঞ্জাবের পলিটিক্যাল অগ্নিতে ভস্মীভূত হয়ে—সে কথাও পূর্বে বলেছি। 'মালবিকা-অগ্নিমিত্র' সম্বন্ধে রবিমামার চিঠিও সঙ্গে সঙ্গে গেছে। শুধু এই বিষয়ের চিঠি নয় তাঁর। ছেলেবেলা থেকে তাঁর যত

চিঠি পেয়েছিলুম—অন্তত খান পঞ্চাশেক হবে—সবই অকালে কালগভে প্রলীন হয়ে গেছে।

তার পরে বেরল 'মালতী-মাধব'। এ সবই আমার এফ-এ ও বি-এতে পাঠ্যপুস্তক ছিল। 'মৃচ্ছকটিক' আরম্ভ করেছিলুম, শেষ হয়নি। 'কবি-মন্দির' নাম দিয়ে এগুলি একত্রে গ্রন্থাকারে বের করতেও প্রবৃত্ত হয়েছিলুম—দীনেশ সেনের তত্ত্বাবধানে, কেননা তখন নিজে আমি লাহোর যাত্রাভিমুখে। দু-তিন ফর্মা মাত্র ছাপিয়ে দিয়ে দীনেশবাবু আর শ্রমস্বীকার করে অগ্রসর হলেন না—ছাপান ফর্মাগুলি কোথায় রাখলেন, তারও সন্ধান পেলুম না—ছাপাখানা তাদের পাওনা আমার কাছ থেকে কড়ায় গণ্ডায় অগ্রিম নিয়ে নিয়েছিল। নিজে প্রবাসে থেকে কারো হাতে বই ছাপানর ভার দেওয়া নিরর্থক অর্থের শ্রাদ্ধমাত্র বুঝে নিলুম। তারপর দেশে এসে যখনই নিজে চেষ্টাপরায়ণ হয়েছি, জগৎজোড়া যুদ্ধের করাল-মূর্তি দেখা দিয়েছে—কাগজের দুষ্প্রাপ্যতাবশত সকলে আমায় নিরস্ত করেছে।

ইতিমধ্যে মায়ের সঙ্গে সোলাপুরে মেজমামার কাছে থাকতে গেলুম কয়েক মাসের জন্যে। সেখানে মারাঠি ক্লাবে দুর্গাপুজার 'দশেরা' বা বিজয়া দশমীর উৎসবের দিন বরোদার গাইকোয়ার এলেন। মহারাজা অতি ভদ্র—মায়ের প্রতি ও আমার প্রতি যে সৌজন্য দেখালেন, তাতে মুগ্ধ হলুম। কিন্তু সেদিন যে উৎসব দেখলুম, তাতে একেবারে চমৎকৃত হলুম। খালি লাঠি-তলোয়ার খেলার ও নানাবিধ ব্যায়ামের প্রদর্শনী—আর বীরত্বমূলক বক্তৃতার ধারা। আমাদের দেশের বাঈনাচ, গান ও মদ্যপান প্রভৃতির ধারা নয়।

তার পরে গেলুম, পুণায় বম্বে প্রসিডেন্সীর সিভিলিয়ানদের একটা Fancy-dress Ball-এ। সমস্ত ঘর-ভরা সাহেব-মেমদের মধ্যে আমরা তিনজন মাত্র ইন্ডিয়ান—মেজমামা, মা ও আমি। মনে পড়ে মা সন্ন্যাসিনীর সাজে গিয়েছিলেন, আমি সরস্বতীর। মাকে এই সন্ন্যাসিনীর বেশ খুব শোভা পেত। বসন্ত-উৎসবের অভিনয়েও তিনি সন্ন্যাসিনীর ভূমিকা নিয়েছিলেন। নতুনমামী হয়েছিলেন উপেক্ষিতা নায়িকা—যতদূর মনে পড়ে সন্ন্যাসিনীর বরে তিনি নায়কের প্রেমে পুনঃপ্রতিষ্ঠিতা হয়েছিলেন।

পুণায় যাওয়া সেবার এই 'সিভিল-সার্ভিস নাচ' উপলক্ষে। কিন্তু সে ব্যাপারটা আমার মনে কোন স্থায়ী রেখা কাটল না—পদ্মপত্রে জলের মত সরে গেল। লোকেনের সেই কথাটি মনে পড়ল—যেদিন সে অনুভব

করেছিল ইংরেজদের ও তার মধ্যে কি একটি দুর্মোচনীয় ব্যবচ্ছেদ-রেখা। সে যাত্রায় আমার মনের ভিতর একটা স্থায়ী ভাবের বিক্ষোভ তুললে পুণায় শহরের মধ্যে শনিবার পেট দিয়ে যেতে একটি পেশোয়া-স্তম্ভের সম্মুখীনতায়। ভারতীতে সেবার আমার একটি প্রবন্ধ বেরল—'বাঙালী ও মারাঠি'। 'বীরাষ্টমী' উৎসবের বীজ মনে মনে উপ্ত হল সেই দশেরার দিনের খেলা দেখায় ও এই পেশোয়াদের বীরত্ব-স্তম্ভের সন্দর্শনে। বাঙালীর জাতীয় উৎসব পন্থায় পরিবর্তন আনিয়ে তার জাতীয় চরিত্রের আমূল পরিবর্তনের একটি সূত্র আমার হাতে ধরালেন জগৎ-ব্যাপারের মহাসূত্রধর।

আজকাল ঘরে ঘরে, স্কুলে স্কুলে, সভায় সভায় মেয়েদের নাচ। সেকালে তাল রেখে রেখে স্টেজের উপর দু-পা চলাও গর্হিতাত্মক ছিল। একবার "আয় তবে সহচরী হাতে হাতে ধরি ধরি নাচিবি ঘিরি ঘিরি গাহিবি গান" রবীন্দ্রনাথের এই গানের সঙ্গে ছোট মেয়েদের একটু নাচের ধাঁচা ঢুকিয়ে দিলুম কত ভয়ে ভয়ে। কিন্তু তার চেয়ে সাহসিক কাজ আর একটা হয়েছিল।

সাড়ে সাত বছরে বেথুন স্কুলে ঢুকেছিলুম—প্রায় দশ বছর পরে, আমার সতের বছর বয়সে বি-এ পাশ করে স্কুল থেকে বেরিয়ে এলুম। কিন্তু স্কুলের সঙ্গে সম্পর্ক একেবারে বিচ্ছিন্ন হল না। বছর বছর প্রাইজের সময় তদানীন্তন লেডি-সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিস্ চন্দ্রমুখী বসু ও পরে কুমুদিনী খাস্তগির আমায় অনুরোধ করে আনাতে লাগলেন মেয়েদের প্রাইজের দিনের গান-বাজনায় তৈরি করে দেবার জন্যে। আমার নিজের গান একটি শেখালুম

'নমো নমো ভারত জননি—
বিদ্যামুকুটধারিণী!
বরপুত্রের তপ-অর্জিত
গৌরব মণিমালিনী!'

এটি জগদীশ বসুকে নতুন মামার সঙ্গীত-সমাজ থেকে মানপত্র দেওয়ার উপলক্ষে রচিত হয়েছিল—অনেকেই এর আগে শোনেন নি। শত গানে স্বরলিপি আছে। বেথুন স্কুলে প্র্যাকটিস যখন চলছিল, তখন বিপিন পাল তাঁর কাগজে এই গান সম্বন্ধে একটা মন্তব্য লিখলেন—"তাঁর মেয়েরা বাড়িতে একটি নতুন গান অভ্যেস করছিল—তার কথা তাঁর কানে ভেসে এল। একটা আশ্চর্যতা অনুভব করলেন। এতদিন দেশে যত জাতীয়-

সঙ্গীত রচিত হয়ে এসেছে, সবেরই ভাব হতাশাময়, অতীতের স্মরণে শোকমূলক ক্রন্দনময়। এই গানের প্রাণ আর এক রকমের—বর্তমানের উপর দাঁড়িয়ে তেজস্বিতার সঙ্গে উৎসাহময় ও ভবিষ্যতের নিশ্চিততায় আনন্দময়।" কিন্তু প্রাইজের দিন যখন স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সামনে এই গান গীত হল তিনি—বেথুন স্কুলের একজন কমিটি মেম্বর—একটু স্বতন্ত্র হয়ে পড়লেন, উসখুস করতে লাগলেন। পরের দিন চন্দ্রমুখী বসুকে ডেকে পাঠিয়ে জানালেন—এ গান স্কুলে গাওয়ান ঠিক হয়নি—কেননা, তার শেষ লাইনগুলি হচ্ছে—

> এসেছে বিদ্যা, আসিবে ঋদ্ধি
> শৌর্যবীর্যশালিনী।
> অপমানক্ষত জুড়াইবি মাতঃ
> খর্পকরবালিনি!

আমার সময়ে ছেলেমেয়েদের একই বিদ্যামন্দিরে co-education ছিল না। যখন আমি এফ-এ ক্লাসে উঠলুম সুধীদাদাদের মত আমারও 'Science' একটা পাঠ্য-বিষয় করবার প্রবল ইচ্ছা ছিল। বেথুন কলেজে তার সুযোগ নেই। আমি এডুকেশন-বিভাগে অনেক নিষ্ফল আবেদন-নিবেদন করলুম—কোন বন্দোবস্ত হল না। অবশেষে বাবামহাশয়ের বন্ধু ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের Science Association-এ সান্ধ্য লেকচারে যোগদানের আয়োজন হল আমার জন্যে। ভিন্ন ভিন্ন কলেজের এফ-এ ক্লাসের ছাত্রতে ভরা থাকত লেকচার হল। আমি একমাত্র ছাত্রী হলুম। প্রথমে ডাক্তার সরকার ও ফাদার লাঁফোর সঙ্গে তাঁদের ঘরে গিয়ে বসে থাকতুম, আমার সঙ্গে সুধীদাদা ও আমার দাদা থাকতেন। যখন লেকচারের সময় আসত লেকচারাররা উঠে হল-অভিমুখে যেতেন, সেই সময় আমিও উঠতুম, আমার দু-পাশে দুই দাদা থাকতেন। ছেলেরা ফিস ফিস করে বলত—'Body-guards!' আমাদের তিনজনের জন্যে সামনের লাইনে তিনখানা চেয়ার লাগান থাকত, ছাত্রদের জন্যে বেঞ্চ।

এই রকম করে Physics শিক্ষা হল আমার। বেথুনে বটানি নিতে পারতুম—যার দরুন কোন apparatus-এর দরকার হত না। কিন্তু আমার দৃঢ় পণ ছিল আমি বাড়ির ছেলেদের সমান সমান Physics-ই নেব। এই লেকচার শোনা ছাড়া বাড়িতেও সাহায্য পেতুম যোগেশবাবুর কাছে—আশুবাবুর মেজ ভাই। তখনো তিনি বিলেত যাননি—মেট্রপলিটনেই

বোধ হয় বিজ্ঞানের অধ্যাপক। আমার জিদ বজায় রইল, পদার্থ-বিজ্ঞানে আমার প্রাথমিক প্রবেশ লাভ হল, পাসও হলুম এবং সায়ান্স এসো-সিয়েশন থেকে একটি রৌপ্যপদক পেলুম। সেই পর্যন্ত ফাদার লাঁফোর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠভাবে জানাশোনা হয়ে গেল। তিনি শুধু সেণ্ট-জেভিয়ারের একজন মাস্টার নন, সামাজিক মেলামেশায়—ডিনারে, ইভনিং পার্টিতে, সব আমোদ-প্রমোদে সদা সামিল হন; গল্প-গুজব, হাসিখুশি ও সৌজন্যে ভরা।

বি-এ ক্লাসে যখন উঠলুম, তখন লক্ষ্ণৌ মিস্ থোবার্নের স্কুল থেকে দুটি খ্রীস্টান মেয়ে এসে আমার সহপাঠী হল। একজন বাঙালী শরৎ চক্রবর্তী ও একজন হিন্দুস্থানী—নাম এথেল র‍্যাফেল। শরৎ একেবারে আদর্শ নেটিভ খ্রীস্টান মেয়ে—মিশনারি আগ্রহে ভরা। তার নিজের মুখের কথায় জানলুম—হিন্দু মেয়েদের খ্রীস্টান করার জন্যে তাদের বাড়ি থেকে চুরি করে আনা, লুকিয়ে রাখা, আত্মীয়দের ধোঁকা দেওয়া—সব কিছুতে অভ্যস্ত সে। এথেল আর একরকম প্রকৃতির। সেও খ্রীস্টধর্মে গোঁড়া বিশ্বাসী, কিন্তু ছল-চাতুরির ভিতর দিয়ে যায় না। সুন্দরী নয়, কিন্তু তার চোখ দুটির ভিতর এমন একটি 'wistfulness' আছে—দেখলেই তার প্রতি মায়া বসে। রবিমামাও সেটি লক্ষ্য করেছিলেন—যখন তাকে একদিন আমাদের বাড়িতে দেখেন।

বেথুন কলেজে এসে আমার সহপাঠী হয়ে তার বুকের ভিতর একটা মস্ত আলোড়ন চলতে থাকল। পঞ্জাব ও পশ্চিমে সেকালে দস্তুর ছিল মিশনরিরা কাউকে খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত করলে তাদের বংশগত ভারতীয় নাম ত্যাগ করিয়ে ইংরেজি নামে ভূষিত করত। তাই এথেল এখন 'মিস্ র‍্যাফেল'। তারা বংশে রাজপুত, তার বংশপরম্পরাগত পদবী হচ্ছে 'সিংহ'। আমাদের সংসর্গে এসে সে জাতীয়তার দ্বারা প্রবলভাবে আক্রান্ত হল। একটা গ্রীষ্মের ছুটিতে লক্ষ্ণৌ গিয়ে সেখানকার ম্যাজিস্ট্রেটকে নোটিস দিয়ে নিজের 'এথেল র‍্যাফেল' নাম পরিত্যাগ করে—'লীলা সিংহ' নাম পরিধান করলে। বোধ হয় কলকাতার য়ুনিভার্সিটি ক্যালেণ্ডারে তার 'লীলা সিংহ' নামই বেরিয়েছিল। 'লীলা সিংহ' নামেই, ফ্রক ছেড়ে শাড়ি পরেই সে থোবর্ন কলেজ থেকে আমেরিকায় খ্রীস্টান মেয়েদের প্রতিনিধি হয়ে গিয়েছিল। স্বদেশপ্রীতি তার ভিতর সর্বতোভাবে জাগ্রত হয়ে উঠল। আজকাল মিশনরিদেরও পলিসি হচ্ছে কনভার্টদের দেশীয় নামই বজায় রাখা। বরঞ্চ লাহোরে এই নিয়ে একটা গোলযোগ হয়েছিল।

চাকরির সুবিধার জন্যে একজনরা নিজেদের মিশনরি-দত্ত ইংরেজি নামের আবরণ ছাড়েন নি। ইংরেজের scale-এ বেতন পেলেন তাতে। কিন্তু গবর্নমেণ্ট জানতে পেরে তাঁদের জোর করে ইংরেজির সঙ্গে দেশী পদবীর একটা লেজুড় জোড়াতে বাধ্য করলে, যাতে সহজেই ধরা যায় যে, আসলে নেটিভ তাঁরা এবং বেতনের হারও তাঁর কমে গেল। লীলা সিংহ তাঁর বংশগত নাম নিজে হতে পুনর্গ্রহণ করে আত্মমর্যাদা ফিরে পেলেন।

বি-এ পাশের পর আমি দু-তিন বছর 'ভারতী'র সেবাকার্যে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিযুক্ত করলুম। তখনো বিয়ের কোন কল্পনাই মাথায় আসেনি—একেবারে যেন 'আপনার মন আপনার প্রাণ আপনারে সঁপিয়াছি।' সংস্কৃতে এম-এ দেবার জন্যে বাড়িতে প্রস্তুত হতে লাগলুম। মহেশ ন্যায়রত্ন শুনতে পেয়ে শাসালেন—"দেখব কেমন করে সংস্কৃত কলেজের ছাত্র না হয়ে বাড়িতে পড়ে এম-এ পাস করে।" আমার অধ্যাপক পণ্ডিত শীতলচন্দ্র বেদান্তবাগীশের জিদ চড়ে গেল—তিনি আমাকে পাস করাবেনই। সাংখ্যকারিকা পড়ান আরম্ভ হল। দুই-এক স্থলে আমার প্রশ্নে তিনি অত্যন্ত প্রীত হলেন—বললেন 'আর একটিমাত্র ছাত্র তাঁকে এই রকম প্রশ্ন করেছিল—সে হীরেন দত্ত—একখানি হীরের টুকরো।'

কিন্তু এম-এ শেষ পর্যন্ত পড়া হল না—মহেশ ন্যায়রত্নের challange-এর উত্তর দেওয়া হল না। আমার মনের ভিতর ভারি একটা চাঞ্চল্য আসতে লাগল—বাড়ির পিঞ্জর ছেড়ে বাইরে ছুটে যাওয়ার জন্যে, কোন একটা নিরুদ্দেশ যাত্রার জন্যে, ভাইদের মত স্বাধীন জীবিকা অর্জনের অধিকারের জন্যে। মাকে বাবামশায়কে বিরক্ত করে করে অবশেষে বাবা-মহাশয়ের সক্রোধ সম্মতি পেলুম। বাকী রইল কর্তা দাদামশায়কে জানান, তাঁর সম্মতি নেওয়া। তিনি নতুন যুগের নিজের ছেলেমেয়েদেরই স্বাধীন ইচ্ছা ও তদনুযায়ী ব্যবহারের কখনো বিরুদ্ধতা করেন না। নাতি-নাত্নীদের বেলায় ত করবেনই না জানা ছিল। মেজমামা যখন মেজ-মামীকে বিলেত নিয়ে যান, কর্তা দাদামশায় বাধা দেননি—বিলেত থেকে ফিরলে যখন তাঁকে নিয়ে গবর্নমেণ্ট হাউসের পার্টিতে যান কর্তা দাদা-মশায় বাধা দেননি—যদিও যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতিরা ঘরের বউকে সেখানে দেখে লজ্জায় পাশ কাটিয়ে চলে গিয়েছিলেন, দেউড়ি দিয়ে হেঁটে মেজমামী যখন গাড়িতে চড়ছিলেন, বাড়ির পুরাতন ভৃত্যদের চোখ দিয়ে দর দর করে জল পড়ছিল। মা ও মামীরা তখন গঙ্গাস্নানে গেলে বাড়ি-ভিতর থেকে পাল্কী চড়ে গঙ্গার ঘাটে পেঁছে, পাল্কীশুদ্ধ গঙ্গায়

ডুব দিইয়ে নিয়ে আসা হত তাঁদের। এ-বাড়ি থেকে গগন দাদাদের বাড়িতে কখন যেতে হলেও পাল্কী চড়ে যেতেন। সেই সব প্রাচীন সংস্কার ভঙ্গ করে যখন তাঁরা মেজমামার ইচ্ছানুযায়ী পথানুবর্তিনী হলেন, কর্তা-দাদামশায় কোন বাধা দেননি তখন—আমার বেলায় কেন দেবেন? তবুও তাঁকে বলতে হবে, আশীর্বাদ নিতে হবে। তিনি আমার যাবার ইচ্ছা শুনে কোন আপত্তি প্রকাশ করলেন না। শুধু বড়মাসিমাকে ডেকে বললেন—"সরলা যদি অঙ্গীকার করে জীবনে কখনো বিয়ে করবে না, তাহলে আমি তার তলোয়ারের সঙ্গে বিয়ে দিই যাবার আগে।"

এই রোমাণ্টিক প্রস্তাবে আমি নিজের ভিতর ডুবে ভেবে দেখলুম—কখনোই যে বিয়ে করব না, এ রকম প্রতিজ্ঞা নিতে কি প্রস্তুত আমি? আমাদের বাড়িতে থিয়সফির প্রভাবের দিনে কাশী থেকে একজন মাতাজীর প্রাদুর্ভাব হয়েছিল। মা বলতেন—"সরলার বিয়ে দেব না, ঐ মাতাজীর মত দেশের কাজে উৎসর্গিত থাকবে।" ছেলেবেলায় মা-বাপ স্রোতের যে মুখে ভাসান, তৃণটি সেই মুখেই চলতে থাকে। আমার মনোবৃত্তিও অ-বিবাহের মুখে চলে চলে তারই তটে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। পরে মায়ের নিজের মত বদলে গিয়েছিল, খুব চাইতেন আমার বিয়ে দিতে, আমি কিন্তু আর ধরাছোঁয়া দিইনে—যাদের নাম করতেন, তাদেরই না-পছন্দ করতুম। কিন্তু কর্তা দাদামশায় যখন প্রতিজ্ঞা করতে বললেন যে, এ জীবনে কখনো বিয়ে করব না, আমার মনে বিদ্রোহ এল। নিজকে যাচিয়ে দেখলুম এরকম প্রতিজ্ঞা নিয়ে 'চিরকুমারীত্ব' স্বীকার করতে প্রস্তুত নই। কোন মেয়েই সেইটে তার অন্তিম লক্ষ্য করতে পারে না। যতদিন স্বচ্ছন্দে-বিহার চলে চলুক, কিন্তু একদিন যে পরচ্ছন্দে নিজেকে চালানর ইচ্ছে হতে পারে, সে ইচ্ছে পূরণের পথে আপনার হাতেই চিরকালের মত বেড়া তুলে দিতে মন মানলে না।

বাবামশায় যে সম্মতি দিয়েছিলেন তার ভিতর একটি গুপ্ত আশা তাঁর নিহিত ছিল—যাব কোথায়? উপযুক্ত চাকরি কোথায় আমার জন্যে বসে আছে? তা কিন্তু ছিল। সরলা রায়দের সঙ্গে আমি যখন মহীশূর ভ্রমণে গিয়েছিলুম, তখন মহারাজার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়নি—তিনি গিয়েছিলেন উটকামণ্ডে। কিন্তু সেখানকার দেওয়ান-প্রমুখ সকল বড় কর্মচারীরা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দৌহিত্রী বলে আমায় অত্যন্ত উচ্চ নজরে দেখেছিলেন। আমি ডাক্তার রামস্বামীর মাতুল, মহারাজের প্রিয়-পাত্র, রাজ্যে অতি প্রভাবশালী, মহারাণী গার্লস স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ও

সর্বেসর্বা নরসিং আয়েঙ্গার দরবার বক্সিকে একখানি টেলিগ্রাম পাঠালুম—

"Want to serve the school. Wire if opening."

দু-দিনের মধ্যে টেলিগ্রামের উত্তর এল—

"Always opening for you. Start as soon as you like."

পরে তাঁর কাছে গল্প শুনলুম, আমার টেলিগ্রাম পেয়ে তিনি আনন্দে বিভোর হয়ে মহারাজাকে গিয়ে বলেছিলেন—"একটি A1 পরিবারের মেয়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমাদের স্কুলে আসতে চাইছেন। অমূল্য সুযোগ।"

মেজমামা তখন সেতারায়। মহীশূর যেতে বম্বে দিয়ে সেতারা পথে পড়ে। মা সেতারা পর্যন্ত আমার সঙ্গে গেলেন। মেজমামা সেতারা থেকে আমার অভিভাবক হয়ে আমায় মহীশূরে ছাড়তে গেলেন। মেয়েদের চাকরি করা সম্বন্ধে তাঁর মনে কোন দ্বিধা নেই—সব রকম সমাজ-সংস্কারের তিনি পক্ষপাতী। মহর্ষির দৌহিত্রী হয়ে চাকরি করতে যাওয়ায় কোন পারিবারিক লাঘব তিনি অনুভব করলেন না। আমায় পৌঁছিয়ে, সব রকম সুবন্দোবস্ত আছে দেখেশুনে নিশ্চিন্ত হয়ে তিনি ফিরে গেলেন।

কুমুদিনী খাস্তগিরি তখন মহীশূরে ঐ স্কুলেই এসিস্ট্যাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। ঘটনাক্রমে তাঁর ঐ সময় চাকরি ছেড়ে কলকাতায় আসার প্রয়োজন হল। দেওয়ান বা দরবার বক্সির আমার জন্যে নতুন post সৃষ্টি করতে হল না। কুমুদিনী দিদির স্থান আমার জন্যে তখনি উন্মুক্ত হয়ে গেল। তাঁদের ইচ্ছা সকলের অপ্রিয় উপস্থিত যে ইংরেজ মেম লেডি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে বহাল আছে, তার সঙ্গে কড়ারের বছরটা উত্তীর্ণ হয়ে গেলেই আমাকে তার পদে অভিষিক্ত করবেন। একটা বছর এইভাবে চলুক।

আমি আত্মীয়স্বজনবিরহিত জীবনযাত্রায় পদক্ষেপ করলুম। আমার জীবনের মোড় ফিরল।

॥ পনর ॥

মহীশূর

মহীশূরে বাসে যে ভারত আমার হৃদয়ে প্রতিভাত হল সে এক অপূর্ব নূতন। "একালে সেকাল" নাম দিয়ে তার ছবি এঁকেছিলুম তখন 'ভারতী'তে। এ যুগের ভারত নয় যেন সে, সেই সংস্কৃত নাটক ও কাব্যের যুগের।

মহারাণী গার্লস স্কুলের সঙ্গীতাচার্যের কাছে আমি নিজেই বীণা শেখার প্রার্থী হলুম। এমন সুযোগ কি ছাড়তে পারি? প্রথমদিন যখন তাঁর কাছে গেলুম—দেখলুম মাটিতে বড় মাদুর বিছান রয়েছে, তার একধারে তিনি বসে আছেন, একধারে আমার জন্যে জায়গা খালি রয়েছে —মাঝখানে দুটি রুদ্রবীণা। একটি হাতে তুলে নিয়ে—হিন্দী ইংরেজী অনভিজ্ঞ আচার্য সংস্কৃতে "তত্র ভবতি" বলে আমায় অভিবাদন করে বল্লেন—"তন্ত্রী-ত্রুটিতা।" চমকে গেলুম। কালযন্ত্র কি চার-পাঁচশত বছর পিছিয়ে গেছে? আমি কি সংস্কৃত সাহিত্য কাব্য থেকে বেরিয়ে আসা একটি নায়িকা? আমার আশেপাশে সব মেয়েদের বেণীতে কুন্তলে ফুল জড়ান, সুগন্ধি দ্রব্য দিয়ে মাথা ঘষে একটা হালকা যন্ত্রে অল্প অগ্নি রেখে যন্ত্রটি হাতে করে চুলের ভিতর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চুল শুকন—এ সবে কি মেঘদূতের এক একটি বর্ণনা চোখের উপর ভেসে উঠল না? এমন আরও কত কি! যাঁরা কবি কালিদাসকে বাঙালী বলে দাবী করতে চান দক্ষিণ ভারত অঞ্চলে আজ পর্যন্ত প্রবহমান অনেক কিছু আচার ও রীতি দেখে আমার ত মনে হল না তাঁদের দাবী সমূলক। বাঙালীর লোভটা বড় বেশী! কাজ কি আমাদের টানাবোনা করে, নানা কুতর্কে কষ্টপ্রমাণে প্রমাণিত করার চেষ্টায় যে কালিদাস বা ভবভূতি—সবাই বাঙালীর পূর্বপুরুষ—ভারতের অন্য প্রদেশবাসীর নয়? কবি জয়দেবের মত অত বড় ভারতবিশ্রুত কবি থাকতে আমরা আরো কাউকে আমাদের বংশাবলীভুক্ত করতে কেন লালায়িত হব? এ যেন প্রসন্নকুমার ঠাকুরের চেষ্টারই সমতুল্য প্রয়াস যে, শাণ্ডিল্য গোত্রের কবি ভট্টনারায়ণ কেবল শাণ্ডিল্য 'ঠাকুর'দেরই পূর্বপুরুষ—সারা বঙ্গদেশব্যাপী শাণ্ডিল্য গোত্রের বন্দ্যোপাধ্যায় মাত্রের নয়? আশা করি এমন একদিন আসবে না যেদিন বাঙালী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথে সন্তুষ্ট

না থেকে সেক্সপীয়র বা গেটেকে ধরেও টানাটানি করবে বাঙালী বলে প্রতিপাদন করতে।

আমি মহীশূরে যেদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করি সেই দিকেই দেখি অতীত আজও মূর্ত হয়ে আছে। আমার মুগ্ধতায় প্রীত হয়ে দরবার বক্সি সাহেব আমার showman হয়ে আমায় চারিদিকে নিয়ে যেতে লাগলেন। তিনি একজন সংস্কারক। যেখানে অতীত সংস্কারের প্রাচীর এখনও অত্যন্ত দৃঢ় প্রথমেই সেইখানে আমায় নিয়ে গেলেন—মহারাজার কাছ থেকে খাস অনুমতি নিয়ে—পুরুষদের সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শনে। ঘোর সনাতনী পণ্ডিতগণের মধ্যে আমাকে নিয়ে গিয়ে ফেলে অনুরোধ করলেন—"উপনিষদ থেকে দু-একটা মন্ত্র শোনাবেন এঁদের।" দক্ষিণ ভারতের ব্রাহ্মণ সংস্কৃত-অধ্যাপকেরা স্তম্ভিত। প্রথমত এক স্ত্রীলোকের দ্বারা তাঁদের অধ্যাপনাগৃহের দুর্গভেদ—তার উপর তার মুখে বেদ উপনিষদের আবৃত্তি শ্রবণ! স্বয়ং ব্রাহ্মণ নরসিং আয়েঙ্গারের এই অব্রাহ্মণ্য প্রস্তাবে তাঁরা চঞ্চল হয়ে পড়লেন। কিন্তু দরবার বক্সি তিনি, মহারাজের দক্ষিণ হস্ত, তাঁর প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কোন আপত্তি তুলতে সাহস পেলেন না। স্ত্রীমুখে বেদপাঠ তাঁদের শুনতেই হল। আমি ব্রাহ্ম-ধর্মগ্রন্থে কর্তাদাদামশায়ের সঙ্কলিত মন্ত্র থেকে দু-চারটি শোনালুম। সৌভাগ্যবশত আমার বৈদিক উদাত্ত অনুদাত্তাদি স্বর ও সংস্কৃত বর্ণ-মালার উচ্চারণ বাঙালী সংস্কৃতজ্ঞসুলভ অশুদ্ধ ছিল না। তার কারণ যোড়াসাঁকোতে অনেকগুলি দাদাদের একত্রে উপনয়ন সংস্কারের সময় যখন গুরু হেমচন্দ্রের সমীপে কয়দিন বাসকালে এবং তার পূর্বে ও পরেও দুই একমাস ধরে তাঁদের এই মন্ত্রগুলি সম্পূর্ণরূপে কণ্ঠস্থ করান হয়—আমি কর্তাদাদামশায়ের কাছে আবদার ধরেছিলুম—"আমাকেও শেখান হোক।" ছেলেদের শিক্ষা সমাপ্ত হলে ওঁদের মধ্যে এ বিষয়ে যিনি শ্রেষ্ঠ গণ্য হয়েছিলেন সেই ন-মামার একমাত্র পুত্র বলুদাদাকে কর্তা-দাদামশায় আদেশ করেছিলেন আমায় বাড়িতে এসে নিখুঁতভাবে ঐ মন্ত্রগুলি পড়তে শেখাতে। আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্যেরা যে স্বরে ও প্রকারে বেদীতে বসে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করতেন—তা দক্ষিণী ও বেনারসী পণ্ডিতদের স্বর ও প্রকার—বাঙালী অধ্যাপক পণ্ডিতের নয়। দাদামশায় বহুব্যয়ে তাঁদের আনিয়ে আচার্যপদে নিযুক্ত করেছিলেন। সুতরাং মহীশূরের পণ্ডিতেরা আমার উচ্চারণে তাঁদের উচ্চারণ থেকে কোন প্রভেদ পেলেন না। একালে মেয়ের মুখে উপনিষদ শোনায় একটা

সংস্কারগত আঘাত লাগলেও শ্রুতিগত ব্যথা পেলেন না। শুক্ল না যজুর্বেদীয় মন্ত্র বল্লুম—সেই সম্বন্ধে আমার সঙ্গে সংস্কৃতে খানিকক্ষণ আলোচনা করলেন। আমি ব্যাকরণ বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে যতটা পারি উত্তর দিলুম। নরসিংহ আয়েঙ্গার মহা খুশী হয়ে আমায় তারপর নিয়ে গেলেন সাংখ্যের ক্লাসে। সাংখ্যের পণ্ডিত আমায় অপ্রতিভ করার জন্যে আমন্ত্রণ করলেন শিষ্যদের কোন প্রশ্ন করতে। আমি তাতে প্রথমে অগ্রসর হলুম না, কারণ আমার সংস্কৃতে কথোপকথন চালানর শক্তির উপর বেশী জোরজুলুম করতে ভীত হচ্ছিলুম। কিন্তু অবশেষে নরসিং আয়েঙ্গারের পীড়াপীড়িতে বাধ্য হয়ে সাংখ্যকারিকা থেকে একটি প্রশ্ন করলুম। অধ্যাপক বলে উঠলেন—"সাধু! সাধু!" কিন্তু শিষ্যেরা তাঁর উত্তর দিতে একটু থতমত খেয়ে গেল। নরসিং আয়েঙ্গার গর্বে ফুলে উঠলেন, সেদিনকার মত আমার পর্যটন শেষ হল।

মহীশূরে গিয়ে ঠেকে অনুভব করেছিলুম বাঙলার স্কুল কলেজে বাঙালী ছাত্র-ছাত্রীদের যে সংস্কৃতে কথাবার্তা কওয়ানর অভ্যেসটা একেবারে বাদ দেওয়া হয় সেটা একটা মস্ত ত্রুটি। বিদ্যাসাগর মশায়ের উপক্রমণিকা থেকে সেকালে সংস্কৃতের শিক্ষারম্ভ হত আমাদের। তাতে ফলং ফলে ফলানি, জলং জলে জলানি—এইসব আওড়িয়ে আওড়িয়ে মুখস্থ করাই ছিল কাজ। বিশেষ্য বিশেষণ ও ক্রিয়াপদ জুড়ে এক একটা সেণ্টেন্স রচনা করার পন্থাই ছিল না তাতে। মহীশূর স্কুলে মহারাষ্ট্রীয় স্কলার ভাণ্ডারকারের যে বই সংস্কৃতের প্রথম পাঠ্য তাতে দেখলুম আরম্ভ থেকেই ছাত্র-ছাত্রীরা সংস্কৃতে অল্প অল্প কথোপকথনে অভ্যস্ত হয়। ঠিক য়ুরোপের অলেন্যর্ফের বইয়ের মত এটি। সে বইখানি য়ুরোপের সর্বভাষায়—ফ্রেঞ্চ জার্মান ইতালীয়ান প্রভৃতিতে ইংরেজদের কথোপকথন চালাতে শেখানর জন্যে প্রসিদ্ধ। প্রথমেই কানে শোনার মত 'direct method'এ কতকগুলি সেণ্টেন্সের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়—তারপরে ব্যাকরণের জটিলতায় প্রবেশ করান হয়। বাঙলা স্কুল-কলেজেও এই দরকার।

দ্বিতীয় ত্রুটি—কলকাতা য়ুনিভার্সিটির অধীনে সংস্কৃত প্রথম পাঠ্য পুস্তক থেকে আরম্ভ করে শেষ পাঠ্য পুস্তক পর্যন্ত সবই দেবনাগরী লিপিতে নয়—বাঙলা লিপিতেই লিপিবদ্ধ। ছাত্র-ছাত্রীরা এমন কি টোলের পণ্ডিতেরাও দেবনাগরী অক্ষরের সঙ্গে পরিচিত নন। য়ুনিভার্সিটির পরীক্ষায় বাঙলা অক্ষরে লিপিবদ্ধ প্রশ্নের উত্তরও তাতেই

দেওয়া হয়। কোন সংস্কৃত পুস্তক আসল সংস্কৃত অক্ষরে পড়তে গেলেই তাঁদের আটকে যায়। দেবনাগরী অক্ষর পড়তেই পারেন না, ত লিখতে পারা ত আরো দুঃসাধ্য। আমি পড়তে পারতুম—কিন্তু লেখা আমারও অভ্যেস হল অনেক বিলম্বে মহাত্মা গান্ধীর তত্ত্বাবধানে। তিনি এ বিষয়ে রীতিমত taskmaster হলেন আমার—চরখা কাটার সঙ্গে সঙ্গে এ বিষয়ে প্রতিদিন খানিকটা সময় যাপন করতে হত।

তৃতীয় ত্রুটি—বিকৃত উচ্চারণের। বাঙলার টোলের পণ্ডিতদের কেউ কেউ সংস্কৃতে অনর্গল ব্যাকরণশুদ্ধ কথা কইতে পারেন দেখেছি। কিন্তু কি কর্ণ-পীড়ক অবিশুদ্ধ উচ্চারণ! অ-আর ভেদ নেই, লম্বা টান ছোট টানের ভেদ নেই, হ্রস্বদীর্ঘর ভেদ নেই, ই-ঈর ভেদ নেই, বর্গীয় 'ব' ও অন্তঃস্থ 'ব'য়ের ভেদ নেই, শ ও স-এর ভেদ নেই, ন ও ণ-য়ের ভেদ নেই। 'ভেদরিপুনাশিনী মম বাণী' বলা যেতে পারে বাঙালীর কণ্ঠনিঃসৃত সংস্কৃতকে। কিন্তু এটা স্থল নয় অভেদবুদ্ধি চর্চার। তাতে শুধু সারা ভারতবর্ষের কাছে হাস্যাস্পদ হতে হয়। মনে পড়ে আমি ছাড়া একমাত্র হেম—শিবনাথ শাস্ত্রীর কন্যা—ব্রাহ্মসমাজ সম্পর্কে পঞ্জাবে ও পশ্চিমে যাওয়া উপলক্ষে ওদেশী মেয়েদের সংস্রবে আসায়—ক্লাসে বিশুদ্ধ উচ্চারণে সংস্কৃত পড়ার বিষয়ে অবহিত ছিল। বেথুন স্কুলে, ব্রাহ্ম গার্লস স্কুলে ও সঙ্গীত সম্মিলনী প্রভৃতি নানা প্রতিষ্ঠানে কর্তৃপক্ষরা যখনই মেয়েদের বেদগানে প্রস্তুত করার ভার আমার উপর দিয়েছেন—তখনই এই চিরাভ্যস্ত বিকৃত উচ্চারণের সংকীর্ণ বাঙালীপথ থেকে বিশুদ্ধ উচ্চারণের ভারতীয় রাজপথে আনতে অনেকটা কষ্ট পেতে হয়েছে। ভারত স্ত্রী-শিক্ষা-সদনে আমি এ বিষয়ে সংস্কৃত অধ্যাপককে পুনঃ পুনঃ সতর্ক করে দিয়েছি।

স্টেট থেকে আমি যে বাড়ি পেয়েছিলুম থাকার জন্যে, ভারী সুন্দর, ছোটখাট, দোতালা। নীচে ড্রইং রুম ও খাবার ঘর, উপরে দুটি শোবার ঘর—যার একটি ড্রেসিংরুমে পরিণত হয়েছে, স্নানের ঘর ও বারান্দা। সব ঘরগুলিতেই সুন্দর ওয়াল-পেপার লাগান। কাছেই ব্রাহ্মণদের 'অগ্রহার'—অর্থাৎ রাজ সরকারের দান, নিষ্কর ব্রাহ্মণ-পল্লী। মহীশূরের ক্ষত্রিয় রাজবংশের অধিকাংশ প্রজাই হয় শিবোপাসক ব্রাহ্মণ বা লিঙ্গায়ৎ এবং জৈনী। দুই শ্রেণীর মেয়েদের শাড়ি পরার ধরনে ও কপালে তিলক-চর্চায় পার্থক্য আছে—দেখলেই চেনা যায় কে কোন্ ঘরের মেয়ে। ইস্কুল দুবার করে বসে—একবার সকালে, একবার বিকেলে। অধিকাংশই

বিবাহিত মেয়ে, কেউ বা অনেক ছেলের মা। সকালে মেয়েরা প্রায়ই বাসী সুতির ছাপান কাপড়ে আসে। দুপুরে বাড়ি ফিরে স্নানাদি করে শুচি হয়ে মৈসোরি সুন্দর সুন্দর পাকা রঙের রেশমী কাপড় পরে আসে। যাই পরুক একটা পারিপাট্য, একটা সহজ সৌষ্ঠবে ভরা। কোমরে সকলেরই প্রায় শাড়ির উপর একটা রুপার ঘুঙুরদার বেল্ট। কারো কারো সেটা খাঁটি সোনার। গায়ে খুব বেশী গয়না নয়—নাকে কানে হীরা বা মুক্তার ফুল ও নাকছাবি, হাতে দু-একগাছি চুড়ি। সোনা মোতি হীরের চুড়ি হোক আর না হোক সধবাদের হাতে কাঁচের চুড়ি থাকতেই হবে—আমাদের নোয়ার মত—সেইটিই তাদের সধবাত্বের লক্ষণ। বিধবারা কাঁচের চুড়ি পরে না, সোনার পরতে পারে। শ্রেণীবিশেষে কিছু কিছু পার্থক্যও দেখা যায়। পূজাপার্বণের দিন মন্দিরে গিয়ে পূজা দেওয়া ও দেবতা দর্শন মেয়েদের নিয়মিত কাজ। রাস্তায় মেয়েদের হাঁটা, চলাফেরা অন্যান্য দৈনিক দৃশ্যের একটি অন্যতম। কোন পথেচলা মেয়ের প্রতি কোন পথেচলা পুরুষের বাঁকা দৃষ্টি নেই। যা নিত্য-নৈমিত্তিক সাধারণ ঘটনা, সেটা অসাধারণ শূন্যতায় কোন পুরুষ বা বালকের ঠাট্টা-বিদ্রূপ বা টিটকারির কারণ হয় না। এদের বার মাসে হিন্দুর তের পার্বণ ত বাঁধা আছেই—উপরন্তু সম্প্রদায়-বিশেষের অতিরিক্ত বিশেষ পর্বদিনও আছে। এই পর্বগুলি ভারতবর্ষকে কেমন একসূত্রে গেঁথে রেখেছে সেইটে লক্ষ্য করলুম।

বাঙলার গৃহে গৃহে যেদিন বোনেরা ভাইদের কল্যাণ কামনায় ভাই দ্বিতীয়া করে--এখানেও সেদিন সেই উৎসবের আনন্দ। ঘরে ঘরে বিশেষ পক্কান্ন প্রস্তুত হচ্ছে, ঘরে ঘরে ভাইরা বোনদের আশীর্বাদী বা প্রণামী দিচ্ছে, ঘরে ঘরে এক মা-বাপের সন্তানদের—পুত্র ও কন্যার জন্মগত ঐক্য-বন্ধনে আর একটি করে গাঁট বাঁধা হচ্ছে। নব্যসভ্যতার যুগে খ্রীস্টান জগতের অনুকরণে ভারতবর্ষের এই সকল পারিবারিক প্রীতিবর্ধক উৎসবগুলি অনেক পরিবার থেকে উঠে যাচ্ছে। আমাদের কালেও দেখছি কোন কোন স্থলে এটা একটা লেনদেনের মধ্যে গণ্য হয়ে হিসেব খতিয়ে দেনাপাওনা মেটান হয়, বোনের বাড়ি গিয়ে তার স্নেহমাখা অন্ন ও বস্ত্র গ্রহণ না করেই তাকে হিসেব কাটাকাটি করে টাকা ধরে দেওয়া হয়। হায় এ কালের অভাগ্য ভাই ও অভাগিনী বোন। যে নিঃস্বার্থ নিগূঢ় নির্মল ভালবাসার দুটি স্রোত হৃদয়ে সারা বছর সঞ্চিত মালিন্যের মাটি খুঁড়ে দুদিক দিয়ে বের হয়ে বিশুদ্ধ মিলন চাইছিল—বছরের একটি

দিনও আর সে অবসর পেলে না।

বাঙলা দেশেই বোনেরা সেদিন ভাইকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ান, কিছু না কিছু উপহার দেন। কিন্তু বাকি সারা ভারতবর্ষে—দক্ষিণে উত্তরে পশ্চিমে—সেদিন ভাইরাই বিশেষ করে বোনকে কিছু না কিছু দ্রব্য বা অর্থ দেন। বোন শুধু সিঁদুর চন্দনের টিপ এবং মিষ্টান্ন ভাইয়ের জন্যে প্রস্তুত রাখেন, আর একগাছি মঙ্গলসূত্র ভাইয়ের হাতে বেঁধে দেন। যদি ভাই বিদেশে থাকেন, তবে ডাকযোগে যথাদিনে তাঁর হাতে পৌঁছিয়ে দেন—খ্রীশ্চানদের নিউ-ইয়ার্স বা ক্রীসমাস কার্ডের মত। বাঙলার দায়ভাগ ও অন্যান্য প্রদেশের মিতাক্ষরাজনিত উত্তরাধিকারগত পার্থক্যের সঙ্গে ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়াতে ভাইবোনদের পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিকোণের পার্থক্যের সূক্ষ্ম যোগ আছে কি? মোটের উপর দেখেছি, বঙ্গেতর বাকি ভারতবর্ষে কন্যা ও ভগ্নীর প্রতি পিতামাতা ও ভাইয়ের স্নেহশীলতা ও দেওয়ার প্রবণতা অত্যন্ত বেশি। যেন যত দাও কিছুতেই পর্যাপ্ত দেওয়ার তৃপ্তিবোধ হয় না। সে-সব দেশে আমাদের দেশের মত বরপণ-প্রথা ছিল না, শ্বশুরকুল থেকে কোন রকম দাবী আসত না, কারণ দেশাচার ও কুলাচার দাবীর অপেক্ষা না রেখে স্বতই মেয়েদের যথাসাধ্য দিত। শুধু বিয়ের সময় নয়, মেয়ে যতবার পিতৃগৃহে আনাগোনা করত ততবারই। মেয়েকে দেওয়ার রীতির এত বাড়াবাড়ি ছিল যে, রাজপুতবংশে সেই জন্যে মেয়েকে একবার জামাতার হস্তে সমর্পণ করে আর কোন দিন বাড়ি আনতে সাহস করত না, পাছে তাতে বাপের আত্মসম্মান রক্ষার্থে প্রায় সর্বস্বান্ত হতে হয়। অবস্থা বুঝে পিতৃভক্ত মেয়েও সেইজন্যে আসতে চাইত না—জানত তাতে মা-বাপকে কত বিপন্ন করা হবে। আর 'কুমারী' অবস্থায় কন্যার আদরের কথা বলেই শেষ হয় না। দুর্গাপূজায় যে 'কুমারীপূজা' বিহিত আছে—সেই দেবীপ্রতিমা চক্ষেই হিন্দু-ভারতে কন্যাকে দেখা হয়। এমন কি, কন্যা পিতামাতা বা বড়ভাইদের পাদস্পর্শ করে কখনো প্রণাম করে না—তাতে তাঁদেরই অকল্যাণ-ভয়—পুত্রবধূরা বা ছোটভাজেরা করে। ছোট ছোট খুঁটিনাটির পার্থক্যগুলির ভিতর দিয়ে যে একটি সাধারণ ঐক্যসূত্র দেখা যায়, সেই ঐক্যে হিন্দু-ভারত পাল-পার্বণে বাঁধা।

মহীশূরে দেওয়ালীতে আর একটি মিলনসূত্র পেলুম, যদিও তারও ভিতর পার্থক্য আছে। বঙ্গেতর ভারতের সর্বত্র দেওয়ালী শুধু রাত্রে আলো জ্বালান ও বাজি-পোড়ানর দিন নয়—এটি নতুন খাতার দিন।

আর আমাদের বিজয়াদশমী দিনের মত এটি আত্মীয়-বন্ধুদের পরস্পরের মনোমালিন্য মুছে ফেলে সৌহার্দ্যে পুনর্মিলনের দিন। আরও একটি অনুষ্ঠানে সেদিনটি সকলের বুক ভরে দেয়—লক্ষ্মীর পূজায়। দেওয়ালীতে জুয়াখেলা স্বগৃহে লক্ষ্মীর আবাহনেরই প্রকারান্তর। প্রতি গৃহটি সেদিন খোলার ঘর হোক বা অট্টালিকা হোক নিকিয়ে সারাদিন ধরে সারা বছরের সঞ্চিত আবর্জনা সাফ করে, আলপনায় গৃহখানি সুচিত্রিত করে. রাত্রে লক্ষ্মীর শুভাগমনের জন্যে প্রস্তুত রাখা হয়। একে বলে "দেওয়ালী কি সফাই।" ইংরাজদের 'Spring cleaning'-এর আর এক রূপ। একজনের কাছে গল্প শুনলুম, সে বছর এক বর্ধিষ্ণু গ্রামে এই রকম ঘরে ঘরে দেওয়ালিকি সফাই হয়েছে। এক গরীব ব্রাহ্মণ ও তার ব্রাহ্মণী দুজনে অতি ভক্তিভরে গোবর দিয়ে তাদের ঘরখানি নিকিয়ে উঠানের জঞ্জাল পরিষ্কার করে লক্ষ্মীর প্রতীক্ষায় জেগে বসে আছে। সে গ্রামখানির ছোট-বড় প্রতি ঘরে ঘরে এইরূপ জাগরণ চলেছে। এদিকে লক্ষ্মীঠাকরুণ তাঁর ঝাঁপি হাতে করে চুপি চুপি এসে প্রতি ঘরের জানলা দিয়ে ভিতরে উঁকি ঝুঁকি মেরে দেখছেন। কোনটিই তাঁর পছন্দ হচ্ছে না। অবশেষে সেই গ্রামের ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের খানার ঘরের টেবিলের প্রতি তাঁর দৃষ্টি পড়ল। কি শুভ্র শ্বেত চাদরখানি বিছান মেজে, কি ঝকঝকে কাঁচের গেলাসে ও রূপার কাঁটা চামচেতে সাজান ভোজন স্থান, কি সুন্দর আলোতে ও ফুলেতে সুশোভিত। দেখে দেখে মুগ্ধ হয়ে লক্ষ্মী সে রাত্রি সাহেবের সেই ভোজন-মন্দিরে ঢুকে সেইখানেই বসে পড়লেন। গরীব ব্রাহ্মণদের গোবর নিকিয়ে লক্ষ্মীর আশাপথ চেয়ে চেয়েই বাত্রি কাটল।

পঞ্জাবে দেখেছি দেওয়ালীতে লক্ষ্মীপূজার সময় কোন কোন গৃহে পুরোহিতের সাহায্য ব্যতিরেকে গৃহস্বামী ও গৃহিণী নিজেরাই পূজা নির্বাহ করেন। যেখানে স্ত্রী নিজেই পুরোহিত, সেখানে পূজার পদ্ধতিটিও মেয়েলী, সহজ, সাদাসিদে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা বড় বড় সংস্কৃত মন্ত্রে যা বলেন মাতৃভাষায় তারই সরল ভাষান্তর। একবার একটি পরিবারে বসে দম্পতির দুজনে মিলে পূজা করা দেখেছিলুম। তাঁদের দুজনের আসনের সামনে লক্ষ্মীর একটি প্রতিমা অর্থাৎ মাটির একটি ছোট পুতুল, তাঁর আশেপাশে অন্যান্য নানা পুতুল নানা দেব-দেবীর মূর্তি—যা দেওয়ালীর বাজারে পাওয়া যায়, বাড়ি বাড়িতে সবাই কিনে রাখে। মাটির এক পঞ্চপ্রদীপ—তাতে তেল সলতে দিয়ে আলো

ধরান। একখানা রূপোর থালায় অনেকগুলি চকচকে রূপোর টাকা, আর একখানিতে ফুল, জল, ধান্য, খই, মিষ্টান্ন প্রভৃতি। গৃহিণী একটি ফুল তুলে লক্ষ্মীমূর্তির দিকে চেয়ে বল্লেন—লক্ষ্মী আয়ি! স্নানং! নমা।

লক্ষ্মীর একেবারে সাক্ষাৎকরণ হচ্ছে—আসার প্রতীক্ষা মাত্র নয়, একেবারে এসেছেন, ঐ যে দেখা যাচ্ছে! অভ্যাগতের সংকার হোক! স্নান করাও!

—স্নানং! নমা—নমস্কার!

ইতিমধ্যে ছাদের উপর চাকরের সাহায্যে দীপাবলী সাজিয়ে ঘরে এসে, মা-বাপকে ঘিরেবসা ছেলেমেয়েরা মায়ের ও বাপের সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মীর গায়ে জলসিঞ্চন করে নমস্কার করলে।

তারপর গৃহিণী বল্লেন—লক্ষ্মী আয়ি! পুষ্পং! নমা!

দেবী গৃহাগতা! তিনি সাক্ষাতে বিরাজমানা! ছবিতে যেমন স্বামী বা পুত্র সাক্ষাতে বিরাজমান হন তেমনি এই পুতুলে লক্ষ্মী!

সকলে তাঁকে পুষ্প প্রক্ষেপ করে নমস্কার করলেন।

এবার—লক্ষ্মী আয়ি! ধূপং দীপং নমা!

ধূপকাটি জ্বালিয়ে ঘোরান হল, দীপ দেখান হল।

লক্ষ্মী আয়ি! নৈবেদ্যং! নমা।

নৈবেদ্যের থালি তুলে লক্ষ্মীকে আহার্য নিবেদন করা হল, নমস্কার করা হল।

তারপর গৃহপতি—

"ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনং
উর্বারকমিব বন্ধনান্‌ মৃত্যোর্মোক্ষয়েদামৃতাৎ। ওঁ"

মানে না জেনেই প্রাণপ্রতিষ্ঠার এই সংস্কৃত মন্ত্রটি বল্লেন। তাদের মন্ত্র-চৈতন্য বা শব্দার্থ-বোধ অর্থাৎ সম্মুখস্থ লক্ষ্মী-মূর্তিকে অন্তরে অনুভব হয়ে গেছে এবং ভাবের গাঢ়তায় তাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠাও করে ফেলেছেন তা জানেন না। শেষকালে সপরিবারে "জয় জগদীশ হরে" এই আরতির গানটি গেয়ে পুজো সমাপন হল। গৃহিণী নিজের মনে খানিকক্ষণ লক্ষ্মীকে ধ্যান করলেন। আসন ছেড়ে উঠবার আগে আমাকে ধরলেন—"একটি কিছু মন্ত্র আপনিও বলুন। আমার একটি জানা ছিল, আমি সেইটি বল্লুম ও মানে বুঝিয়ে দিলুম—

ওঁ ত্রৈলোক্যমাতরং হ্রীং শ্রীং স্বাহা!

"যিনি ত্রিলোকের মা, ত্রিলোককে অন্ন দেন, বল দেন, পুষ্টি দেন—

তাঁকে হ্রীংয়ে—অন্তরে হৃদয়ে অনুভবে এনেছি। তিনি বাইরে শ্রী হয়ে materialised হয়ে ধনে ধান্যে, সোনায় রূপায় অন্নসম্ভারে রূপ ধরে প্রকাশ হোন।”

তারা ভারি খুসী হয়ে এই মন্ত্রটি লিখে নিলে, পর বৎসর থেকে তাদের পূজাবিধির অঙ্গীভূত হল।

গৃহিণীটি প্রাক্তন আর্যসমাজভুক্ত স্বামীকে সনাতনী করে ফেলেছেন। বল্লেন—“প্রত্যেক গৃহস্থের দরকার লক্ষ্মীপূজা ও শক্তি-পূজা। এ দুই ছাড়া সংসারে কার চলে?” ধর্মসংস্কারকদের তর্ক-বিতর্কের ভিতর তিনি নেই—তাঁর আছে সংসারী গৃহিণীর প্র্যাকটিক্যাল কমন সেন্স। গৃহপতি বললেন—“আর্যসমাজ ব্রাহ্মসমাজাদির ক্রিয়াক্রমে আর তাঁর আস্থা নেই। তাদের tenets হচ্ছে—negation of every-thing, positive কোন কিছুর আশ্রয় দেয় না গৃহস্থকে।”

মহীশূরে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য অত্যধিক। সেখানে পুরোহিতের মধ্যস্থতায় ছাড়া কোন পূজা হতে পারে—মেয়েরা নিজেই করতে পারেন, তার পরিচয় পাইনি। তাঁরা মন্দিরে যে পূজাদ্রব্য নিয়ে যেতেন তা পুরো-হিতের দ্বারা নিবেদিত হত।

প্রত্যেক উৎসবের দিন স্কুলের কোন-না-কোন বড় মেয়ে বা শিক্ষয়িত্রী আমার সঙ্গে দেখা করতে আসত, হাতে উৎসব-ভোজের কিছু না কিছু নিদর্শন নিয়ে আসত। মাঝে মাঝে তিন-চারজন একত্রে এসে, বীণা সঙ্গে করে এনে আমায় গান ও বাজনা শুনাত। তাদের বীণার ঝঙ্কারের সঙ্গে গাওয়া একটি গান আমার মনে পড়ে—সেটি তেলেগু নয়, হিন্দী—

> “সত্যলোকসে নারদ আওয়ে!
> নারদ বীণ বাজাওয়ে!
> আরে আরে নারদ বীণ বাজাওয়ে!
> আরে আরে নারদ বীণ বাজাওয়ে।”

শুধু এই কটি কথা—কিন্তু ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে গেয়ে গেয়ে অফুরন্ত! সত্যলোক থেকে নারদ যে বীণা হাতে করে নামছেন—তাঁর বীণার ঝঙ্কার শুনা যাচ্ছে—একেবারে realistic!

দুই একটি মেয়ে বেহালা বাজাতে পারত। আমিও লরেটোতে প্রফেসর মাঙ্গাতা বলে একজন ইতালীয়ান মাস্টারের কাছে বেহালা শিখতে আরম্ভ করেছিলুম—বি-এ পাসের পরে। ইন্দিরাও তাঁর কাছে

শিখতেন, যদিও তিনি অনেক আগে থেকেই সোলাপুরে একজন সাহেবের কাছেই আরম্ভ করেছিলেন। সে য়ুরোপীয় বেহালা বাজানর ধরনে ও মহীশূরী বেহালা বাজানর ধরনে অনেক তফাৎ। য়ুরোপীয় বেহালায় হাত পাকতে সারাটা জীবন যায়। বেহালা যার অঙ্গের অঙ্গী না হয়, চারটে তারের উপর ছড়ি বুলিয়ে বেহালার কাঠখানার থেকে সঙ্গীতের দেবদেবীদের বাইরে বের করে আনা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। কাটাছাঁটা ঠিক ঠিক স্বর বের করা যেতে পারে; কিন্তু প্রাণ থাকে তার বহু দূরে। কিন্তু মহীশূরী বেহালায় চারটি তারের স্বরগ্রাম সাজানর প্রভেদেই দেখলুম বাজনায় প্রাণ ফোটানতে সহজসাধ্যতা এসে পড়ে। আর মীড়ে মীড়ে হাত উঁচু-নীচু সরানতেই আমাদের রাগরাগিণীর রূপ একেবারে ফুটে ওঠে—বিলিতি ধরনে বাজানতে তাদের অঙ্গলাবণ্য যেন বিদেশী পোশাকে ঢাকা পড়ে থাকে। এদেশে এ যন্ত্রকে বেহালা বা violin বলে না, fiddle বলে। বোধহয় পর্তুগীজদের কাছে দাক্ষিণীরা এ যন্ত্রটি প্রথম বাজাতে শিখে নিজেদের প্রয়োজনমত তারবাঁধার রকমটি বদলে নিয়েছে ও বীণার তারের মত এতে মীড় ফুটিয়েছে। এখানে মেয়েদের হাতে যখন বেহালা শুনতে থাকলুম একটা ব্যথা বাজতে লাগল কোথায়। এদেশের রুদ্রবীণায় পেলুম গাম্ভীর্য, বেহালায় পেলুম সকরুণতা।

মেয়েরা আমার সঙ্গে কোন্ ভাষায় কথা কইত? ইংরেজীতে—আমি তেলেগু জানিনে, তারা হিন্দি জানে না। তাদের অবাধ ইংরেজী কথোপ-কথনও একটা বিস্ময় আনলে। শুনেছিলুম মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে সকলেই প্রায় ইংরেজী বলে—সে ছোটলোকী ইংরেজী—নাম তার 'পিজিন ইংলিশ'। এদের শিক্ষিত ইংরেজী। কিন্তু এরই ভিতর মাঝে মাঝে হাস্যরসের সৃষ্টি হত। একদিন আমায় একটি স্কুলের মেয়ে জিজ্ঞেস করলে—আমায় যে uncle পৌঁছতে এসেছিলেন, তিনি matricide না patricide?

॥ ষোল ॥

বাড়ি-ফেরা

কলকাতায় সংস্কৃতে এম-এ পড়তে পড়তে যে চলে এসেছিলুম, এখানে সে ক্ষতি পূরণ হতে থাকল। এখানকার সংস্কৃত কলেজের আধুনিক প্রিন্সিপ্যাল নিজে ডবল এম-এ—স্বয়ং আমায় অধ্যাপনার ভার নিলেন। এঁরই সাহায্যে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে সংস্কৃত পুস্তকে প্রবেশলাভ হতে লাগল। মহীশূরের ওরিয়েণ্টাল লাইব্রেরীর কিউরেটার মহাদেব শাস্ত্রী এম-এ-ও আমার সাহায্যার্থে অগ্রসর হলেন। এই ওরিয়েণ্টাল লাইব্রেরী একটি প্রকাণ্ড ব্যাপার, মহীশূর রাজ্যের একটি ভারতবিখ্যাত প্রতিষ্ঠান। গবেষণাপূর্বক নানারকম প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের এখানে পুনরুদ্ধার ও পুনর্মুদ্রণ হয়। অনেক গ্রন্থে মহাদেব শাস্ত্রীর অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায় তাদের ইংরেজী ভূমিকায়। এই সকল পুস্তকের সেট উপহার দেওয়া হয় তাঁদের যাঁদের মহাদেব শাস্ত্রী জ্ঞানী বা জ্ঞান-পিপাসু এবং উপহারের যোগ্য পাত্র বিবেচনা করেন। আমার জ্ঞান-পিপাসায় তিনি নিঃসন্দেহ হওয়ায় একদিন তাঁর কাছে থেকে প্রায় এক ট্রাঙ্ক-ভরা পুস্তকাবলী এসে উপস্থিত হল। তাঁর নিজের শুভাগমনও প্রায়ই হত। আর একজন মধ্যে মধ্যে আসতেন—মাইসোর সিভিল সার্ভিসের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী—রামচন্দ্র রাও। খুব তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সব সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে তীর দৃষ্টিবান, নিঃশঙ্ক সমালোচক ও হাসিখুশি-ভরা। সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল একজন আয়েঙ্গার, ওরিয়েণ্টাল লাইব্রেরীর কিউরেটার একজন আয়ার ও রামচন্দ্র রাও শিবাজীর ভাইয়ের সঙ্গে সমাগত দাক্ষিণাত্য প্রদেশে ঔপনিবেশিক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণদের উত্তরপুরুষ—এখন দাক্ষিণী বলেই গণ্য। মহীশূরের হোম-পলিটিক্সের আভাস এঁর কাছে পাওয়া যেত। এই তিনটিকেই আমার বিশেষ করে মনে পড়ে যাঁদের নিয়ে একটি বন্ধুমণ্ডলী গড়ে উঠল। পূর্ব-পরিচিত ডাক্তার রামস্বামী আয়েঙ্গার—নরসিং আয়েঙ্গারের ভাগিনেয়ও অবশ্যই ছিলেন, কিন্তু তিনি intellectual আলোচনার বিশেষ ধার ধারতেন না—সেবাই ছিল তাঁর প্রধান ধর্ম। ফুলটি এটি ওটি সেটি নিয়ে আসতেন, যা আমার নয়নরুচিকর-বা কাজে লাগার বস্তু হতে পারে। কলকাতায় মিসেস পি কে রায়দের গৃহে বাসজনিত এই শিক্ষা ও অভ্যেস তাঁর জন্মেছিল।

মহীশূরে আমার আসল বন্ধুত্ব হল এখানকার ডিরেক্টর অব পাব্লিক ইন্সট্রাকশন মিস্টার ভাভার পত্নী ও মেয়ের সঙ্গে। ভাভারা পার্শি। তাঁদের মেয়েটি—মেহেরবাঈ পরমা সুন্দরী ও সুশিক্ষিতা। বম্বে-পুণা-সাতারায়ও পার্শিদের সঙ্গে আমাদের পরিবারের মেয়েদের সহজেই খাপ খেয়ে যেত—মেজমামী ও মার অনেক পার্শি বান্ধবী হয়েছিলেন। আমারও এঁদের সঙ্গে মিল হয়ে গেল খুব। মেহেরবাঈকে দেখে আমি মধ্যে মধ্যে আশ্চর্য হতুম—বম্বের মত বৃহৎ শহরের বাইরে, পার্শি-অপ্রতুল মহীশূরের নিভৃত বনে তাঁদের অজ্ঞাতে এমন ফুলটি ফুটে আছে—কোন পার্শি দুষ্মন্ত এসে এই শকুন্তলাটিকে দেখবে কি একদিন? তাই হল। রূপকথার Prince Charming এল একদিন।

স্যার জামশেদজী টাটার জ্যেষ্ঠপুত্র দোরাব টাটা পার্শি সমাজে একটি মস্ত বড় রুইকাৎলা জাতীয় পাত্র। স্ব স্ব মেয়ের হিতকল্পে বম্বের বড় বড় পার্শি ক্রোড়পতির পত্নীরা তাঁকে ধরার জন্যে অনেকদিন ধরে জাল পেতে আছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত তিনি ধরা দেননি। বয়স হয়ে যাচ্ছে, হবু শাশুড়ীরা ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। এমন সময় নিয়তি নিজের হাত খেললে। টাটা স্কীমের কার্য উপলক্ষে বৃদ্ধ পিতা জামশেদজীকে দিয়ে দোরাবকে মহীশূরে পাঠালে। সেখানে মেহেরবাঈকে দেখে দোরাবজী প্রেমপাশে ধরা পড়ে গেলেন। এ মায়েদের হাতেফেলা ছিপ নয়—একেবারে বিধির নিয়ন্ত্রণে ছোঁড়া কন্দর্পের পঞ্চবাণ। মেয়ের বাপ-মার মনে একটা বাধা খট্‌কা দিলে—দুজনের বয়সের অনেক পার্থক্য। কিন্তু প্রেমপথে সে বাধা টিঁকল না। শীঘ্রই তাদের engagement হল। সে সম্বাদ বম্বেতে যখন প্রচার হল, মহীশূরের মত অজানা শহরে অজ্ঞাতকুলশীলের কন্যার প্রতি দোরাবজীর অনুরাগের কথা বম্বের মায়েরা যখন শুনলেন তাঁর মনোনয়নকে ধিক্কার দিতে লাগলেন। তাতে তাঁদের বিবাহ বন্ধ হল না। শুভদিনের শুভক্ষণে মহীশূরে মেহেরবাঈয়ের পাণিগ্রহণ করে তিনি পত্নীসহ যখন বম্বেতে এলেন এবং অচিরে "স্যার দোরাব" হলেন, তখন বম্বের পার্শিসমাজ লেডি দোরাব টাটাকে তাঁদের একজন মুখ্যা বলে গ্রহণ করতে বাধ্য হল।

যে সময় মেহেরার engagement হয়, আমি মহীশূরে ছিলুম না। তার চিঠিতে খবর পেলুম। দোরাবজীর মহীশূরে আসা ও তাঁদের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনায় ভরা সে বিশ পৃষ্ঠার চিঠিখানা একটি ষোড়শী বালিকার প্রথম প্রণয়োল্লাসিত হৃদয়ের মুক্ত

ছবি। বোধ হয় তাঁর আর কোন সমবয়সী বন্ধু ছিল না যাকে এমন করে হৃদয় ভরে লিখে আরাম পান। এমন নবপুলকের দিনে একজন কাউকে চাই—যাকে সব বলেই সুখ—আনন্দ ও ভয় দুই-ই।

এর অনেক বৎসর পরে একবার মাত্র এঁর সঙ্গে আমার বম্বেতে দেখা হয়। তখন তিনি পুরামাত্রায় বম্বে সমাজের অঙ্গীভূত লেডি টাটা—অনেকানেক কমিটির মধ্যে একটি স্বদেশী এক্‌জিবিশন কমিটির সদস্যা—মহীশূরের সেই বালিকা "মিস্‌ ভাভা" আর নয়। দোরাব টাটা ও লেডি টাটা দুজনেই এখন গতায়ু। তাঁরা শেষ পর্যন্ত নিঃসন্তানই ছিলেন। দোরাবের ছোট ভাই রতন টাটাও নিঃসন্তান অবস্থায় ১৯১৪-র জগৎ-যুদ্ধে জার্মান টর্পেডোর দ্বারা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু-কবলিত হন। বৃদ্ধ জামশেদজীর বংশে বাতি দিতে কেউ নেই। তাঁর কীর্তিই তাঁর বাতি।

মহীশূরে প্রবাসকালে আর একটি পরিবারের সঙ্গে আমার সৌহার্দ্য হল—তাঁরা মুসলমান ও বাঙ্গালোরে থাকেন। স্বামী ডেপুটি কলেক্টর মিস্টার সুজাতালি—ইউ পি-তে আদিবাস। স্ত্রী বাঙলার মেয়ে, তাঁর ভাইরা বাঙলায় উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। মিসেস্‌ সুজাতালি আমার কথা জানতে পেরে স্বয়ং একদিন বাঙ্গালোর থেকে মহীশূরে এসে আমার সঙ্গে দেখা করে একটা শনি-রবিবারে তাঁদের ওখানে আমার যাওয়া ও থাকার ব্যবস্থা করে গেলেন। একবার নয়—তাঁর পীড়াপীড়িতে এমন দু-চার বার শনি-রবিবারে তাঁদের ওখানে আমার যাওয়া-আসা ও থাকা হয়েছিল। শিক্ষিত মুসলমান পরিবারের সঙ্গে সহজেই আমার মিত্রতা জমে গেল। এস্থলে এ সৌহার্দ্যের মূলে ছিল মিসেস্‌ সুজাতালির বাঙলার প্রতি টান। অনেককাল পরে যখন আলিগড়ে আলিগড় ইউনিভার্সিটি দেখার জন্যে সেখানকার কর্তৃপক্ষরা আমাকে আমন্ত্রণ করেন—একটি প্রকাণ্ড শহরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে যেন তার প্রতি অংশ পর্যটন করানর মত করে আমাকে সব কিছু দেখিয়ে বেড়াচ্ছেন, সেই সময় লক্ষ্য করলুম একটি যুবক সব সময়ই আমাদের সঙ্গে রয়েছে। পরে সে নিজের পরিচয় দিলে—সে বাঙলা দেশ থেকে আসা একটি মুসলমান ছাত্র। বাঙলার একজন মহিলাকে তার ইউনিভার্সিটিতে দেখে তার যে আনন্দ হয়েছে—ঘণ্টা কতকের মত তাঁর সঙ্গলাভে সেই আনন্দ থেকে বঞ্চিত করতে পারছে না নিজেকে। তাই সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে। আর একবার বর্মায় রেঙ্গুনের নিকটবর্তী পেগু শহরে প্রসিদ্ধ শয়ান বুদ্ধের মূর্তি দেখে মধ্যাহ্ন অতীত হলে রেলওয়ে রেস্তরাঁতে গিয়ে বসলুম, আমার গুজরাটি সহচর কিছু

আহার্যের বন্দোবস্তর জন্যে রেস্তরাঁর রন্ধনশালায় গিয়ে নিরাশ হয়ে ফিরে এলেন। শুনলেন, সেদিন যা কিছু রান্না হয়েছিল, সব শেষ হয়ে গেছে—এত বেলায় আর কিছু পাবার যো নেই একটু শুকনো পাউরুটি ছাড়া। এই সময় দুজন 'boy' বা খানসামা এল—পরস্পরের সঙ্গে বাঙলায় কথা কইছে। আমি তাদের বাঙলায় জিজ্ঞেস করলুম—"তোমাদের বাড়ি কোথায়? বাঙলা দেশে?" তারা বিস্মিত হয়ে বললে—"হ্যাঁ, ঢাকায়। আপনিও কি বাঙালী? এত দেরি করে এসেছেন—সব ত ফুরিয়ে গেছে। আচ্ছা, তবু দেখি কি করতে পারি।" ঘণ্টাখানেক বসতে হল, কিন্তু তার মধ্যে দাল ভাত মাছ তরকারি সব সুচারুরূপে রান্না হয়ে টেবিলে হাজির। বাঙালী খানসামার বাঙালীত্ব সেদিন আমার আতিথ্যসৎকারে পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করলে। যখন দাম দিতে গেলুম, মনমরা হয়ে গ্রহণ করলে—রেলওয়ে কোম্পানী নয়ত তার উপর নারাজ হতে পারে, জরিমানা করতে পারে—আমি এই ভয়ের ছবি দেখানতে নিলে।

সুজাতালিদের অনেকটা ইংরেজী রকম রওয়া সওয়া হলেও মেয়েদের পোশাকে-পরিচ্ছদে আচার-ব্যবহারে একটা নিজস্বতা আমায় আকৃষ্ট করেছিল—যেমন অনেক বছর পরে বম্বের তায়েবজী পরিবারেও তাই দেখেশুনে আকৃষ্ট হই। মহীশূরের হিন্দুজগৎ আমার পক্ষে একটি অভিনব জগৎ, অতীতের জগৎ, কাব্য ও চিত্রের জগৎ—আমি তার মুগ্ধ দর্শক মাত্র, মানবিকতায় তার অঙ্গীভূত নই। এখানে এক পার্শি ও এক মুসলমান গৃহের গৃহীদের সঙ্গেই আমার আধুনিকতা ও মানবিকতার জীবন্ত সংযোগ হল। দেখলুম যে, ধর্মের প্রভেদে মানুষে মানুষে মিলের কিছু আসে যায় না—মনের মানুষ তারাই হয় যাদের মনের সঙ্গে মন মেলে, ধর্মের ধ্বজা সেখানে আপনাকে খাড়া করে মানুষকে ধমক দেয় না।

মহীশূর প্রবাসে দু-চার মাস পরে সেখানে দৃষ্ট অতীতের নূতনত্ব ও মোহ যত কমে আসতে লাগল, ততই একটু একটু মন কেমন করতে আরম্ভ করল নিজের বর্তমানের জন্যে, নিজের পারিবারিক আবেষ্টনের জন্যে, পারিপার্শ্বিকের জীবন্ততার জন্যে। এখানে ১লা বৈশাখের দিন কলকাতায় নববর্ষের উৎসবের কথা মনে পড়ে, ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়ায় নিজেদের বাড়িতে ভাইবোনের মিলনের কথা মনে পড়ে। 'নৌরাত্রে' বাঙলা দেশে দুর্গাপূজার ধুমধাম ও ভাসানের ঘটা মনে পড়ে। খুসী—মিসেস ডি এন রায়—কেন যে স্বামীর সঙ্গে প্রথম প্রথম বম্বে গিয়ে তাঁর প্র্যাক্‌টিস সেখানে খুব জমে উঠলেও, বাঁধা আয় ও আয়েস ছেড়ে কলকাতায়

স্বামীকে ফেরানর জন্যে ছট্‌ফট্‌ করে অবশেষে ডাক্তারী তল্পিতল্পা-সমেত তাঁকে ফিরিয়ে এনে কলকাতায় স্বগৃহে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, তা কতকটা বুঝতে পারলুম।

আর একটা প্রবল ধাক্কা এল। আমার বাড়ির সামনেই রাস্তার ওপারে একজন কণ্ট্রাক্টর একখানা বড় বাড়ি তুলছে—একটা ছোট বাড়ি হয়ে গেছে, তাতে কিছু কিছু লোকজন থাকে। কণ্ট্রাক্টরের একমাত্র ছেলে দুর্বৃত্ত, বাপের পয়সা দুহাতে ওড়ায়। বাপ-মা তাকে শাসনে আনতে পারে না—তারা থাকে শহরের ভিতর ছেলের বৌকে নিয়ে, ছেলে কখন কোথায় থাকে, কোথায় যায় আসে খোঁজ পায় না। একদিন গভীর রাত্রে আমি ঘুমিয়ে আছি—আমার পরিচারিকা—মাদ্রাজী আয়া আমার ঘরে না শুয়ে সিঁড়ির উপরেই ল্যান্ডিংয়ে শুয়েছে সেখানে বেশী হাওয়া যাবে বলে। হঠাৎ ভয়ানক চীৎকার স্বরে কাঁউ মাউ করে উঠল—তাকে মাড়িয়ে কে পাশের ঘরে ঢুকেছে—যেটা ড্রেসিংরুম। তার চেঁচামেচিতে আমি জেগে উঠে তাড়াতাড়ি তার কাছে এসে জিজ্ঞেস করলুম—কি হয়েছে? সে বললে পাশের ঘরে লোক ঢুকেছে। ফুটপাতের ওধারে পুলিসের একটা আউটপোস্ট ছিল—কণ্ট্রাক্টরের বাড়িরই পাশে। আমি বারান্দায় গিয়ে 'পাহারাওয়ালা' বলে ডাক দিতে দুজন বাড়ির নীচে এসে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলে কি হয়েছে? আয়া যা বলেছিল, আমি তাই বললুম। ঠিক সেই সময় ঘর থেকে নীচে লাফাতে গিয়ে পা-ভাঙ্গা লোকটাকে দেখতে পেয়ে তারা ধরে ফেললে। আমার বাড়িতে স্টেট থেকে দেওয়া দুজন সেপাই বা পিয়ন রাত্রে শুত। কলকাতা থেকে আমার সঙ্গে আসা বিপিন বলে একজন পুরানো বাঙালী চাকরও নীচে শুত। তারা এতক্ষণ নিদ্রামগ্ন ছিল, পুলিসের গোলমালে তিনজন সবে জেগেছে। একজন সেপাইকে নরসিং আয়েঙ্গারের বাড়ি ও একজনকে মিস্টার ভাভার বাড়ি খবর দিয়ে পাঠালুম। তাঁরা দুজনেই এলেন সেই রাত্রে, মিস্টার ভাভার সঙ্গে তাঁর কন্যা মেহেরবাঈও এল। এঁরা আমাকে তাঁদের বাড়ি নিয়ে গেলেন তখনি—বাকী রাতটা সেখানেই কাটল। কণ্ট্রাক্টরের ছেলেটার নামে পুলিস কেস হল, তার জেল হল ছমাসের। ব্যাপারটা ঐখানেই শেষ হল, কিন্তু মনে এর রেশের একটা বড় রকম ঢেউ অনেকদিন ধরে খেলতে লাগল। নিউজ-এজেন্সীর মারফৎ খবরটা কলকাতার সংবাদ-পত্র মহলেও পৌঁছেছিল। 'বঙ্গবাসী'তে একটা লম্বা মন্তব্য বেরল—মর্ম তার—"এ ঘরের মেয়ের একলা একলা বিদেশে চাকরি করতে যাওয়ার

দরকারটা কি? খাওয়াপরার অভাব তো নেই; কেন খামকা নিজেকে এমন বিপদগ্রস্ত করা? এ খালি বিলিতী সভ্যতার অনুকরণ।"

ভেবে দেখলুম কথাটা কতকটা সত্য। বিলিতী গল্প পড়ে পড়ে মনের ভিতর জমে ওঠা একটা সখের হাওয়ার ঘূর্ণিতে অনেকদূর এসে পড়া আমার। দাদাদের সঙ্গে শিক্ষাদীক্ষায় সমান সুযোগ লাভ করে নরনারীর স্বায়ত্ত জীবিকা অর্জনে সমান দাবী প্রতিপন্ন করাই আমার চাকরী করতে আসার মূল প্রেরণা ছিল না—চেতনার তলায় তলায় সেটা থাকলেও উপর উপর অতি প্রবলভাবে সখই তার প্রধান উপাদান ছিল। একটা cause ধরলে মানুষ তার উপর মজবুত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে—তাতেই তার মনুষ্যত্ব। কিন্তু সখের ভিত্তি, বালুর ভিত্তি—ধ্বসে ধ্বসে যায়, সরে সরে যায়, সখ কিছুদিন পরে মিটে যায়। আমারো ছমাসের পরে মিটে আসতে লাগল।

এর উপর আর একটা দৈব উৎপাত এল—ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হলুম। এখানকার সাহেব সিভিল সার্জেনের চিকিৎসা ও ঔষধপত্র চলতে থাকল। বাড়িতে এত বয়স পর্যন্ত এলোপ্যাথী ওষুধ কখনও খাইনি, তার কি রকম স্বাদ, তা জানতুমই না। বাবামহাশয় হোমিওপ্যাথির ঘোরতর বিশ্বাসী ও ভক্ত। আমাদের অল্পস্বল্প অসুখ হোক বা বেশী হোক, ডাক্তার মহেন্দ্র সরকার বা ডাক্তার সল্‌জার ছাড়া কাউকে ডাকা হয় না। বিশ বৎসর বয়সের পর জীবনে প্রথম এলোপ্যাথী ওষুধের সঙ্গে আমার শারীরিক পরিচয় হল। মা-দের কাছে টেলিগ্রাম গেল। মা তখনো সাতারায় ছিলেন। সেখান থেকে তিনি এলেন অসুখে আমার তত্ত্বাবধানের জন্যে। একটু ভাল হলে সিভিল সার্জেন মাকে বললেন, আমায় মহীশূরে রাখা এখন সমীচীন নয়, স্থানান্তরে নিয়ে যাওয়া উচিত—এখানে এই সময় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বেশী। তিন মাসের ছুটি নিয়ে মা-র সঙ্গে প্রথমে সাতারায় গেলুম আমি। তিন মাসের পর মহীশূরে এসে আর তিনমাস থেকে এক বছর পূর্ণ হলে কাজে ইস্তফা দিয়ে ঘরের মেয়ে ঘরে ফিরলুম। কলকাতায় যেখানে যাই, যার সঙ্গে দেখা হয়, সে-ই ঠাট্টা করে—"চাকরীর সখ মিটল? স্বাধীন হবার সখ মিটল?"

চাকরীর সখ মিটেছিল বটে, কিন্তু স্বাধীন হবার সখ মেটেনি। শুধু ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সখ ব্যাপক হয়ে জাতি ও দেশগত স্বাধীনতার সখের রূপ নিলে। সখ আর সখমাত্র রইল না, cause-এর আকার ধারণ করলে। আমার নিজের পায়ে ভর করে দেশান্তরে গমন ও অবস্থানে যে

মানসিক পুষ্টিবর্ধন হল, সে পুষ্টি যাঁর ইচ্ছায় সাধিত হয়েছিল. তাঁরই ইচ্ছায় যন্ত্রচালিতবৎ হয়ে আমার জীবনতরী চলল ও দেশকে চালনা দিলে এক নূতন অজানিত পথে, যার শেষ আজও দুর্লক্ষ্য।

॥ সতর ॥

রুদ্রবীণ

বড়মামার হাতে আরম্ভে রবিমামা ভারতীর যে বীণাকে আবাহন করলেন—

শুধাই ঐ গো ভারতী তোমায়
তোমার ও বীণা নীরব কেন?
ভারতের এই গগন ভরিয়া
ও বীণা আর মা বাজে না কেন?

তার প্রায় পঁচিশোর্ধ কয়েক বৎসর পরে দাক্ষিণাত্য থেকে ফেরা আমার অঙ্গুলির প্রথম সঞ্চালনে ভারতীর সেই বীণা রুদ্রবীণ হয়ে বেজে উঠল। শঙ্করের ভেরী নাদিত করে লেখনী আমার বাঙালীকে 'মৃত্যুচর্চায়' আহ্বান করলে। এবার আমার হাতের প্রথম প্রবন্ধই হল তাই। সেই আমার বীণের প্রথম ঝঙ্কার। যে বাঙালী পৈতৃক প্রাণটি বাঁচিয়ে রাখতেই সদা তৎপর, বীণা তাদের ডেকে বললে,—মৃত্যুকে যেচে বরণ করতে শেখ, অগত্যা তার কবলিত হয়ো না। তাকে স্পর্ধা কর, তার সম্মুখীন হও—খেলায় ধুলায়, আমোদে প্রমোদে, শিকারে বিহারে, বিজ্ঞানে সজ্ঞানে, প্লেগে জনসেবায়, আগুনে লোক-উদ্ধারে, জলেতে আত্মপ্রাণপণে পরপ্রাণ রক্ষায়। ভূগোল শেখ ভূমন্ডল প্রদক্ষিণে—মানচিত্রে অঙ্গুলি সঞ্চারণে নয়। পাড়ি দাও সমুদ্রে, চলে যাও সাহারার মরুতে, চড় তুঙ্গে এভারেস্টের শৃঙ্গে,—সেকালের ভারতীয় সন্ন্যাসী পর্যটকদের লোটা-কম্বল-মাত্র-সহায় হয়ে কিংবা একালের শ্বেতপুঙ্গবদের অনেক তোড়জোড়ের মধ্যে প্রধান যেটি সেইটি সম্বল করে—সুস্থ ও সবল শরীর। মানুষের সবচেয়ে বড় পুঁজি সেইটি—বলিষ্ঠ ও সুসুস্থ শরীর। সে জন্যে চাই বাঙালীর ভারতের অন্যান্য জাতির মত নিয়মিত ব্যায়াম-চর্চা। এই হল আমার রুদ্রবীণের দ্বিতীয় ঝঙ্কার।

দ্বিপুদাদার মেজভাই অরুদাদা উর্দুনবীশ ছিলেন। হিন্দুস্থানী বেশ বলতেন, আর উর্দু বইও পড়তেন উচ্চারণে ঠিক জোরদার দিয়ে। কুস্তি প্রভৃতি কসরতের দ্বারা প্রথম যৌবনে শরীরটাও বেশ কায়দায় রেখেছিলেন। তিনি দু-একবার বম্বে অঞ্চলে যান মেজমামার কাছে। গল্প করতেন বম্বে থেকে ফেরার পথে গাড়ি যখন পশ্চিম ও বেহারের স্টেশনে স্টেশনে থাকত, জোর গম্ভীর গলায় কুলিরা স্টেশনের নাম হাঁকত—জব্বল-পো-র, ইলাহা-বা-দ, বক্‌স-র পট-না-া-া!—

রাত্রে ঘুমন্ত অবস্থায় ভয় পেয়ে উঠতে হত, বুঝি ডাকাত পড়েছে। আর গাড়ি যেমন বাঙলায় পৌঁছল, মিহিগলায় টক্ করে একটুখানি আওয়াজ বেরল—'কনু জংশন!' 'বদ্ধোমান!' আর যারা ডাকছে তারা দেখতে এমন ক্ষীণজীবী—যেন একটা টোকা মারলেই এখনি পড়ে যাবে। অরুদাদার বর্ণনা যে খাঁটি সত্য, তা বিদেশ থেকে প্রত্যাগমনকালে আমাদের সকলেরই অনুভব হত। বাঙালী কুলিরাও মানুষ, আর পশ্চিমের কুলিরাও মানুষ—কিন্তু দেখতে কত তফাৎ! এবার এই ভোজপুরী মারাঠী পঞ্জাবী সকলের সঙ্গে বাঙালীর চেহারাগত দৌর্বল্যের পাহাড়কে সমভূমি করে দিতে হবে—এইতে পড়ল আমার প্রথম দৃষ্টি। সঙ্গে সঙ্গে চোখে লাগল শুধু শরীরগত দৌর্বল্য হটালে হবে না, বাঙালীর মন থেকে ভীরুতা অপসারিত করতে হবে। দেখা যায়, পশ্চিম ও পঞ্জাবের বড় বড় পালোয়ানেরাও সাহেব-ভীতিতে ভরা। এই সাদা চামড়ার ভয় সরাতে হবে।

তাই ডমরুতে একটা ঘা দিয়ে রুদ্রের বীণা বাজল তৃতীয় তারে ঝঙ্কার দিয়ে আমার হাতে—'বিলিতি ঘুষি বনাম দেশী কিল' এই রাগে। ভারতীর পৃষ্ঠায় আমন্ত্রণ করলুম—রেলেতে স্টীমারে, পথে-ঘাটে, যেখানে সেখানে গোরা-সৈনিক বা সিভিলিয়ানদের হাতে স্ত্রী, ভগ্নী, কন্যা বা নিজের অপমানে মুহ্যমান হয়ে আদালতে নালিশের আশ্রয় না নিয়ে—অপমানিত ক্ষুব্ধ মানী ব্যক্তি স্বহস্তে তখনি তখনি অপমানের প্রতিকার নিয়েছে—সেই সকল ইতিবৃত্তের ধারাবাহিক বর্ণনা পাঠাতে। তাঁরা পাঠালেন ও তাঁদের ইতিবৃত্ত ভারতীতে বেরতে থাকল। পাঠকমণ্ডলীর মনে লুকান আগুন ধুঁকিয়ে ধুঁকিয়ে জ্বলে উঠল প্রবল তেজে। কোথা দিয়ে কোন্ হাওয়া বইছে, হঠাৎ যেন কেউ ঠাহর করে উঠতে পারে না। যে সাহিত্যের আঙ্গিনা ছিল কোমল আস্তরণ পাতা কমলালয়া সরস্বতীর নিকুঞ্জ, তা হল শ্মশানবাসী রুদ্রের ভীম নর্তনভূমি, আর তার তালে

তালে সকলের পা আপনিই পড়ছে—ইচ্ছে করুক আর না করুক। দলে দলে স্কুল-কলেজের ছেলেরা আমার সঙ্গে দেখা করতে আরম্ভ করলে—বয়স্কেরাও পিছিয়ে রইলেন না—অনেকেই, যাঁরা পরে নামজাদা হয়েছিলেন। আমি তাঁদের থেকে বেছে বেছে একটি অন্তরঙ্গ দল গঠন করলুম। ভারতবর্ষের একখানি মানচিত্র তাদের সামনে রেখে সেটিকে প্রণাম করিয়ে শপথ করাতুম তনু মন ধন দিয়ে এই ভারতের সেবা করবে। শেষে তাদের হাতে একটি রাখি বেঁধে দিতুম, তাদের আত্মনিবেদনের সাক্ষী বা badge। হুমায়ুন যেমন এক রাজপুত কন্যার রাখি গ্রহণ করে তার হয়ে বিপদ বরণ স্বীকার করেছিলেন, ছেলেদের তেমনি আমার হাতে এ রাখি-গ্রহণ মাতৃভূমির সেবা গ্রহণের জন্যে বিপদ বরণের স্বীকৃতি। আমার রাখি-বাঁধা দলটি একটি গুপ্ত সমিতি নয়; তবু সঙ্কল্প মনে মনে রাখলেই উদ্যাপনের দৃঢ়তা হয় বলে মুখে মুখে রটান বারণ ছিল।

তত্রাচ নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়ের কাছে খবরটা পেঁছিল। তিনি রঙ্গরসে, আমোদে-কৌতুকে অনেককে টানতেন।

আশু চৌধুরীর আমার প্রতি ভারি স্নেহ ও শ্রদ্ধা। তিনি আমায় একদিন বললেন—"সরলা সাবধান হয়ো। নাটোরের বৈঠকে বলাবলি চলছে—সরলা দেবী দেশের ছেলেদের বীর করে তুলবেন বলে তাদের হাতে একটা করে লাল সুতো বেঁধে বেঁধে দিচ্ছেন। এতে পুলিসের কান খাড়া হচ্ছে।"

বছর কত পরে বঙ্গভঙ্গের দিনে এই লাল সুতোর রাখিবন্ধন দেশময় ছড়াল—রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে নাটোরও তাতে বাঁধা পড়লেন।

যেসব ছেলেরা তখন আমার কাছে আসত তার মধ্যে মণিলাল গাঙ্গুলী বলে একটি ছেলে ছিল। সে Dawn পত্রিকাব সম্পাদক সতীশ মুখুয্যের ভাগিনেয়। সতীশবাবুও মাঝে মাঝে এসেছেন। মণিলালের সাহিত্যের দিকে একটু ঝোঁক ছিল। তার পরিচালিত একটা সাহিত্য-সমিতি ছিল ভবানীপুরের ছেলেদের। সে একদিন আমায় অনুরোধ করলে তাদের সাম্বৎসরিক উৎসবের দিন আসছে আমি যেন তাতে সভানেত্রীত্ব করি। যদিও নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে দেশ-বিদেশ ঘুরে এসেছি—কিন্তু কলকাতা শহরে ছেলেদের সভায় উপস্থিত হওয়া ও সভানেত্রীত্ব করা তখন আমার কল্পনার বাইরে। আমি ইতস্ততঃ করতে লাগলুম। সে আবার পীড়াপীড়ি করাতে আমি একটু ভেবে তাকে বললুম—"আচ্ছা, তোমাদের সভায় সভানেত্রীত্ব করতে যাব—এটাকে যদি তোমাদের সাহিত্যালোচনার

সাম্বৎসরিক না করে সেদিন তোমাদের সভা থেকে 'প্রতাপাদিত্য উৎসব' কর, আর দিনটা আরও পিছিয়ে ১লা বৈশাখে ফেল, যেদিন প্রতাপাদিত্যের রাজ্যাভিষেক হয়েছিল। সভায় কোন বক্তৃতাদি রেখ না। সমস্ত কলকাতা ঘুরে খুঁজে বের কর কোথায় কোন্ বাঙালী ছেলে কুস্তি জানে, তলোয়ার খেলতে পারে, বক্সিং করে, লাঠি চালায়। তাদের খেলার প্রদর্শনী কর—আর আমি তাদের এক-একটি বিষয়ে এক-একটি মেডেল দেব। একটিমাত্র প্রবন্ধ পাঠ হবে—সে তোমাদের সাহিত্য-সভার সাম্বৎসরিক রিপোর্ট নয়—প্রতাপাদিত্যের জীবনী। বই আনাও—পড় তাঁর জীবনী, তার সার শোনাও সভায়।"

মণিলাল রাজি হল। তলোয়ার খেলা দেখানর জন্যে তাদের পাড়ার বাঙালী-হয়ে-যাওয়া রাজপুত ছেলে হরদয়ালকে যোগাড় করলে, কুস্তির জন্যে মসজিদবাড়ির গুহদের ছেলেরা এল, বক্সিংয়ের জন্যে ভূপেন বসুর ভাইপো শৈলেন বসুর দলবল এবং লাঠির জন্যে দু-চারজন লোক কোথা হতে সংগ্রহ হল। আমি যেভাবে বলেছিলুম, সেইভাবে সভার কার্যক্রম পরিচালিত হল। কেবল আরম্ভে মণিলালের অনুরোধে আমাকে দিয়ে প্রতাপাদিত্যের একটি উদ্বোধনের দ্বারা সভার 'atmosphere' তৈরি করে দেওয়া হল। তারপরে মণিলাল-লিখিত তাঁর একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠের পরই নানা রকম খেলাধুলা চলল ও শেষে আমার হাতে মেডেল বিতরণ। সেই মেডেলের একদিকে খোদা ছিল—"দেবাঃ দুর্বলঘাতকাঃ"।

সভায় কলকাতার সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা প্রায় সবাই উপস্থিত ছিলেন। 'সঞ্জীবনী' লিখলেন—"কলিকাতার বুকের উপর যুবক-সভায় একটি মহিলা সভানেত্রীত্ব করিতেছেন দেখিয়া ধন্য হইলাম।" 'বঙ্গবাসী'র লেখার সার,—"মরি মরি কি দেখিলাম! এ কি সভা! বক্তিমে নয়, টেবিল চাপড়া-চাপড়ি নয়—শুধু বঙ্গবীরের স্মৃতি আবাহন, বঙ্গ-যুবকদের কঠিন হস্তে অস্ত্রধারণ ও তাদের নেত্রী এক বঙ্গললনা—ব্রাহ্মণ কুমারীর সুকোমল হস্তে পুরস্কার বিতরণ। দেবী দশভুজা কি আজ সশরীরে অবতীর্ণা হইলেন? ব্রাহ্মণের ঘরে কন্যা জাগিয়াছে, বঙ্গের গৌরবের দিন ফিরিয়াছে।"

বিপিন পাল তাঁর Young India-তে টিপ্পনী করলেন—

"As necessity is the mother of invention, Sarala Devi is the mother of Pratapaditya to meet the necessity of a hero for Bengal!"

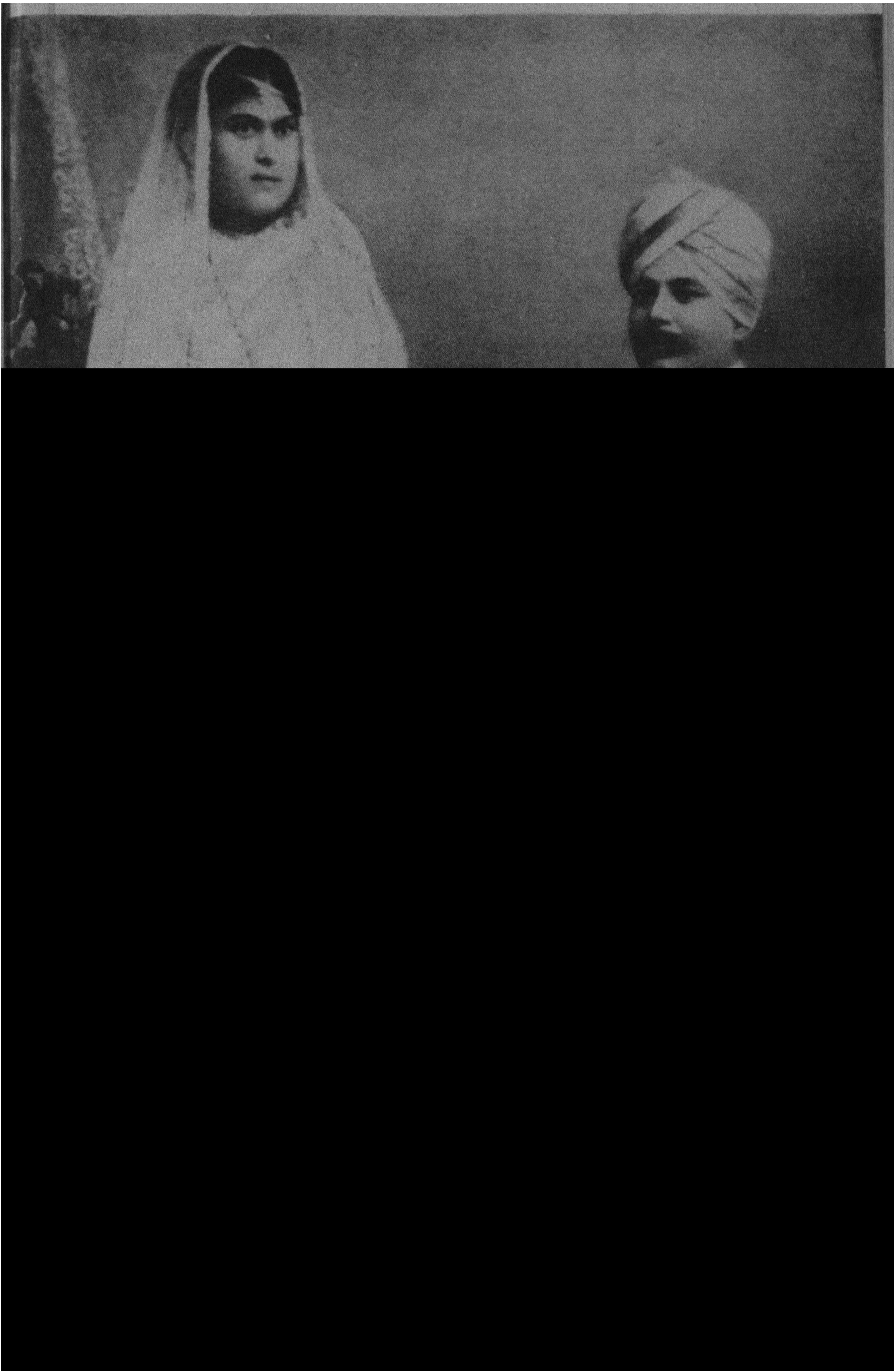

দেশের লোকে এ টিপ্পনীতে ভড়কালে না। বাঙালীর নিবিড়তম মর্মদেশে প্রতাপাদিত্যের প্রবেশ হল। তার প্রথম বহির্বিকাশ দেখা দিলে প্রোফেসর ক্ষীরোদ বিদ্যাবিনোদের প্রতাপাদিত্য নাটক রচনায় ও স্টার থিয়েটারে রাতের পর রাত তার অভিনয় পরিচালনায়। দেখাদেখি রেষারেষি মিনার্ভায় অমর দত্তের 'প্রতাপাদিত্য'রও আবির্ভাব হল।

তীর এসে বিঁধল আমার বুকে রবীন্দ্রনাথের হাত থেকে—সাক্ষাতে নয়, দীনেশ সেনের মারফতে। দীনেশ সেন একদিন তাঁর দূত হয়ে এসে আমায় বললেন—"আপনার মামা ভীষণ চটে গেছেন আপনার উপর।"

"কেন?"

"আপনি তাঁর 'বৌঠাকুরাণীর হাটে' চিত্রিত প্রতাপাদিত্যের ঘৃণ্যতা অপলাপ করে আর এক প্রতাপাদিত্যকে দেশের মনে আধিপত্য করাচ্ছেন। তাঁর মতে, প্রতাপাদিত্য কখনো কোন জাতির hero-worship-এর যোগ্য হতে পারে না।"

আমি দীনেশবাবুকে বললুম—"আপনি তাঁকে বলবেন, আমি ত প্রতাপাদিত্যকে moral মানুষের আদর্শ বলে খাড়া করতে যাইনি—তাঁর পিতৃব্য-হনন প্রভৃতির সমর্থন করিনি। তিনি যে politically great ছিলেন, বাঙলার শিবাজী ছিলেন, মোগল-বাদশার বিরুদ্ধে একলা এক হিন্দু জমিদার খাড়া হয়ে বাঙলার স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন, নিজের নামের সিক্কা চালিয়েছিলেন—সেই পৌরুষ, সেই সাহসিকতার হিসেবে তিনি যে গৌরবার্হ, তাই প্রতিষ্ঠা করেছি। এতে যদি ইতিহাসগত কোন ভুল থাকে তিনি সংশোধন করে দিন, আমি মাথা পেতে স্বীকার করে নেব।" এর উত্তর নিয়ে দীনেশ সেন আর পুনরাগমন করেননি। বাঙালীর বীরপূজা চলতে থাকল। অতঃপর আমি 'বঙ্গের বীর' সিরিজের ছোট ছোট পুস্তকাবলী বের করতে আরম্ভ করলুম। এবার প্রতাপাদিত্যের পুত্র উদয়াদিত্যের উৎসবের আয়োজন করলুম। সেকালে সুরেন বাঁড়ুয্যের 'Bengalee' বাঙালী পরিচালিত মুখ্য ইংরেজি পত্র। 'Bengalee'তে খুব উৎসাহের সঙ্গে আমার আয়োজিত সব অনুষ্ঠানের রিপোর্ট বেরতে লাগল। উদয়াদিত্য-উৎসবের ঘোষণায় বেঙ্গলি এইভাবে লিখলেন—"সরলা দেবী দেশের উপর নতুন নতুন 'surprise spring' করছেন—আমরা তাঁর সঙ্গে দৌড়ে দৌড়ে হাঁফিয়ে পড়ছি। রোজ ভোরে উঠে মনে হয়—অতঃ কিম্?"

নজর পড়েছিল আমার যে রাজপুত বীরবালক বাদল প্রভৃতির কীর্তি পড়ে আমরা বাঙালীরা অভিভূত হই, তাদের গৌরবে গৌরবানুভব করি, কবিতা বানাই, কিন্তু বাঙালীর ঘরের ছেলে উদয়াদিত্য যে মোগলদের বিরুদ্ধে বাঙালীর স্বাধীনতা রক্ষার চেষ্টায় সম্মুখ-সমরে দেহপাত করেছিলেন—তার খবর কিছুই রাখিনে। তার স্মৃতি বাঙালী যুবকের ধমনীতে ধমনীতে প্রবাহিত করে দেওয়ার দরকার। আমার কাছে তখন যেসব ছেলেরা আনাগোনা করতেন, তার মধ্যে অনেক বি-এ, এম-এ ছিলেন, কলেজের প্রোফেসরও ছিলেন। শ্রীশচন্দ্র সেন তার মধ্যে একটি। ইনিই উদয়াদিত্য-উৎসব সম্পাদনের ভার নিলেন। আমি ইন্ডিয়ান মিররের এডিটর ও এলবার্ট হলের অন্যতম ট্রাস্টী বৃদ্ধ নরেন্দ্রনাথ সেনকে লিখে, টাকা পাঠিয়ে হল ভাড়া করিয়ে দিলুম উৎসবের জন্যে। উদয়াদিত্যের কোন ছবি ত নেই। উৎসবগৃহে তাঁর পরিচায়ক কি থাকতে পারে? ভেবে দেখলুম ক্ষত্রিয় বীরের আত্মার প্রতিরূপ তাঁর তরবারি। সুতরাং একখানি তরবারি স্টেজের উপর থাকবে,—সভাসীনেরা উদয়াদিত্যকে স্মরণ করে তাতেই পুষ্পাঞ্জলি দেবে। সব আয়োজন সম্পূর্ণ হয়েছে, একজন হিন্দুস্থানী জমিদারের কাছ থেকে হীরা-জহরতের হাণ্ডিলওয়ালা সুন্দর ঝকঝকে একটি তলোয়ার যোগাড় হয়েছে, ক্ষীরোদ বিদ্যাবিনোদ প্রেসিডেন্টের আসন গ্রহণ করবেন স্থির হয়েছে, হ্যাণ্ডবিল প্রচুরভাবে ছড়ান হয়েছে, বিকেল চারটেতে মিটিং, আয়োজনকারীরা বেলা দশটা থেকে সেখানে মোতায়েন—এমন সময় ঠিক বারটার সময় দৌড়তে দৌড়তে শ্রীশবাবু বালিগঞ্জে এসে হাজির—তখন আমরা কাশিয়াবাগান থেকে বালিগঞ্জে উঠে এসেছি। এসে বললেন—"নরেন সেন লোকের হাতে চিঠি পাঠিয়েছেন এলবার্ট হলে মিটিং হতে পারবে না। কারণ, তিনি শুনেছেন, ছেলেরা নাকি তলোয়ার পূজো করবে। এসব ভয়াবহ রাজবিদ্রোহাত্মক কাজ—তাতে তিনি অনুমতি দিতে পারেন না।"

আমি শ্রীশবাবুকে বললুম—"যত টাকাই লাগুক, অন্য কোন স্থান, কোন থিয়েটারের স্টেজ হোক, যাই হোক, ভাড়া করে হাতে রাখুন। আমি ইতিমধ্যে নরেনবাবুকেও চিঠি লিখে দেখছি ফের এলবার্ট হলেই করাতে পারি কিনা।"

আমি বৃদ্ধকে লিখলুম—"আপনি পরম হিন্দু—ভাল করেই জানেন হিন্দুর পূজো তিন রকমে হয়—ঘটে পটে ও খড়্গে। পটের অভাবে এক বীর ক্ষত্রিয়ের আত্মার প্রতিনিধিস্বরূপ বাঙালী ছেলেরা খড়্গে তাঁর

পূজার আয়োজন করেছে—এক হিন্দুস্থানী রাজা খুশী হয়ে সেজন্যে নিজের তলোয়ার তাদের পাঠিয়ে দিয়েছেন। আজ আপনি তাদের এ-পূজা যদি বন্ধ করেন, সংবাদপত্রের সূত্রে সমস্ত ভারতবর্ষে ঢিঢি পড়ে যাবে। সবাই বললে বাঙালী যুবকেরা খড়্গপূজা করতে চেয়েছিল, একজন নেতৃস্থানীয় বাঙালী বৃদ্ধ হিন্দু তাতে বাধা দিয়েছেন, তাঁর অতিমাত্রার রাজভক্তি তাতে রাজদ্রোহিতার গন্ধ পেয়ে থরহরি কম্পমান হয়েছে, তাঁর তথাকথিত হিন্দুত্বের পরীক্ষায় আজ তিনি সম্পূর্ণভাবে fail করেছেন। এই ত একদিকে দেশের লোকের ধিক্কার—আর একদিকে মামলায় ফেঁসে যাবেন। আপনি উদয়াদিত্য-উৎসব হবে জেনে-শুনে আজ চারদিন থেকে টাকা গ্রহণ করে Albert Hall ভাড়া দিয়েছেন। টাকা এখনও ফেরাননি। এ অবস্থায় হঠাৎ শেষ মুহূর্তে ছেলেদের উৎসব বন্ধ করলে তারা আপনার নামে ক্ষতিপূরণের মকদ্দমা আনতে পারে। আইনতঃ আপনি দায়ী। অতএব সব দিক থেকেই আপনার পক্ষে বিজ্ঞোচিত কাজ হবে ছেলেদের উৎসব এখানে হতে দেওয়া।"

বৃদ্ধ আমার চিঠি পেয়ে লিখলেন--"তবে তাই হোক। ছেলেরা উৎসব করুক। কিন্তু এর জন্যে সব দায়িত্ব আপনার।" নিজের স্কন্ধের দৌর্বল্য স্বীকার করে তাঁর কন্যাসমা দেশের এক বালিকার স্কন্ধে দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে বৃদ্ধ হাত ধুয়ে বসলেন। ইতিমধ্যে আমার কাছে খবর এসে গেছে যে, শ্রীশবাবু দ্বিগুণ টাকা স্বীকার করে হ্যারিসন রোডের উপর এলবার্ট হলের অতি সন্নিকটেই এলফ্রেড থিয়েটারের স্টেজ ভাড়া নিয়েছেন। আমার কাছ থেকে ভাড়া নিয়ে গেল তাঁর দূত এসে। থিয়েটারের মাড়োয়ারী স্বত্বাধিকারীকে তাঁরা খুলে বলেছিলেন—"আমরা তলোয়ার পূজা করব জেনে রেখো।" মাড়োয়ারী বললে—"আপনারা পূজা করেন, নাচেন, কুঁদেন সে আপনারা জানেন। আমার কি? আমার ভাড়া পাওয়া নিয়ে কথা, সেটা হাতে হাতে পেলেই হল।" হাতে হাতেই পেলে। তারপর শ্রীশবাবুর কাছে যখন নরেন সেনের স্বীকৃতি পত্র পাঠালুম তখন আর তাঁরা এলবার্ট হলে ফিরে যেতে রাজী হলেন না। সভা এলফ্রেড থিয়েটারেই হল। এলবার্ট হলের সামনে ভলান্টিয়ার রেখে দেওয়া হল—হ্যান্ডবিল অনুসারে সেখানে যেমন যেমন লোক সমাগত হয় তাদের এলফ্রেড থিয়েটারে পাঠান হয়।

উদয়াদিত্যের উদ্বোধন প্রথমে কৃত হল প্রেসিডেন্টের দ্বারা আমার পাঠান লেখা পড়ে, আমি নিজে যাইনি। তারপর ক্ষীরোদবাবুর

অভিভাষণ হল, সব শেষে তলোয়ারের সম্মুখে পুষ্পাঞ্জলি। ক্ষীরোদবাবুর অভিভাষণের সারমর্ম ছিল—মৎস্য পুরাণের সেই কাহিনী যাতে ঋষির হাতে আসা একটি ক্ষুদ্র কূপের মীনকে ঋষি এক সরোবরে ফেলে দিতে তার সরোবরব্যাপী বৃহৎ কায়া হল। সেখান থেকে তুলে সমুদ্রে ফেলতে তার কায়া বর্ধিত হতে হতে সে অনন্তব্যাপী হল। তখন ঋষির হাতে পড়া ক্ষুদ্র কূপের সেই ছোট্ট মৎস্যটি বলেন—"আমায় দেখ, আমি অনন্ত।" ক্ষীরোদবাবু ভবিষ্যতে দৃষ্টি বিস্তার করে বললেন—"আজকের এই ক্ষুদ্র উৎসবের পরিকল্পনারূপী মৎস্যটি একদিন সমগ্র বাঙালী জাতির মধ্যে কায়াবিস্তার করে বাঙালীকে বীরত্বে বিপুল করে পরিদৃশ্যমান হবে।" তাঁর সে ভবিষ্যৎ দৃষ্টি সত্য হয়েছে কি না, আমার সাধনা সিদ্ধ হয়েছে কি না দেশ তার পরিচয় পেয়েছে।

বাঙলার বাইরে এক বছর থেকে মহারাষ্ট্রীয় ও দাক্ষিণাত্যের লোকেদের সংস্পর্শে এসে আমার স্বদেশপ্রীতির পরিধিটা অনেক বড় হয়ে গিয়েছিল। শঙ্করাচার্য যে ভারতবর্ষকে উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম এই চতুর্দিকে চারটি ধামের বা তীর্থক্ষেত্রের বন্ধনীতে ঐক্যডোরে বেঁধেছিলেন সেই ভারতবর্ষ আমার বুকে আধিপত্য স্থাপন করেছিল। সেই সমগ্র ভারতের উপলব্ধিময় হয়েছিলুম—বঙ্গ যার পূর্ব প্রান্ত। বাঙলাকে বাকী প্রান্তগুলির সঙ্গে সমান লাইনে মাথা খাড়া করে দাঁড় করাতে হবে বটে, কিন্তু বাকী প্রান্তগুলিকে ভুললে চলবে না। তাই ওয়াচার প্রেসিডেণ্টশিপে সেবার বিডন স্ট্রীটে যখন কংগ্রেস বসল তাতে গাওয়ার জন্যে আমার সমস্ত সত্তা মন্থন করে গান বেরল—

অতীত গৌরব বাহিনী মম বাণী
গাও আজি হিন্দুস্থান!

এর নতুনত্ব সকলেরই হৃদয়স্পর্শী হল। রবীন্দ্রনাথ নিজে এর সমজদার হয়ে গাওয়ানর ভার নিলেন। সেবার কংগ্রেসে পাণ্ডালের বাইরে ও ভিতরে সবসুদ্ধ তিনশ ভলাণ্টিয়ার ছিল। সুরেন বাঁড়ুয্যের বক্তৃতা যেদিন বিকেলে হবে সেদিন পাণ্ডালের বাইরের ভলণ্টিয়াররা তাদের পোস্ট ছেড়ে নিয়ম ও শাসন ভঙ্গ করে সুরেন বাঁড়ুয্যের বাগ্মিতার ধারা শোনার আগ্রহে ভিতরে হুড়মুড় করে ঢুকে visitors' seats দখল করে বসে পড়ল। দিবাবসানে ভূপেন বোস তাদের একত্র করে এজন্যে খুব ধমক দিলেন। তারা চটে সবাই মিলে বিদ্রোহী হয়ে বললে—আগামী

কালকের অধিবেশনে তারা কেউ আর ভলাণ্টিয়ারী করতে আসবে না। সেই সময় কেন জানিনে ভূপেন বসু আমায় ডেকে বললেন—"তুমি এদের একটু বুঝিয়ে বল।"

আমার মাথায় আর কোন বুদ্ধি যুটল না—আমি তাদের ডেকে শুধু বললুম—"দেখ তোমরা সব ভলাণ্টিয়ারেরা কাল আরম্ভের গানটার কোরাসে যোগ দিও। পাণ্ডালের ভিতরে বাইরে যে দিকে যেখানে যে থাক দাঁড়িয়ে বা বসে সবাই এককণ্ঠে সমস্বরে কোরাস গেয়ে উঠবে। আগে সব গানটা শিখে নাও আজ এক্ষুনি আমার কাছে, তাহলে কাল গাইতে পারবে।" রাত ১০টা পর্যন্ত আমি তাদের গানটা গাইয়ে পাকা করিয়ে দিলুম। গানের রসে ভুলে তারা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। তুফানের জলে তেল ঢালা হল। তার পরদিন আর কোন গোলমাল হল না। যথাসময়ে পাণ্ডালের প্রত্যেক দিক থেকে একটা মহারব গুঞ্জিয়ে উঠল—

গাও সকল কণ্ঠে সকল ভাষে
নমো হিন্দুস্থান!
হর হর হর—জয় হিন্দুস্থান!
সৎশ্রী অকাল হিন্দুস্থান!
আল্লা হো আকবর—হিন্দুস্থান!
নমো হিন্দুস্থান!

সকলের ভিতর একটা পুলক সঞ্চারণ করলে।

সেদিনকার অভিজ্ঞতায় আমার মনে একটা কথার উদয় হল,—এই যে বছর বছর যেখানে কংগ্রেস হয় সেখানে সাময়িকভাবে একদল ভলাণ্টিয়ারদের কুচকাওয়াজ করিয়ে গড়ে তোলা হয়—তারপরে তারা ছোড়ভঙ্গ হয়ে যে যেখানে চলে যায়, আর শাসন নিয়মের ধার ধারে না, এ জিনিসগুলো তাদের মজ্জাগত হয় না—এতে অনেকটা অযথা শক্তিক্ষয় করা হয়। এর চেয়ে যদি স্থায়ী ভাবে একটা 'ভলাণ্টিয়ার কোর' গড়ে তাদের বারমাস হপ্তায় একদিন করে অন্তত drill ও discipline শিক্ষা দেওয়া হয় অনেক কাজ হয়। এবারকার কংগ্রেস ভলাণ্টিয়ারের কাপ্তেন যে ছিল সে আমাদের বেথুন কলেজের সংস্কৃত পণ্ডিত চন্দ্রকান্ত মশায়ের দৌহিত্র—পরে মোহিনীবাবুর জামাতা হয়। আমি তাকে ডেকে সেই প্রস্তাব করলুম, সে রাজী হল। কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হলে যখন একদিন সমস্ত ভলাণ্টিয়ারদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়ান

হল আমাদের বাড়িতে, সেইদিন এই ভলান্টিয়ার কোরের গোড়াপত্তন হল।

ইতিমধ্যে আমার হাতে রুডিয়ার্ড কিপ্লিংয়ের একখানা ছোট গল্পের বই এসে পড়েছিল। তার একটা গল্পে আছে—ভারত সীমান্তে পাঠানদের মুলুকে একজন বাঙালী আই-সি-এস সাহেব ডেপুটি কমিশনার নিযুক্ত হয়েছেন। সমস্ত ডিস্ট্রিক্টের ভার তাঁর উপর। একবার যখন পাঠানরা হঠাৎ বিদ্রোহী হয়ে খুন-খারাপী ও লুটতরাজ আরম্ভ করলে তখন বাঙালী ডেপুটি কমিশনার সাহেব দুষ্কৃতের শাসন ও সুকৃত প্রজার পালনে রত না থেকে কোথায় পলাতক হলেন কেউ পাত্তা পেলে না। শেষে পাঠান চরেরা খুঁজে খুঁজে তাকে বের করলে যেখানে ভয়ে কম্পমান হয়ে লুকিয়ে গা ঢাকা দিয়েছিলেন। তাঁকে ধরে ফেলে এক কোপে তাঁর গলাটা কেটে মুণ্ডটা একটা শূলের উপর গেঁথে সারা শহরময় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাতে লাগল—"বাঙালী গিদ্দর" (শৃগাল)। এই গল্পটা পড়তে পড়তে লজ্জায় ঘৃণায় অপমানে আমার রক্ত টগবগ করতে থাকল। কি করতে পারি আমি এই অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য? কিপ্লিংকে একখানা চিঠি লিখলুম, তার মর্ম—"আমার জাতিকে তুমি যে কলঙ্কিত করেছ সে কলঙ্ক ঘোচানর জন্যে আমি তোমাকে আহ্বান করছি—আমার ভাইদের একজন কারও সঙ্গে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে। পাঁচ বৎসর সময় দিচ্ছি তোমায়। বন্দুক হোক, তলোয়ার হোক, যে কোন অস্ত্র তুমি ইচ্ছে কর নিজেকে তাতেই অভ্যস্ত করে নাও—আজ হতে পাঁচ বছর পরে সে তাতেই তোমাকে যুদ্ধদান করবে।"

ঠিকানা জানিনে কোথায় পাঠাব। সন্ধান করতে করতে বিলম্ব হতে লাগল। এর ভিতর কটকে যাওয়ার জন্যে একটা তাগাদা এল। সেখানে উড়িষ্যার দেশভক্ত মধুসূদন দাসের সঙ্গে পরিচয় হল, তিনি প্রায় বাঙালী। কথায় কথায় তাঁকে একদিন ঐ প্রেরিতব্য চিঠির কথা বললুম। চিঠিখানা সঙ্গেই ছিল, তাঁকে পড়ে শোনালুম। তিনি বিজ্ঞ পুরুষ, পরামর্শ দিলেন—"ওকে যখন পাঁচ বছর সময় দিচ্ছেন, নিজেও পাঁচ বছর সময় নিয়ে অপেক্ষা করুন। এই পাঁচ বছরে বাঙালী ছেলেদের তৈরী করে নিন, সব রকম অস্ত্রচর্চায় পারদর্শী করে তুলুন। একটা নামডাক হোক তাদের। তারপর কিপ্লিংকে challenge পাঠাবেন। সেইটেই সঙ্গত হবে।" আমি কথাটার যুক্তিযুক্ততা স্বীকার করলুম। কলকাতায় ফিরে এসে সন্ধান করে করে শ্রীরামপুরের উকীল মহেন্দ্র লাহিড়ীর বাড়ির

ছেলেদের কাছে তাদের তলোয়ার ও গৎকা প্রভৃতির শিক্ষক প্রোফেসর মার্তাজা বলে একজন মুসলমান ওস্তাদের খবর পেলুম। তাকে ডেকে আমাদের বাড়িতে পাড়ার ছেলেদের একটা ব্যায়াম ক্লাব খুলে মোটা মাইনে দিয়ে তার শিক্ষক নিযুক্ত করলুম। তখন আমরা কাশিয়াবাগান থেকে উঠে ২৬নং সার্কুলার রোডে এসেছি। এ বাড়িতে সামনে একটা বড় lawn আছে, আর পিছন দিকে পুকুর ধারে একটা ছোটখাট চৌকোনা জায়গা আছে, সেখানে ছেলেরা নানারকম অস্ত্র শিক্ষা করে। ক্লাবের সব খরচ—মার্তাজার মাইনে, বক্সিংয়ের দস্তানা, গৎকা, ঢাল, ছোরা, তলোয়ার, বড় লাঠি ও ছোট লাঠি প্রভৃতি সবেরই খরচ আমি দিই। ভবানীপুরের ছেলেরা আসে, শেখে। আমি বসে থাকি চেয়ারে একপাশে, সামনে টেবিল পেতে একটা খাতায় প্রতিদিন ছেলেদের হাজরি লিখি। ক্রমে ক্রমে এই ক্লাবের খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল, দূর দূর থেকেও ছেলেরা আসতে লাগল এবং কলকাতার পাড়ায় পাড়ায় এই রকম ক্লাব খুলে গেল। পুলিন দাস এলেন ঢাকা থেকে 'অনুশীলন সমিতি'র সর্দার হয়ে। অধিকাংশ ক্লাবই আমার কাছ থেকে কিছু না কিছু সাহায্য পেত, জিনিসে বা টাকায়—'অনুশীলন সমিতি'ও পেত, এবং সব ক্লাবরাই যে যখন পারে এক একবার করে মার্তাজাকে শিক্ষক করে নিয়ে যেতে লাগল।

॥ আঠার ॥

ছেলেবেলা থেকে আমরা রবিমামার গান গাইতুম—

এ কি অন্ধকার এ ভারতভূমি,
বুঝি পিতা তারে ছেড়ে গেছ তুমি,
প্রতি পলে পলে ডুবে রসাতলে
কে তারে উদ্ধার করিবে।
হীনতা লয়েছে মাথায় তুলিয়া,
তোমারেও তাই গিয়েছে ভুলিয়া।
তুমি চাও পিতা তুমি চাও চাও,
এ দীনতা পাপ এ দুঃখ ঘুচাও,
ললাটের কলঙ্ক মুছাও মুছাও
নহিলে এদেশ থাকে না।

বড় হয়ে দেখলুম বাঙলার ললাটে প্রধান কলঙ্ক হচ্ছে কাপুরুষতার —সেইটিই মুছতে হবে। হাতে অস্ত্র ধরলেই ভীরুতা যায় না। কিন্তু অস্ত্রচালনার বিদ্যা জানা থাকলে ভরসা থাকে আততায়ীর শরীরে ঠিক কোন জায়গাটি বাঁচিয়ে কোন জায়গায় মারলে সে মরবে না, শুধু ঘা খেয়ে হতবল হবে। হয়ত তাতে মারপিটের দায়ে ধরা পড়তে হতে পারে, কিন্তু খুনের দায়ে নয়। এই ভরসাই সাহস দেয় অস্ত্রবিৎকে অস্ত্র চালাতে। কুকুরেরও দাঁত আছে, বেড়ালেরও নখ আছে, আক্রমণ করলে একটি পোকামাকড়ও কামড়ায়—শুধু বাঙালীই কি সাত চড়েও রা কাড়বে না? এত মনুষ্যত্বের অভাব তার চিরকাল? এত হীনতা?

আর একটা জিনিস দেখলুম। হাতের ও মনের দুইয়ের একসঙ্গে ক্রিয়া চাই। লাঠি চালাতে শিখলেও মনের muscles-এর অকর্মণ্যতা অনেক দিন ধরে পুরুষানুক্রমে বাঙ্গালীর চলে এসেছে, সেটাকে সরিয়ে ঠেলে ফেলে মনকে কর্মপ্রমুখ করে কাজে ঝাঁপ দেওয়ানর অভ্যেস না করলে মনের হুকুম বিনা দরকারের সময় লাঠিবিদের হাত উঠবে না। বীরেরা বলেছিলেন—"বলং বলং বাহুবলং।" সঙ্গে সঙ্গে ধীরেরা শিখিয়েছিলেন—"ব্রহ্মতেজো বলং বলং।" অর্থাৎ মন ও শরীর পরস্পর পরস্পরের উপর প্রতিক্রিয়া করে। আমি ঝোঁকের মাথায় দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য হয়েই আমার জাতিকে বলবীর্যে বলীয়ান করে গড়ে তোলার জন্যে তৎপর হইনি। এ বিষয়ে ইংলণ্ডের বড় বড় মনীষী Educationist-দের মতেরও যথেষ্ট অনুসন্ধানপরায়ণ হয়েছিলুম। তাঁদের একজনের পুস্তকে পেলুমঃ—

Physical weakness is a crime—against yourself and those who depend on you. Weaklings are despised and a weakling nation is doomed. The decline of ancient Greece and Rome which rapidly fell from the pinnacle of supreme civilization was due to physical neglect and abuse of the inflexible laws of Nature. A physically weak nation is drained out mentally, its feet are on the downward path and it will end upon the scrap-heap if it does not act before it is too late. To change from a weakling to a perfect man build yourself up, clear your befuddled brain and develop your muscles. The one great test of manliness is—courage, both mental and physical. Your mind alone is the maker of your physical future and your physical strength insures a high moral standard.

ইংরেজীতে প্রবাদ আছে—

"The battles of England are fought and won in the fields of Eton."

Eton-এ ফুটবল ক্রিকেট খেলতে খেলতে একদলের তার বিরুদ্ধ দলের সঙ্গে যে মারপিটের অভ্যাস হয়, সেই অভ্যাস ইংরেজকে স্বদেশ-রক্ষার্থ বা পরদেশ-বিজয়ার্থ যুদ্ধে তৎপর করে। কলকাতায় মোহনবাগান তখনো ময়দানে নামেনি। সেকালে মেডিক্যাল কলেজের ফিরিঙ্গিদের সঙ্গে হিন্দু কলেজের ছেলেদেরই খেলা চলত এবং অনেক সময় দুদলে রক্তারক্তি খুনোখুনিও হত শোনা যায়—হিন্দু কলেজের ছেলেরা প্রতিবারই পরাস্ত প্রতিপন্ন হত। এবারে আমার ক্লাবের ছেলেদের কাছে গল্প শুনলুম আগের দিন মাঠেতে হিন্দু ছেলেরাই খেলায় জিতেছিল, Umpire-এর অপক্ষপাত নির্ধারণও তাই হয়েছিল, কিন্তু তার পরে ফিরিঙ্গ ছেলেরা আক্রোশে দল বেঁধে একপাল উন্মত্ত ষাঁড়ের মত যেমন তাদের তাড়া করলে তারা পালিয়ে প্রাণ বাঁচালে—"যঃ পলায়তি স জীবতি"—এই নীতির অনুসরণে। একটা হিন্দু ছেলেও তাদের সম্মুখীন হল না। আমি বর্ণনাকারীদের জিজ্ঞেস করলুম—"তোমরা কজন ছিলে? কি করলে?" তারা বললে—"আমরা দশবারজন ছিলুম। আমরা কি করতে পারি? আমরাও সরে পড়লুম।"

আমি তাদের ধিক্কার দিয়ে উঠলুম। বললুম—"বৃথা তোমাদের অস্ত্র-বিদ্যা শেখা, বৃথা তোমাদের এখানে লাঠি ঘোরান। কাল থেকে আর এসো না।" তারা লজ্জিত হয়ে অবনত-মস্তকে রইল। তারপরে মাঠে খেলায় জিতেও ফিরিঙ্গির তাড়নায় বাঙ্গালীদের পলায়ন উপলক্ষে ভারতীতে আমার প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ বেরতে থাকল। মহাভারত থেকে সেই কাহিনী শোনালুম যাতে পাওয়া যায়—শ্রীকৃষ্ণের পুত্র অনিরুদ্ধ রাজা সাম্বর সঙ্গে যুদ্ধে আহত ও সংজ্ঞাশূন্য হলে তাঁর সারথি যখন তাঁকে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলাতক হয়, তিনি সংজ্ঞালাভ করে জানতে পেরে তাকে ভর্ৎসনা করে বলেন—"এ কি করলে? আমার নাম চিরকালের জন্যে বীরসমাজ থেকে মুছে দিলে? যদুকুলবৃদ্ধেরা কি বলবেন? আমি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেছি শুনে আমার পিতা-পিতৃব্যেরা কি মনে করবেন? যদুকুলললনারা কি আমায় কাপুরুষ কুলকলঙ্ক বলে ঘৃণা করবেন না? ফিরাও ফিরাও রথ—আমায় যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে চল, ফের সারথি।"

বাঙ্গালী ছেলেদের বললুম—"তোমরা সেই ভারতের সন্তান, যাদের ধমনীতে আজও তোমাদের পূর্বগত ভারতবালক অনিরুদ্ধের রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। সে রক্ত কলঙ্কিত করো না, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিও না। যদি উদারভাবে বল, ক্ষমা করে এসেছ তাদের, তবে জেনো অক্ষমের ধর্ম নয় ক্ষমা। আগে ক্ষমা করবার অধিকারী হও, প্রবল হও, বলবত্তর হও, তবে তোমার চেয়ে যে হীনবল, তার প্রতি দয়া করো, তাকে ক্ষমা করো—তার আগে ক্ষমা করা ভীরুতার কাপুরুষতার নামান্তর।" দুতিন মাস পরে একটি ছেলে আগুয়ান হয়ে—চোরবাগানের বসু পরিবারের শৈলেন বসু—আর পাঁচ-দশটি ছেলের সঙ্গে আমাকে প্রণাম করে বল্লে—"মা চল্লুম—ছমাস পরে আবার আসব।"

"কোথায় যাচ্ছ?"

তারা বললে—"কাল আবার মাঠে খেলা আছে। এবার আর ফিরিঙ্গিদের প্রহার-ভয়ে আমরা পলাতক হব না—উত্তম-মধ্যম না দিয়ে ছাড়ব না। তার দরুন যদি জেলে যেতে হয় যাব—আইনেতে ছমাসের বেশি সে ধারায় সাজা নেই—তাই বলছি ছমাস পরে আপনার শ্রীচরণে আবার আসব।"

তারা গেল, ফিরলেও সমুন্নত মস্তকে পরের দিন, ফিরিঙ্গিরাই এবার পলাতক হয়েছিল, কাউকে জেলে যেতে হয়নি।

সে সময় স্টেট্সম্যানের এডিটর ছিলেন র‍্যাটক্লিফ সাহেব। তাঁর সঙ্গে ডিনারে, ইভনিং পার্টিতে মধ্যে মধ্যে দেখা হত, আমার কার্যকলাপ তাঁর অবিদিত ছিল না, কখনো কখনো সে সম্বন্ধে আমার সঙ্গে তাঁর খোলাখুলি আলোচনাও হত। মোহনবাগান যে বছর গোরাদের বিরুদ্ধে ফুটবল প্রথম জিতলে, সে বছর তিনি বিলাতে ও আমি পঞ্জাবে। "ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান"-এর সম্পাদকপদে অধিষ্ঠিত তখন তিনি। গোরাদের বিরুদ্ধে বাঙালীদের অভূতপূর্ব জিতের খবরটা "ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ানে" দিয়ে তিনি সঙ্গে সঙ্গে লিখলেন—"আমরা জানি এ ঘটনায় সবচেয়ে বেশি আনন্দিত যিনি হবেন তিনি হচ্ছেন—সরলা দেবী—বাঙলার একটি নন্দিনী।"

বলেছি নানা জায়গা থেকে নানা ছেলে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসত সে সময়। কেউ কেউ বলত তার মধ্যে পুলিসের গুপ্তচরও আছে। তাতে আমি ভয় পেতুম না, কারণ আমার লুকাবার কিছুই ছিল না। একদিন মৈমনসিং থেকে দুটি ছেলে এল—কেদার চক্রবর্তী ও তার সহচর ব্রজেন গাঙ্গুলী—পরে স্বদেশী গায়ক বলে যে প্রসিদ্ধি লাভ

করেছিল। বললে সুহৃদ সমিতি নামে একটি দল বাঁধা তারা কয়েকটি ছেলে একটি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে যে গবর্নমেণ্টের চাকরি খুঁজবে না, নিজেরা একটা বড় রকম জমি নিয়ে স্বহস্তে চাষবাস করে নিজেদের প্রতিপালন করবে। সে জন্যে তাদের পাঁচশ টাকা মূলধনের দরকার। সুরেন বাঁড়ুয্যে প্রভৃতি দেশের অনেক নেতাদের কাছে গিয়ে নিজেদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বলে ঐ পাঁচশ টাকা ধার চেয়েছে—বছর দুয়েকের মধ্যে টাকাটা ফিরিয়ে দিতে পারবে এই আশাও প্রকাশ করেছে। কিন্তু কেউ তাদের বিশ্বাস করে টাকা দেননি। শেষে আমার কাছে এসেছে, যদি আমি দেশের ছেলেদের প্রতি বিশ্বাস রাখি, টাকা দিই। জমি প্রায় যোগাড় হয়েছে—মৈমনসিং গৌরীপুরের জমিদার ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর অনুগ্রহে। তিনি আসাম প্রদেশের পাদতলস্থ তাঁর জমি থেকে প্রায় এক হাজার বিঘা তাদের lease দিতে প্রস্তুত আছেন যদি নিজেরা চাষবাস করে। কিন্তু হাল জোৎ গরু ও বীজ প্রভৃতির জন্যে পাঁচশ টাকা গোড়ায় সংগ্রহ না হলে জমি নেওয়া তাদের বৃথা, তাই এখনো নেয়নি। বড় আশা করে আমার কাছে এসেছে। আমি কি দেব তাদের টাকা? তাদের দলে বিশটি ছেলে আছে যারা এই কাজের জন্যে প্রস্তুত।

আমি স্থির জেনে নিয়েছিলুম দেশের ছেলেদের মানুষ করে তোলার যে কাজে আমি নেমেছি তাতে ফিরে পাবার আশা না রেখেই অনেক টাকা ঢালতে হবে। সেগুলো হিসেবের খাতাতে bad debts-এর ঘরেই ফেলতে হবে। আমরা অনেকেই অনেকদিন ধরে প্লাটফর্মে প্রেসে অনুযোগ আনছি, চাকরি ছাড়া বাঙালী ছেলেদের কি গত্যন্তর নেই? স্বাধীন জীবিকার কোন পথই নেই? আমাদেরই সকলের অনুপ্রেরণায় এই ছেলেরা একটা পথ খুঁজে নিয়েছে। এখন যদি তাদের নিরুৎসাহ করি, প্রয়োজনকালে টাকার সাহায্য দিয়ে তাদের সেই পথে অগ্রসর করে না দিই, তবে আমাদের নিজেদের উক্তিতে নিজেদেরই অবিশ্বাস প্রমাণ করা হবে না কি? টাকাটা ঋণ বলেই দেব, কিন্তু ঋণ ফিরে পাবার আশা রাখব না—এই মনস্থ করলুম। হতে পারে এই ছেলেরা ঠগ, হতে পারে সরলমনে চেষ্টা করেও এরা কৃতকার্য হবে না—টাকাগুলি জলেই যাবে, তবু এইভাবে কোন কোন দিকে টাকা ডোবানর জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে। আমি কেদার চক্রবর্তীকে বললুম—"দেব আমি টাকা, কিন্তু ব্রজেন রায়চৌধুরী যে তোমাদের জমি দিতে প্রস্তুত আছেন, সে বিষয়ে তোমাদের সঙ্গে তাঁর পত্র-ব্যবহার দেখতে চাই।"

এক সপ্তাহ পরে তারা ফিরে এসে বললে—"ব্রজেনবাবু এখন আমাদের নামে জমি দিতে অস্বীকার করছেন। আপনি আমাদের মাথার উপর দাঁড়িয়েছেন জেনে বলছেন আপনাকে দেবেন জমি, আমাদের নয়, সে বিষয়ে আপনার সঙ্গে লেখাপড়া করতে প্রস্তুত আছেন।" তারপরে তাঁর স্বদেশপ্রেমিক সেক্রেটারী মনোমোহন ভট্টাচার্যের সঙ্গে ব্রজেন্দ্রবাবু স্বয়ং এসে আমার সঙ্গে দেখা করে সব ঠিক করলেন। জমি আমার নামেই লেখাপড়া হল। জোৎ হাল সব আমার টাকায় আমার নামেই কেনা হল। ছেলেরা চালাবে ও যে ফসল হবে তার দ্বারা নিজেদের প্রতিপালন করবে। দুই-এক বছরে যখন আমায় টাকাটা ফিরিয়ে দিতে পারবে তখন সব কিছুর মালিক তারাই হবে। এই থেকে সুহৃদ সমিতির সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সংযোগ হল।

এবার আমার দৃষ্টি গেল বাঙলায় একটি জাতীয় উৎসবের দিন নির্দিষ্ট করার দিকে। যেমন মহরমের দিন মুসলমানদের নানারকম অস্ত্রচালনার প্রদর্শনী চলে পথেঘাটে, তার জন্য সারা বৎসর ধরে নানা আখড়ায় নানা নেতার অধীনে নানা দল সেগুলি ভাঁজতে থাকে; যেমন রামলীলা ও দশেরা বা বিজয়া দশমীর দিন বঙ্গেতর হিন্দু-ভারতে বীরোচিত নানা খেলাধুলা চলে, বাঙলায় সেই রকম চালাতে হবে—কোন্ দিন? ওসব দেশের দশেরা আমাদের বিজয়া দশমীর মত নয়, তাতে প্রতিমার ভাসানের পর্ব নেই। আমাদের ভাসানের দিন সবাই তারই আয়োজনে ব্যস্ত, সেদিন খেলাধুলার বিশেষ অনুষ্ঠানের অবসর হবে না বাঙালীদের। অথচ ঐ শারদীয় ঋতুতে যে সময়ে শমীবৃক্ষ থেকে তাঁদের অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করে পাণ্ডবরা বীরভোগ্যা বসুন্ধরায় অভিযানে নিষ্ক্রান্ত হয়েছিলেন, সেই সময়েই বাঙালীদের বলবীর্য সাধনার জাতীয় উৎসব না হলে বাকী সব হিন্দুদের সঙ্গে তারা ঐক্যসূত্রে বাঁধা হবে না। এইরূপ দ্বিধায় দোদুল্যমান যখন তখন বাঙালীর পঞ্জিকা হলেন আমার সহায়। হঠাৎ একদিন এ বছর দুর্গা পূজার ছুটি কবে থেকে আরম্ভ হবে তাই জানার জন্যে পঞ্জিকার পাতা উল্টাতে উল্টাতে চোখে পড়ে গেল দুর্গা-পূজার অষ্টমীর আর একটি নাম "বীরাষ্টমী" এবং সেদিন "বীরাষ্টমী ব্রত" পালন করা ও ব্রতকথা শোনানর বিধান। আমার আর নতুন করে কোন দিন উদ্ভাবন করতে হল না, যা চাচ্ছিলুম পেয়ে গেলুম। বহুকাল ধরে বাঙলা দেশের সংস্কারে যা রয়েছে কিন্তু বাঙালীর ব্যবহার থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে তারই পুনরুদ্ধার করা। বাঙালী মায়েদের বীরমাতা

হওয়ার লক্ষ্যপথে আবার নিয়ে আসা, সে বিষয়ে তাদের ব্রতের পুনঃপ্রচলন করা। ভীরু বাঙালী মাদের হাত দিয়েই ছেলের রক্ষাবন্ধন করিয়ে মায়ের নিজমুখে "বীরোভব" বলে ছেলেকে বীরোচিত খেলাধুলায় কাজেকর্মে প্রবৃত্তি দেওয়ান। মাতায় পুত্রে মিলিত হয়ে দেশকে গৌরবশিখরে সমুন্নত রাখার প্রকৃষ্ট সাধনা যে দেশের ধর্মোৎসবের একটি অঙ্গ ছিল—সে দেশ আজ এত হীন এত পতিত হয়ে আছে কেমন করে? আমার প্রাণ কেঁদে উঠল। আজ আমায় দেশের অনেক ছেলে 'মা' বলে। না জেনে আগে থাকতেই আমি তাদের কারো কারো হাতে রক্ষাবন্ধন করেছিলুম। এখন যখন জানলুম ঐ দিনে এদেশের দেশাচারই ঐ, মায়ের কর্তব্যই ঐ, তখন ক্লাবে ক্লাবে সকল খেলোয়াড়ের হাতেই ঐ দিন রাখী বেঁধে তাদের লোক-সমক্ষে খেলায় প্রবৃত্ত করানই হল আমার ধর্ম—আমার প্রতি দেশমাতৃকার এইটিই আদেশ, নয়ত পঞ্জিকার ঐ পৃষ্ঠাটির প্রতি আমার দৃষ্টি পড়ালেন কেন?

সেই থেকে আধুনিক বীরাষ্টমী উৎসবের সূচনা হল। সেই বছরই মহাষ্টমীর দিন ২৬নং বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের মাঠে ছেলেদের অস্ত্র-বিদ্যা-প্রদর্শনী ঘোষণা করা হল। কলকাতায় যত ক্লাব আমার জানা ছিল সকলের কাছে আমন্ত্রণ গেল—তাঁরা যেন উৎসবে যোগদান করেন ও খেলার প্রতিযোগিতায় নামেন। মুর্শিদাবাদের Dowager নবাব-বেগম সাহেবার কন্যা সুজাতালি বেগের পত্নী আমার বন্ধু ছিলেন। লেসের পরদা-ঘেরা একটা প্লাটফর্মের ভিতর আমার মা ও মাসিমাদের সঙ্গে তাঁকে বসিয়ে শেষে পরদার ভিতর থেকে বাড়ান তাঁর হাত দিয়ে উৎসব-প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ করালুম—কাউকে মুষ্টি-যুদ্ধের জন্যে দস্তানা, কাউকে ছোরা, কাউকে লাঠি এবং প্রত্যেককেই একটি করে 'বীরাষ্টমী পদক'—তার এক পিঠে লেখা "বীরোভব"—এক পিঠে "দেবাঃ দুর্বলঘাতকাঃ"। বীরাষ্টমী উৎসবের একটি অনুষ্ঠান-পদ্ধতিও প্রস্তুত হল। তার প্রধানাঙ্গ হচ্ছে একটি ফুলের মালায় সজ্জিত তলোয়ারকে ঘিরে দাঁড়িয়ে দেশের পূর্ব পূর্ব বীরগণের বন্দনা-স্তোত্র ও তাঁদের নাম উচ্চারণ করে করে তরবারিতে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান। সে স্তোত্রটি এইঃ—

বীরাষ্টম্যাং মহাতিথৌ পূর্ব পূর্বগতান্ বীরান্
নমস্কুর্য ভক্তিপূর্বং পুষ্পাঞ্জলিং দদাম্যহম্॥

বীরকুলাগ্রগণ্যং শ্রীকৃষ্ণ-নন্দননন্দনম্
বীরাষ্টম্যাং নমস্কুর্য পুষ্পাঞ্জলিং দদাম্যহম্ ॥
সানুজং শ্রীরামচন্দ্রং রঘুকুলপতিশ্রেষ্ঠম্
বীরাষ্টম্যাং নমস্কুর্য পুষ্পাঞ্জলিং দদাম্যহম্ ॥
ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণার্জুন-ভীমান্ সর্বপিতামহান্
বীরাষ্টম্যাং নমস্কুর্য পুষ্পাঞ্জলিং দদাম্যহম্ ॥
ইন্দ্রজয়ী মহাশূরং মেঘনাদারিপুত্রাসম্
বীরাষ্টম্যাং নমস্কুর্য পুষ্পাঞ্জলিং দদাম্যহম্ ॥
রাজপুতকুলগর্বং প্রতাপমহাপ্রতাপম্
বীরাষ্টম্যাং নমস্কুর্য পুষ্পাঞ্জলিং দদাম্যহম্ ॥
ছত্রপতি মহাবীরম্ মহারাষ্ট্রকুলনায়কম্
বীরাষ্টম্যাং নমস্কুর্য পুষ্পাঞ্জলিং দদাম্যহম্ ॥
পঞ্জাবকেশরীং বীরং রণজিৎ ইতি খ্যাতম্
বীরাষ্টম্যাং নমস্কুর্য পুষ্পাঞ্জলিং দদাম্যহম্ ॥
বঙ্গাধিপং মহাশৌর্যং প্রতাপাদিত্য বীরেশম্।
বীরাষ্টম্যাং নমস্কুর্য পুষ্পাঞ্জলিং দদাম্যহম্ ॥
ক্ষত্রবংশসমুদ্ভূতং বঙ্গজং রায় সীতারামম্
বীরাষ্টম্যাং নমস্কুর্য পুষ্পাঞ্জলিং দদাম্যহম্ ॥
এতৎ সর্বেষান্ পূর্বগতান্ পদে পুষ্পাঞ্জলিং দত্বা
বীরাষ্টম্যাং নমস্কুর্মঃ বয়ম্ অদ্য নমোনমঃ ॥

যখন এক এক জনের নাম উচ্চারণ করে করে পুষ্পাঞ্জলি প্রক্ষেপ হত, একটা ভীষণ উত্তেজনায় সমস্ত সভামণ্ডলী জাগ্রত হত। এই স্তোত্রটির রচয়িতা খিদিরপুরের সেকালের প্রসিদ্ধ স্বদেশী আশুতোষ ঘোষ। বিভিন্ন খেলার মধ্যে মধ্যে এক একটি জাতীয় সঙ্গীতও সকলের উৎসাহ প্রদীপ্ত করে রাখত।

'বীরাষ্টমী'র উৎসব বাঙ্গলায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। যে সব দেশ-ভক্তেরা কলকাতায় এসে যোগদান করতে পারতেন না, তাঁরা স্ব স্ব নিবাস স্থানে এর অনুষ্ঠান আরম্ভ করলেন। আমার উপদেশ ছিল—যে গ্রামে আর কিছু করার সুবিধে নেই, সেখানে এই 'বীরাষ্টমী'কে উপলক্ষ করে মহাষ্টমীর দিন ছেলেরা যেন গ্রামের পুকুরে শুধু সন্তরণেরই প্রতি-যোগিতার আয়োজন করেন। মোট কথা এই তিথিটিতে কোন না কোন রকম শারীরিক বলবীর্যের অনুষ্ঠান চাই, আর মায়ের হাতের রাখী নেওয়া চাই।

সেই সময় একবার বরোদার গায়কোয়ার ও তাঁর রাণী দার্জিলিঙ থেকে কলকাতা হয়ে বরোদায় প্রত্যাগমন করবেন শুনতে পেলুম। আমি

তাঁদের একটি অপরাহ্নে আমাদের বাড়িতে চায়ে নিমন্ত্রণ করলুম। তাঁরা যখন এলেন, আমার ক্লাবের ছেলেরা স্ব স্ব অস্ত্র হাতে তাঁদের guard of honour দিলে এবং চা-পানের পর মাঠে তাদের অস্ত্রখেলা প্রদর্শন করলুম। মহারাজাকে গল্প করলুম প্রায় ৭।৮ বছর আগে সোলাপুরে তাঁর সভাপতিত্বে মহারাষ্ট্রীয় ক্লাবের খেলা দেখে আমার মনে এই ক্লাব খোলার প্রথম সূচনা হয়েছিল। বাড়ির ভিতরে উঠতে প্রথম ঘরেই জাপানী আর্টিস্টের হাতে আঁকা আমার ফরমাসী কালীর একটি অপূর্ব মূর্তি ছিল—সেখানি আজও আছে আমার বাড়িতে। ঘরের অন্যান্য দেওয়ালে আমার মা-বাবার ছবির সঙ্গে সঙ্গে আমারও একখানা বড় ছবি ছিল—খোলা চুলের প্রাচুর্যে বোধহয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা—সে ছবি অনেক জায়গায় বেরিয়েছে, বোধহয় যোগেন গুপ্ত মহাশয়ের "বঙ্গের মহিলা কবি" পুস্তকেও আছে। বরোদা-রাজকে আমি কালীর ছবির দিকে নিয়ে গিয়ে ভাল করে দেখতে বললুম। তিনি আমার ছবির দিকে ফিরে হেসে বললেন—"কোন্ কালী দেখব? এই কালী না ঐ কালী?"

॥ উনিশ ॥

জাতীয় দৈন্যের নানা দিক

নতুন মামার স্থাপিত সঙ্গীতসমাজে বরোদার রাজা নিমন্ত্রিত হয়ে গেলেন। সেটি সেকালের বনেদী ঘরের ধনী সৌখীন পুরুষদের গান-বাজনা ও থিয়েটারের আড্ডা। একবার "বাল্মীকি প্রতিভা" অভিনয় হচ্ছিল সেখানে। তাতে বৌবাজারের যোগেন মল্লিক মহাশয় বাল্মীকি সেজেছিলেন। তাঁর পার্টে যখন গান এল—

"যাও লক্ষ্মী অলকায়!
যাও লক্ষ্মী অমরায়!
এ বনে এসোনা, এসোনা,
এসোনা এ 'দীনজন' কুটীরে—"

তিনি গাইতে গাইতে স্টেজের মধ্যিখানে বলে উঠলেন—"আমার দ্বারা এ হবে না। আমি মা লক্ষ্মীকে এ কথা বলতে পারব না, তাঁকে তাড়াতে পারব না। জন্ম জন্ম এসো মা, থেকো মা এই দীন অভাগ্যজনের কুটীরে।" —বলে স্টেজ ছেড়ে পালালেন।

সেই ধনী ও বিলাসীদের প্রমোদগৃহে বরোদার রাজা গেলেন যখন গান-বাজনার টুঁ শব্দটি শোনা গেল না। সেদিন গোবরডাঙ্গার জমিদার-প্রমুখ বলশালী পুরুষগণের বলবীর্যের নানাপ্রকার নিদর্শন দেখান হল শুধু। বরোদাকে আর কিছু দেখান শুনান যেন বাঙালীর পক্ষে লজ্জাকর হবে, তাঁদেরও মনে তাই ঠেকল। সেদিন প্রমাণ হল দেশের ধাত বদলেছে।

আর এক ব্যাপার হতে থাকল। নানা স্থান থেকে আমার কাছে দরখাস্ত আসতে লাগল তাদের দেশে আমার ক্লাবের কতিপয় ছেলেকে পাঠাতে—তাদের ওখানে খেলাধুলা দেখান ও শেখানরও জন্যে। পুজার সময় বাঙলা দেশে বড়লোকদের ঘরে বাইনাচ আনা একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। বাঙালীর জাতীয় চরিত্রের প্যাটার্ন বদলাতে থাকল।

এই সময় আমার নিজের সম্বন্ধে নানা গুজব আমার কানে ওঠাতে থাকলেন দুই-একটি গুজবী ব্যক্তি। সবই যে প্রীতিকর হত তা নয়। আমি চুপ করে সব শুনে যেতুম, কোন মন্তব্য করতুম না। শুনতে পেলুম আমার একটা নামকরণ হয়েছে বাঙলার 'Joan of Arc'—'দেবী চৌধুরাণী' নামেও আখ্যাত হতে লাগলুম। একবার শুনলুম—রেলেতে একটা পার্সেল ধরা পড়েছে, ভিতরে বন্দুক ভরা, উপরে কারো নাম নেই। পুলিসের বিশ্বাস আমি নাকি সেগুলির আমদানী করিয়েছি—পুলিস কিন্তু তদন্ত করতে আসেনি আমাদের বাড়িতে। আর একবার সি আর দাস আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে বলে গেলেন—"আপনি সাবধানে থাকবেন। সন্ধ্যেবেলা বালিগঞ্জে এ বাড়ি ও বাড়ি হেঁটে বেড়াতে বেরোবেন না। পুলিস বলছে, আপনি বড্ড বাড়াবাড়ি করছেন, অথচ আপনাকে ধরবার, ছোঁবার কোন উপায় পাচ্ছে না। তাই তারা এবার পরামর্শ এঁটেছে কোনদিন সন্ধ্যেবেলায় আপনি বাড়ির বাইরে বেরোলে তাদের গুণ্ডা দিয়ে আপনাকে আক্রমণ করিয়ে জাহির করে দেবে গুণ্ডারা আপনার ক্লাবেরই ছেলে—আপনিই এই সব গুণ্ডা তৈরী করেছেন।"

এইবার ভারতীতে আমার "আহিতাগ্নিকা" কবিতা বেরল। সেটি এই:—

আহিতাগ্নিকা

সর্ব্বদেব সাক্ষী করি একি ব্রত করিলে গ্রহণ!
পথ যে দুর্গম একায়ন!
সুতীব্র দিবস আর সুদীর্ঘ শর্ব্বরী,
অপ্রকম্প্যচিতে
সর্ব্ব ভয় পরিহরি
পারিবে কি যেতে?
হে সুখলালিতা!
দুরাশা-চালিতা!

২

দৃষ্টিবিষ সর্প সেথা জাগে অতি ভীষণ-আকার!
করে নিত্য গরল উদ্গার।
ক্ষুব্ধ, ক্ষুদ্ধ, ক্রূর, হিংস্র পরাণী যতেক
ফিরিছে গোপনে,
আছে কণ্টক শতেক!
পারিবে সহিতে সব?
তুমি বিক্লববচনা
অশ্রু-আবিল-লোচনা!

৩

উজ্জ্বল দ্বিজসম হইবে কি
সত্য-সঙ্গরা!
অতন্দ্রিতা, চিরলক্ষ্য-পরা!
পারিবে সাধিতে শক্তি
রিপুনিবর্হণা!
লোকহাস, ভয়, লজ্জা, মিথ্যা বিগর্হণা
সহিবে প্রশান্ত চিতে?
অয়ি আহিতাগ্নিকা!
অতি সাহসিকা!

৪

যে অগ্নি জ্বালিলে আজি, চিরদীপ্ত
রহিবে কি তাহা?
উচ্চারিবে নিত্য স্বস্তি স্বাহা!
প্রাণাহুতি দিবে তায়! আত্মবিসর্জন
নিয়ত হইবে তার সমিধ ইন্ধন!
সঙ্কল্প অটল রবে!
হবে চিরধন্যা!
অয়ি বীরকন্যা!

৫

পুষ্পমাসে গন্ধ-বহ যদি আনে
মোহ অভিনব,
নিদাঘ সন্ধ্যায় উঠে বেণুবীণা রব,
ময়ূরীবিরুতমধু বনভুবচ্ছায়,
পুলকসমুখ কম্প যদি শিহরায়,
রবে অকম্পিতা তুমি!
হে আত্ম-ঈশানা
চির-অতৃষাণা!

যদি ঝড়ঝঞ্ঝা উঠে, বক্ষ-মাঝে
অঞ্চল আবরি,
অগ্নি রাখি দিও, জাগি সারা বিভাবরী!
আর সব নারী ভবে প্রিয়-পরিজনা,
তুমি রহ শ্রেয়োনিষ্ঠ ব্রত-পরায়ণা!
অনাকুলা, অনলসা, সুকঠোরজপা!
দৃঢ়পরন্তপা!

এই সময় রুশের সঙ্গে জাপানের যুদ্ধ বাধল। বাঙালীদের মনুষ্যত্বের পথে আর এক ডিগ্রি উঠানর জন্যে এই সুযোগটা গ্রহণপরায়ণ হলুম। খবরের কাগজে একটি বিজ্ঞপ্তি দিলুম, ইংরেজদের রেডক্রসের মত বাঙালীদেরও একটি রেডক্রস দল গঠনের জন্যে আমি সচেষ্ট—জাপানের যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে আহতদের সেবার জন্যে। যাঁরা যোগ দিতে চান নিজেদের নাম ধাম আমার কাছে পাঠাবেন, এবং এর ব্যয় নির্বাহার্থে দশ হাজার টাকার প্রয়োজন হবে, যাঁরা অর্থ সাহায্য করতে চান তাঁদের সাহায্য সাদরে গৃহীত হবে। এর উত্তরে তিন শ-র অধিক লোকের আবেদন এল 'বেঙ্গলী রেডক্রস' দলভুক্ত হবার জন্যে; এবং অর্থের দিক থেকে সর্ব প্রথমে মোরভঞ্জের মহারাজা শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জ অযাচিতভাবে একখানি এক হাজার টাকার চেক পাঠালেন। ময়মনসিংহের মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য এবং অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবেরা জানালেন তাঁরা প্রস্তুত আছেন, যখনি যত টাকার প্রয়োজন জানালে পাঠিয়ে দেবেন। দেখলুম, দেশে প্রাণের অভাব নেই, খালি তন্নালিয়ে দেবার দেশলাই কাঠি একটি চাই। এই সময় বেলুচিস্থান থেকে Colonel Yates নামে একজন ইংরেজ মিলিটারী অফিসারের একখানি চিঠি পেলুম। তিনি অনুযোগ করলেন, আমি বাঙালীদের একটা স্বতন্ত্র Ambulance Corps ম্যাঞ্চুরিয়ায় পাঠাবার

জন্যে কেন প্রয়াসী হয়েছি? লর্ড কার্জনের প্রচেষ্টায় ইণ্ডিয়া গবর্নমেণ্ট থেকে যে Corps পাঠান হবে তার সঙ্গে এইটে মিলিত কেন না করি? তাছাড়া আমার Corps কি St. John Ambulance Association-এর ট্রেনিং প্রাপ্ত? তা না হলে যাওয়া নিস্ফল—তিনি আমায় সতর্ক করে দিলেন। হয়ত এ বিষয়ে বাঙালীদের কোন স্বাধীন প্রচেষ্টা ইংরেজদের মনঃপূত ছিল না, হয়ত ইণ্ডিয়া গবর্নমেণ্ট থেকেই এ চিঠির ইঙ্গিত গিয়েছিল,—যাই হোক এর থেকে আমি একটা মস্ত শিক্ষা পেলুম। ব্যাপারটার গুরুত্ব সম্বন্ধে একটা ধারণা এল। আমার 'বেঙ্গলী রেডক্রস' সংগঠন ও যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণের পরিকল্পনাটি শুধু ভাবের তোড়ে নির্গত একটি বস্তু। এর জন্যে নিজেদের তৈরি হওয়ার প্রধান উপকরণ কি কি তা ভাবিনি। দেশের লোকেরাও কেউ এদিকে মাথা ঘামাননি, আমায় সে সম্বন্ধে কেউ সচেতনও করেননি—একের উৎসাহেই খালি সকলের উৎসাহ প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে। শুধু শতাব্দীগত ভীরুতার শিক্ষাকে দলিত করে—'শতহস্তেন বাজিনঃ' প্রভৃতি বুলি প্রত্যাখ্যান করে আহব যুদ্ধস্থলে গোলাবন্দুকের সন্নিকটে উপস্থিত হওয়ার সাহস অবলম্বনই যে যথেষ্ট নয়, যে উদ্দেশ্যে যাওয়া সে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে—আহত মুমূর্ষুদের প্রাথমিক চিকিৎসা ও সেবার জন্যে যারা ডাক্তার নয় তাদের সে বিষয়ে অধীতবিদ্য হয়ে যাওয়া যে কতদূর প্রয়োজন তা ভাবিনি। কর্নেল ইয়েট্‌সের চিঠি পেয়ে এ সম্বন্ধে জাগরণ এল। কিন্তু St. John Ambulance Association কি বাঙালীদের শেখাবে? সেটা British Red Cross-এর অঙ্গীভূত—তাতে ইংরেজ ও ফিরিঙ্গি ছাড়া আর কেউ শিক্ষা পায় বলে ত জানিনে। আমি তার বড়কর্তাকে একখানি চিঠি লিখে অনুরোধ করলুম আমার সঙ্গে এসে দেখা করতে, তিনি সৌজন্য করে এলেন। আমি তাঁকে সব অবস্থাটা খুলে বললুম। তিনি শুনে বললেন—"এ পর্যন্ত একটি বাঙালীও তাঁদের কাছে ট্রেনিংপ্রার্থী হয়ে কখন আসেনি। তাঁদের ক্লাস শুধু ইংরেজ ও ফিরিঙ্গিতেই ভরা। বাঙালীদের শেখান হবে কিনা এ বিষয়ে কোন দিন কোন প্রশ্ন উঠবার অবসরই হয়নি। আমার অনুরোধ তিনি নিশ্চয়ই রক্ষা করবেন—বেঙ্গলী Ambulance Corpsকে উপযুক্তভাবে শিক্ষিত করে দেবেন। সেজন্যে তাদের যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার পূর্বে অন্তত তিন মাস কলকাতায় অবস্থান করে শিক্ষা নেওয়ার দরকার।"

এই সকল পর্যালোচনা চলছে—ইতিমধ্যেই খবরের কাগজে হঠাৎ

একদিন একটি খবর বেরল—জাপানী গবর্নমেণ্ট ইস্তেহার দিয়েছেন—"বহু জাতি তাঁদের প্রতি সহৃদয়তা প্রকাশ করে তাঁদের আহতদের সেবার জন্যে স্ব স্ব রেডক্রস-সেবকদের পাঠাবার অভিপ্রায় জানিয়েছেন। তাঁদের সকলকে জানান হচ্ছে তাঁদের সাহায্য প্রস্তাবের জন্য জাপান কৃতজ্ঞ, কিন্তু এস্থলে কোন বিদেশীয় সাহায্য গ্রহণে তাঁরা পরাঙ্মুখ।" জাপানের তীক্ষ্ম রাজনীতি-বিচক্ষণতার ফলেই এইরূপ বিধান তাঁরা সাব্যস্ত করেছিলেন সন্দেহ নেই।

দেখা যায় সেদিনকার জাপান ও আজকেকার জাপানের প্রতি ভারতবর্ষে আমাদের দৃষ্টিকোণের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সেদিন তারা সবেমাত্র এক প্রচণ্ড বলশালী য়ুরোপীয় বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ করেছে—একমাত্র এসিয়াটিক জাতি তারা সমস্ত এসিয়ার মুখোজ্জ্বল করেছে এবং 'Asia is one' এই বাণীর দ্বারা সমগ্র এসিয়াকে জাগ্রত করেছে। আজ দেখি "**এসিয়া এক**" এই অভিনব বুলিটির ভিতর এক দারুন গুলী লুকিয়ে রেখেছিল যেটা সুযোগ মত বেরিয়ে পড়ে তামাম এসিয়াকে বিব্রত করে তুলবে, সেটি হচ্ছে 'জাপানের অধীনতায়'। আজ কয়েক বৎসর ধরে চীন মহাদেশকে জাপানের ছত্রছায়ে আনবার আপ্রাণ প্রচেষ্টায় সেটা পদে পদে প্রমাণিত হচ্ছে। শ্যাম, বর্মা, মলয়দ্বীপ, কোরিয়া, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ—কোথাও তাদের এ অভিসন্ধি আর লুকোন নেই। পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্তের ক্ষুদ্র দ্বীপ জাপানও যে সাম্রাজ্য বিস্তারের সমান অধিকারী এ বিষয়ে আর তাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। ইংলণ্ড যেমন 'white man's burden' বহন করার মহদুদ্দেশ্যে, কেবলমাত্র পরোপকারার্থ, দেশবিদেশে নিজেদের 'ঝান্ডা উচা' করছেন, জাপানও—ইংলণ্ডের দক্ষতম শিষ্যটিও—তদ্রূপ 'yellow man's burden' কাঁধে ওঠানর জন্যে, প্রতিবেশীদের অতিভার লাঘবের জন্যে, কেবলমাত্র তাদেরই কল্যাণের প্রতি দৃষ্টিবান হয়ে তাদের দিকে হস্তবিস্তার করছে। ইংলণ্ডের লৌহপাশ থেকে মুক্ত হয়ে জাপানের বজ্রকুসুমের বলয় পরতে কিসের আপত্তি? এ যে এসিয়াটিক স্যাকরার হাতে গড়া স্বদেশী জিনিস! কিন্তু ভবী ভোলবার নয়! ন্যাড়া বেলতলায় দুবার যেতে নারাজ!

যুদ্ধের পর অনেক জাপানীর সমাগম হতে থাকল ভারতবর্ষে ও আমাদের পরিবারমণ্ডলে। তার মধ্যে তিন-চারটির সঙ্গে আমাদের বিশেষ পরিচয় হল। তাদের মধ্যে দুটি ইয়োকোআনা ও হিষিদা চিত্রকর, তখনি নিজেদের দেশে কিছু কিছু নামকরা, পরে ভারতবর্ষ থেকে ফিরে গিয়ে

বিশেষরূপে প্রথিতনামা হন। তাঁরা আমাদের পরিবারস্থ কারো কারো ফরমাসে ভারতীয় বিষয়ের অনেকগুলি চিত্র আঁকলেন। য়ুরোপীয়দের মত ক্যানভাসের উপরে নয়, রেশমের উপর আঁকেন জাপানীরা। তাতে ভারি একটি মোলায়েম ভাব হয়। আর তাঁদের তুলির স্পর্শ যে কি সুকোমল, রঙগুলি যে কি সুমোহন হয়ে ফোটে, তা চিত্রশিল্পী মাত্রে জানেন। আমার ফরমাসে একজন ইয়োকোআনা কালী ও একজন হিষিদা সরস্বতীর ছবি আঁকলেন। সে দুখানিই আমার ঘরে আজও বিরাজিত এবং দর্শকমাত্রের দৃষ্টি ও চিত্ত-আকর্ষক। যদি বোমা পড়ে, তবে রামের বোমাতেও যাবে, রাবণের বোমাতেও যাবে—এই ভয় মনে পোষণ করেও ছবি দুখানি রেখেছি সযত্নে যুদ্ধের আজ তিন-চার বছর ধরে নিজের বসবার ঘরেই। এ দুখানির ফটো সে সময়কার প্রবাসীতে বেরিয়েছিল—তখন ভারতী সচিত্র ছিল না। 'কালী'র ছবিটি ঠিক সচরাচর দৃষ্ট কালীর ছবি নয়। তার কল্পনায় যে নূতনত্ব ছিল তার ব্যাখ্যান দিয়েছিলুম প্রবাসীতে।

সুরেন মহাভারতের 'গীতা' কথনের সময়কার ছবি আঁকিয়েছিলেন, তাঁর প্রণীত 'সংক্ষিপ্ত মহাভারত' পুস্তকের অন্তঃপৃষ্ঠায় তার ফটো সন্নিবিষ্ট আছে। শ্বেত অশ্বযুগলের রথে অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ দুজনে সমাসীন। সে ছবি শ্রীকৃষ্ণের তেজোময়তার একটি আদর্শ ছবি। গগনদাদা ও অবনদাদা রাসলীলা ও অন্যান্য হাল্কা রসাত্মক বিষয়ের ছবি আঁকিয়েছিলেন। সে রাসলীলার ছবিখানি একটু একটু মনে পড়ে—কি অপার্থিব চন্দ্রালোক, কি আকাশবৎ সূক্ষ্ম বস্ত্রবীয় উত্তরীয় গোপীদের, কি নৃত্যভঙ্গি! এগুলি প্রকাণ্ড বড় বড় ছবি। আমার পঞ্জাব অবস্থানকালে জাপান গবর্নমেন্টের দূত এসে তাদের আর্টিস্টের অঙ্কিত অমূল্য ছবিগুলি তাদেরই দেশে থাকা উচিত বলে সুরেনের ও গগনদাদাদের ছবিগুলি বহুমূল্যে ক্রয় করে নিয়ে গেল। আমার দুখানি আমার সঙ্গে পঞ্জাবেই ছিল—তাই বেঁচে গেছে, এখনও ভারতবর্ষেই রয়ে গেছে।

এই আর্টিস্টদের সমসাময়িককালে 'প্রিন্স হিতো' বলে জাপানী রাজবংশের একটি ছেলে আসেন। তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন এবং ভারতবর্ষের তীর্থস্থান দেখে বেড়াচ্ছিলেন। এঁকে দেখতে অনেকটা ত্রিপুরার রাজবংশের একটি সুন্দর ছেলের মত -একটি ভারি সৌকুমার্য আছে শরীরে, মুখে ও মনে। তাঁর সরল, সাদাসিদে অথচ সবিনয় ভদ্র-ব্যবহারে সকলে মুগ্ধ হয়েছিলেন। যেন পথহারা পথিকের মত পৃথিবীতে

ফিরতেন তিনি। তাঁকে দু-একটি তথাকথিত রসিক পুরুষ তাঁদের দেশের নর্তকীদের সম্বন্ধে নানা রকম প্রশ্ন করতেন, তিনি ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকতেন। এরা ছাড়া স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকান শিষ্যা মিসেস ওলেবুলের—যাঁর টাকাতেই বেলুড় মঠের ভিত্তি স্থাপিত হয়—বন্ধু, আমেরিকায় কিছুকাল অবস্থিত ও ইংরেজী শিক্ষিত একজন বিশিষ্ট লেখক, আর্ট সমালোচক ও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ওকাকুরা এসেছিলেন। তিনি একজন আদর্শ সামুরাই জাপানী—চেহারায়, ধরন-ধারনে, পোশাক-পরিচ্ছদে, সর্বদিকে চোকস, জাতীয়তায় ভরা, এসিয়ার ঐক্যবাদে অনুপ্রাণিত, এসিয়ার প্রতি অংশকে—শ্যাম, জাভাদি এবং ভারতবর্ষ থেকে আরম্ভ করে পারস্য পর্যন্ত প্রতি খণ্ডটিকে দেশাত্মবোধে কানায় কানায় ভরে দেওয়ার আগ্রহবান। তাঁর একখানি প্রসিদ্ধ বই কলিকাতায় বসেই লেখা, মিসেস ওলেবুল, মিস ম্যাকলয়েড প্রভৃতির তত্ত্বাবধানে এবং নিবেদিতার টাইপিংয়ে। তাঁর বইয়ের আরম্ভের সেণ্টেন্স—'Asia is one', তার শেষ সেণ্টেন্স—Victory from within or Death from without'। তাঁর বইয়ের অন্তর্গত ভাব ও বাণী বাঙলা থেকে পঞ্জাব পর্যন্ত মুখে মুখে প্রচার হতে থাকল, লাজপৎ রায় প্রমুখ প্রত্যেক দেশভক্তের লেখনীতে লেখনীতে প্রতিফলিত হতে লাগল।

এই সব জাপানীরাই সুরেনদার বাড়িতে অতিথি হয়ে বাস করতেন। আমাদের পরিবার ছাড়া আর এক বাঙালী পরিবারের কর্তার সঙ্গেও ওকাকুরার ভাব হল—তিনি ক্রীক রো-র সুবোধ মল্লিকের পিতৃব্য হেম মল্লিক। ওকাকুরা যখন জাপানে ফিরে যান, হেম মল্লিক মহাশয়ের পুত্র তাঁর সঙ্গে গেলেন।

রুশ-জাপানী যুদ্ধের পর থেকে জাপানের সঙ্গে ভারতবর্ষীয়দের বাণিজ্যের সংযোগ বেড়ে গেল এবং বাঙলাদেশ থেকে অনেক ছাত্ররা গিয়ে নানাবিধ শিল্প শিক্ষা করতে লাগল। সিলেটের রমানাথ রায় সে সময়ে একজন প্রসিদ্ধ জাপান প্রত্যাগত সম্মানীয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ফিরে এসেই আমার সঙ্গে দেখা করেন—জাপানের অনেকানেক অদ্ভুত অদ্ভুত ছোট ছোট শিল্পজাত উপহার নিয়ে এসেছিলেন মনে পড়ে, যা তৈরি করতে জাপানীদের বেশি খরচ হয় না, অথচ যার ভিতর শিল্প-নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা পাওয়া যায়। জাপানের আদর্শে নানা রকম ছোট ছোট কলকারখানা ব্যবসা-বাণিজ্য চালান তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। অল্পদিনেই সকলকে মর্মাহত করে তাঁর অকাল-মৃত্যু হয়, দেশ একটি সুকর্মীকে

হারায়। ছাত্রদের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের উমেশ দত্ত মহাশয়ের দৌহিত্র সত্যসুন্দর দেব আমার কতকটা সাহায্যে একটি স্কলারশিপ পেয়ে জাপানে 'পটারি ওয়ার্কস' শিখতে যান এবং দেশে ফিরে 'বেঙ্গল পটারি' খোলেন। খুব ভাল চলছিল। নিজের দেশের পেয়ালা পিরিচে চা খেতে পেয়ে বাঙালী ধন্য বোধ করছিল। কিন্তু যতদূর জানি, ভিন্ন ভিন্ন স্বত্বাধিকারীর হাতে পড়ে পড়ে শেষে কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্র নন্দীর সময় বোধহয় এটা ফেল করে। এখন একটি লিমিটেড কোম্পানী হয়ে পঞ্জাবী ও দিল্লীওয়ালাদের শেয়ার আধিক্যে তাঁদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। সত্যসুন্দর দেব এখন রূপনারায়ণপুরে 'Behar Pottery' নাম দিয়ে ও বেলিয়াঘাটায় তাঁর পুত্র সরল দেবের Bengal Porcelain Co. নামে স্বতন্ত্র পটারি ওয়ার্কস খুলেছেন। শুনতে পাই, এগুলির অবস্থাও খুব ভাল।

॥ কুড়ি ॥

বিদেশী-শোষণ, একতা-সাধন

যে সব জাপানীরা সুরেনদের বাড়ি এসে থাকতেন, তাঁরা সকলেই তাঁদের প্রয়োজনীয় সব জিনিসই নিজের দেশ থেকে এনেছিলেন—এমনকি, বাড়িতে চিঠি লেখবার কাগজ পর্যন্ত। আমি জিজ্ঞেস করলুম—"এত কাগজ লগেজের ভিতর ঠেসে সঙ্গে বয়ে এনেছেন কেন?" তাঁদের একজন উত্তর দিলেন—"এ আমাদের বাড়ির মেয়েরা পুরে দিয়েছেন। তাঁরা জানেন, ভারতবর্ষে কিছুই পাওয়া যায় না; কাগজও নয়, সুতরাং কাগজের অভাবে তাঁদের চিঠি লেখা আমাদের বন্ধ হয়ে না যায়।" হায়রে! এরা সেই কবি হেমচন্দ্রের—'অসভ্য জাপান!'—যাদের চোখে পরাধীন ভারতবর্ষ এত বড় একটা অসভ্য দেশ—যেখানে কিছু নেই, যে দেশের লোকে কিছুই করতে জানে না, পারে না—একটুকরো কাগজ পর্যন্ত পাবার আশা নেই যেদেশে।

সত্যিই ত! আছে বটে সবই, কাগজও আছে—জাহাজে ভরে ভরে আসা বস্তা বস্তা বিদেশী কাগজ। তারই গর্বে ভারতবাসী গর্বিত—

তাতে যে নিজের মুখে চুণ-কালি পড়েছে, তা ভাবি না। একটা ভারি ধাক্কা লাগল মনে। আমি এর পর থেকে ভারতীর মলাট আরম্ভ করলুম হলদে রঙের তুলট কাগজে—যাতে আজ পর্যন্ত পাঁজিপুঁথি লেখা হয়—ভিতরের কাগজ বদলাবার সাধ্য নেই, তাহলে ভারতীই বন্ধ হয়ে যায়। তখনও টিটাগড়ের বিদেশীয় মূলধনে পরিচালিত তথাকথিত স্বদেশী কাগজও এদেশে সুপ্রাপ্য নয়। ভারতীয় তুলট কাগজের মলাটকে প্রথম প্রথম সকলে আমার উনপঞ্চাশ-বায়ুগ্রস্ততার আর একটি পরিচয়রূপে গ্রহণ করলে, কিন্তু ক্রমে ক্রমে দেখতে পেলুম, দেশে সেই বায়ুটা সংক্রামক হতে থাকল। গোবিন্দচন্দ্র রায়ের গান আমার মন তোলপাড় করতে লাগল—

কত কাল পরে, বল ভারত রে!
        দুখসাগর সাঁতারি পার হবে!
অবসাদ হিমে, ডুবিয়ে ডুবিয়ে,
        ওকি শেষ নিবেশ রসাতল রে!
নিজ বাসভূমে পরবাসী হলে,
        পর দাসখতে সমুদায় দিলে!
পর হাতে দিয়ে, ধনরত্ন সুখে,
        বহ লৌহবিনির্মিত হার বুকে!
পর ভাষণ আসন আনন রে,
        পর পণ্যে ভরা তনু আপন রে!
পর বেশ নিলে, পর দেশ গেলে,
        তবু ঠাঁই নাহি মিলে দাস বলে!
তব নির্ভর নিত্য পরের করে,
        অশনে বসনে গমনের তরে!
পর দীপ-মালা নগরে নগরে—
        তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে!

এরই কাছাকাছি সময়ে নিজের খরচে কর্নওআলিস স্ট্রীটের উপর "লক্ষ্মীর ভাণ্ডার" খুললুম। সেটি বাঙলা দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে সংগ্রহ করা শুধু মেয়েদের জন্যে একটি স্বদেশী বস্ত্রের ও দ্রব্যের ভাণ্ডার। একজন বিধবা ব্রাহ্ম মেয়েকে মাইনে দিয়ে তার বিক্রেত্রী নিযুক্ত করলুম। আশুবাবুর ভাইয়েদের মধ্যে যোগেশ চৌধুরী খুব স্বদেশী ছিলেন। তাঁর রুচিও সুন্দর ছিল। তখন তিনি ব্যারিস্টার হয়ে এসেছেন, হাইকোর্টের কাছে 'চেম্বার্স' নিয়েছেন। একদিন তাঁর চেম্বার্সে আমাদের সকলকে চায়ের নিমন্ত্রণ করলেন। তাঁর ঘরখানি আগাগোড়া স্বদেশী

জিনিসে সাজান। পরদাগুলি ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের ছাপান কাপড়, ঘরের টেবিল, টি-পয়, চেয়ার, সোফা কিছুই ল্যাজারসের বাড়ির নয়, কিন্তু সবই মনোরম খাঁটি স্বদেশী জিনিস, দেখে সকলের চোখ তৃপ্ত হল। তারপরে অনেকে মিলে একটি লিমিটেড কোম্পানী করে যোগেশবাবুর পরিচালনায় বৌবাজারে 'স্বদেশী স্টোরস' নাম দিয়ে একটি দোকান খুলিয়ে দিলেন। আমার ও যোগেশবাবুর স্বদেশী-প্রচেষ্টা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের বহু পূর্বেই। এই সময় বম্বেতে কংগ্রেসের সঙ্গে সঙ্গে একটি বিরাট স্বদেশী একজিবিশন হয়। কোন কোন বম্বে বন্ধুর অনুরোধে আমি তাতে 'লক্ষ্মী-ভান্ডার' থেকে অনেকানেক জিনিস পাঠাই—তার দরুন একটি মেডেল পাই। সে মেডেলটিকে পিন লাগিয়ে আমি ব্রোচ করে পরতুম। প্রায় পনর বৎসর পরে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে যখন পরিচয় হয়, তখনও আমার শাড়ি এই ব্রোচে আটকান থাকত। তাই দেখে তিনি চিনেছিলেন, তাঁর ভারতে অভ্যুদয়ের অনেক পূর্ব থেকেই আমি 'স্বদেশী'। তাঁর সঙ্গে অনেক সভাস্থলে যখন নিয়ে যেতেন, সেই পরিচয়ই আমার দিতেন। সে মেডেলটির design অতি সুন্দর, সেটি এখনও আমার কাছে আছে। সে সময় কলকাতায় ১১ই মাঘের রাত্রে বা বিবাহাদি উৎসবে এ-বাড়ি সে-বাড়িতে আমার আপাদমস্তক স্বদেশী বেশভূষার লালিত্যে লোকেদের চোখ খুলে গেল যে, কিছুমাত্র বিদেশী পরিধেয়ের সংস্রব না রেখে, কেবলমাত্র 'স্বদেশী'তেই যথেষ্ট সৌখীনতা ও ফ্যাশনের পরাকাষ্ঠা দেখান যেতে পারে। মনে পড়ে আমাদের আত্মীয় মেয়েদের মধ্যেও কেউ কেউ তখনো পর্যন্ত আমার পায়ের দিশী নাগরা জুতোটা সইতে পারতেন না—বিদেশী গোড়ালিওয়ালা জুতোতে সকলেই এত অভ্যস্ত। যাঁরা গোড়ায় গোড়ায় বিমুখ ছিলেন—এমন একদিন এল যখন তাঁরাই নামজাদা 'স্বদেশী' হয়ে পড়লেন, নাগরা ছাড়া আর কিছু তাঁদের শ্রীচরণে-শু হল না।

লাঠি গৎকার ক্লাবে যোগদানের উপলক্ষে নানা লোক আমার সঙ্গে দেখা করতে আসত ও নানা আলোচনা করত বলেছি। একদিন দুইজন সিলেটি ভদ্রলোক এসে চা-বাগানের কুলিদের উপর সাহেব প্ল্যাণ্টারদের অত্যাচারের কথা বললে। সাহেবদের এজেণ্ট দিশী রঙরুটেরাই অজ্ঞ কুলিদের কি রকম মিথ্যা কথা বলে প্রলুব্ধ করে ভুলিয়ে ভালিয়ে কাগজে সই করিয়ে দাস্য-বৃত্তিতে ভর্তি করে, সেই সকল লোমহর্ষকর কাহিনী বর্ণনা করলে, ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাস প্রমুখ একদল দেশভক্তেরা

এ বিষয়ে নেতাদের সচেতন করবার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়েছেন শোনালে, এবং 'চা-পান না রক্তপান' এই ছাপান প্লাকার্ড দেখালে সুন্দরীবাবুই তাঁদের আমার কাছে পাঠিয়েছেন জানালে। ছেলেবেলায় ইস্কুলে সুর করে করে পড়া কবিতা মনে পড়ল--

স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায়।
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে,
কে পরিবে পায়।

সে কবিতার গুনগুনানি আজ মনের ভিতর ঝনঝনানি হয়ে উঠল। স্বাধীনতার স্বপ্নে ভরপুর আমার দৃষ্টি পরাধীনতার সহস্রফণা সর্পের প্রতি পড়ল। ভীরুতা ও কাপুরুষতার কলঙ্ক অপনোদন করে জাতিকে আত্মসম্মানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা স্বাধীনতার পথে আরোহণের প্রথম সোপান বটে। কিন্তু স্বাধীনতা একখানি হীরক-খণ্ডের মত, নানা facets দিয়ে নানা রঙের আলো প্রতিফলন করে। স্বাধীনতার ডায়মণ্ডকাটে স্বায়ত্তশাসনই প্রধান কাট—তারই আলো প্রধান আলো। শাসন স্ব-আয়ত্তে থাকা চাই, নয়ত স্বাধীনতা কিসের? আইনকানুন গড়ার প্রতিষ্ঠান নিজেদের আয়ত্তে হওয়া চাই, তবেই ত একটা জাতি স্বাধীন। যে জাতির ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ও কৃষিকার্য বিদেশীকৃত আইনের শাসনের দ্বারাই বিদেশীর হস্তগত সে জাতি কোনক্রমেই স্বাধীনতার গৌরবে গৌরবান্বিত হতে পারে না। যে জাতি জাতি হিসাবে hewers of wood and drawers of water থাকতে চিরবাধ্য হবে, যে জাতিকে শাসনের নামে তার রক্ত অনায়াসে শোষণ করে পরজাতি সমৃদ্ধ হতে থাকবে, যে জাতির কৃষকরা সোনার ফসল উৎপাদন করেও দুবেলা দুমুঠো অন্ন পাবে না নিজের পেট ভরাতে বা স্ত্রী ছেলের মুখে তুলতে; ক্ষেতে বীজ বপন করতে না করতে বিদেশীর দাদন এসে তাদের যা-কিছু সব পরের করে দেবে--সে জাতির স্বাধীনতা সুদূরপরাহত। পা থেকে মাথা পর্যন্ত নিয়ে একখানা শরীর, একটা জাতি। পায়ের, হাতের, মাঝার কষ্টে মাথা যদি টনটন না করে, মাথা কাটা বাকী সব অঙ্গ হয়--তবে মাথার ব্যথায় হাত-পা নড়বে না, কোমর নিজেকে বাঁধবে না। তাই স্বাধীনতার প্লাটফর্মে সবচেয়ে বড় তক্তা জাতির পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঐক্যবুদ্ধি। শুধু মাথাগুলো একাট্টা হলে হবে না, পা-হাত-কোমরসমেত মাথাদের খাড়া হতে হবে। বুকখানা যে সকলের একই তা বুঝতে হবে—একই

জায়গা থেকে সর্বদেহে রক্ত চলাচল হচ্ছে তার ধারণা করতে হবে। কুলিদের উপর অত্যাচারের কথা শুনতে শুনতে আমার মনে এতগুলো কথা খেলে গেল। আজ অনুভব করলুম আমরা যারা আরামে আয়েশে মানুষ তাদের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা একটা ভাবের বিলাস মাত্র। পরাধীনতার বা "দাসত্ব-শৃঙ্খলের" প্রকৃত মর্ম আমরা কি জানি? হাড়ে হাড়ে জেনেছিল আমাদের এক পুরুষ আগে নীলকুঠির ক্রীতদাসেরা, যার ফলে নীল-বিদ্রোহ হয়েছিল; আর এখন জানছে এই 'indented' চা-বাগানের কুলিরা। উৎপীড়ক লুণ্ঠকদের পশ্চাতে আছে প্রথমত তাদের স্বজাতির বন্দুক ও কামান, দ্বিতীয়ত ইংলণ্ডের প্রজারই হিতকল্পে ও ভারতীয় প্রজার ক্ষতিকল্পে গঠিত ভারত গবর্নমেণ্টের আইন-কানুন। যতদিন না এই দুটোর উপরই আমাদের দখল আসবে, ততদিন 'নিজ বাসভূমে আমরা পরবাসী'। যতদিন 'অশনে বসনে গমনের তরে রবে নির্ভর নিত্য পরের করে'—ততদিন হে ভারত আমার, হে আমার মাতৃভূমি, যদিও 'পর দীপমালা নগরে নগরে তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে'।

এই ইংলণ্ডের ইতিহাসই আমাদের গুরু হয়ে শেখাচ্ছে—একটা অত্যাচারী রাজের বিরুদ্ধেও দাঁড়াবার শক্তি আসে, একজন King John-এর কাছ থেকেও Magna Charta আদায় করা যেতে পারে প্রজাশক্তি সংহত করতে পারলে, জাতির আপামর সাধারণের ছিন্নভিন্নতা দূর করে যৌথবল গড়ে তুলতে পারলে। ভারতবর্ষের ইতিহাস থেকে শিক্ষা পাওয়া যায়—কংস ও জরাসন্ধের মত অত্যাচারী রাজার হাত থেকে প্রজাদের উদ্ধারের জন্য শ্রীকৃষ্ণের উদয়ের অপেক্ষা করতে হয়। ইংলণ্ডের ইতিহাস শেখায়—দৈবলীলার অপেক্ষা না রেখে একজন স্বার্থপর, অত্যাচারী নিষ্ঠুর King Charles-এর মুণ্ডপাতের পাতকীবৎ বুদ্ধি ক্রমওয়েলের মত এক একটা মানুষের মত মানুষকেই পোষণ ও সাধন করতে হবে, তার জন্য দল সৃষ্টি করতে হবে। তারই নাম দৈবলীলা, মানুষের ভিতর দিয়েই দৈবশক্তির ক্রিয়া ইংলণ্ডের ইতিহাস শেখায়। পার্লামেণ্ট বা প্রজাদের প্রতিনিধি সভা যা, তা দেশের সর্বসাধারণের পঞ্চায়েৎ, House of Lords ও House of Commons এই দুই ভাগে বিভক্ত হলেও সাধারণী প্রজাবলই বলীয়ান হয়ে জমিদারদের কাছ থেকে সাধারণ্যের স্বার্থ-বিরোধী Corn Law-র 'Repeal' করাতে সক্ষম হয়।

সব দাঁড়াচ্ছে গিয়ে একতা-সাধনায়। একতা কিসে হয়; স্বার্থ যদি এক হয়, তবে লক্ষ্যও এক হবে। যাতে তোমার অপকার তাতে আমারও

অপকার যদি প্রত্যক্ষ করি, তোমার ঘর পুড়লে আমারও ঘর পোড়া যদি অবশ্যম্ভাবী জানি, তাহলে তোমার ঘরখানা নিরাপদ রাখার জন্যে আমারও চেষ্টা থাকবে। আমার লাভ হলে তুমিও যদি নিশ্চয়ই সে লাভের অংশীদার হবে জান, তবে সেটা সাধনের ভার তুমিও বহন করবে। নয়ত যে যার ছাড়াছাড়ি, ছিন্নভিন্ন থাকব। স্বার্থগত একতাবুদ্ধি তাই সকল ঐক্যের মূল। ইংলণ্ডের প্রত্যেকের জাতি হিসাবে পরস্পরের সঙ্গে ঐক্য সেই স্বার্থবুদ্ধিপ্রসূত। সেইটেই তাদের ঐক্য-ইমারতের ভিত্তি। দেশহিতৈষিতা শুধু সেণ্টিমেণ্টের উপর, শুধু ভাবের একটা ধোঁয়ার উপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। তার নজরে একটা স্পষ্ট solid বস্তুর ছবি ফুটে ওঠা চাই—

সর্বহিতে আত্মহিত, আত্মহিতে সর্বহিত।

॥ একুশ ॥

সম্পাদকীয় জীবন—স্বামী বিবেকানন্দ

এই সময়ে আমি একদিকে যেমন নানা বর্ত্মে জাতীয় জীবনকে প্রবাহিত করতে নিযুক্ত ছিলুম—সাহস, বল, বিদ্যা, একতা, স্বাবলম্বন ও স্বায়ত্ত-শাসন এই ষড়মার্গে—অন্যদিকে ভারতীর মধ্য দিয়ে সাহিত্যসেবায়ও একান্তভাবে নিবিষ্ট ছিলুম। নিজের লেখার প্রাচুর্য সে সময় ত ছিলই, কিন্তু নিজের লেখার আভরণেই ভারতীর সর্বাঙ্গ ভরে দেওয়ার অভিমান আমার ছিল না। বাণীর একটি সেবকমণ্ডলীকে ভারতীর পার্শ্বে আকৃষ্ট করে সমাদৃত করার লক্ষ্য আমার ছিল। আমার সোফার সামনের দেওয়ালে একটি লিস্ট টাঙ্গান থাকত—প্রায় চল্লিশটি নাম, কলকাতায় বা কলকাতার বাইরে যাঁদের বঙ্গসাহিত্য চর্চার ও তাতে কৃতী হওয়ার পরিচয় বা ইঙ্গিত-মাত্র কোনরকমে পেয়েছিলুম। পালা পালা করে মাসের মধ্যে একবার করে তাঁদের সঙ্গে আমার পত্রের আদানপ্রদান হত। কুশল-প্রশ্নময় সবিনয় স্মারকলিপি এক একখানি একটি লেখার জন্যে। তাঁদের সৌজন্যে তাঁরা কোনদিন আমায় নিরাশ করেননি। সাহিত্য-ক্ষেত্রে বাঙ্গালী যে পুরো মাত্রায় chivarlry-সম্পন্ন তার সাক্ষ্য আমি দিতে পারি। আধুনিক রাজনীতি-ক্ষেত্রে তার পরিচয় অনেক মেয়েই পান না শুনতে পাই। রাজনীতি এমন

একটা ক্ষেত্র, যেখানে কোন পুরুষ কোন মেয়ের জন্য 'seat' ছাড়তে পরাঙ্মুখ, সবাই 'আপ-কা-ওয়াস্তে'—তাই অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি থেকে আরম্ভ করে বেঙ্গল কৌন্সিল-এসেম্ব্লি পর্যন্ত মেয়েদের জন্যে গুটিকত আলাদা 'seat' নির্ধারিত করা হয়েছে, সেই কটি দখলের জন্যে মেয়েরা পরস্পরের সঙ্গে যত চাও লড়াইদাঙ্গা আঁচড়া-আঁচড়ি কামড়াকামড়ি কর তাতে পুরুষদের আপত্তি নেই, তাতে বরঞ্চ এক একটি মেয়ের পিছনে এক এক দল পুরুষ তাঁদের পৃষ্ঠপোষক বা পৃষ্ঠত্রাণ হতে প্রস্তুত আছেন, দেবী ভগবতীর পিছনে দেবসৈন্যদলের মত। কিন্তু মেয়েরা যদি পুরুষ দেবতাদেরই বলে বসেন—"তোমার সিংহাসনটা আমায় ছেড়ে দাও না ভাই" —তাহলেই বিপদ, তাহলেই পুরুষের পৌরুষ বেরিয়ে পড়ে চোখ রাঙা করে বলে "কভী নেই।" কর্পোরেশনের হলে যেখানকার কৌন্সিলার বা অল্ডারম্যানের নির্বাচনে মেয়েদের জন্যে কোন 'রিজার্ভেশন' নেই সেখানে মেয়েদের পদক্ষেপ অতি দুরূহ—যোগ্যতার সেখানে কোন আদর নেই, স্ত্রীত্বের কোন সমাদর নেই, পুরুষার্থ সেখানে কেবলই স্বার্থগত; রাজনৈতিক কোন প্রতিষ্ঠানের শিরোদেশে তখনই কোন মেয়েকে শিরোধার্য করা হয়, যখন তাঁর আড়ে কতিপয় পুরুষদের কর্তৃত্ব নির্বিবাদে বজায় রাখার প্রয়োজন বোধ হয়। সেটাও রাজনীতি। সাহিত্য-ক্ষেত্রে স্ত্রীপুরুষগত রেষারেষি দ্বেষাদ্বেষির সমস্যা আসে না—যদি না সাহিত্যকে একটি পণ্যক্ষেত্র করা যায়। যাঁরাই সাহিত্যকে নিজের জীবিকার্জনের একটি মুখ্য উপায়রূপে আঁকড়ে ধরেছেন তাঁরাই অন্য সমব্যবসায়ীদের প্রতি বিরুদ্ধভাব ধারণ করেন- হোক সে পুরুষ হোক সে স্ত্রী। সেখানে কথাটা দাঁড়ায় "তোমার মুখে দুটো বেশী ভাত পড়বে না আমার, তোমার ঘরে দুখানা বেশী কাপড় আসবে না আমার।" সেখানে সাহিত্যসেবার অনাবিল আনন্দ চলে যায়, তাতে মিশে যায় স্বার্থহানিবুদ্ধিগত উদ্বেগ, ভয়, আশা ও ক্ষোভ।

আমার সাহিত্যসেবায় প্রয়োজনের তাগিদ ছিল না, তাই আমি অর্থলাভের দিক দিয়ে নিরুদ্বিগ্ন ছিলুম। বরঞ্চ ভারতীর আয়ব্যয় খতিয়ে দেখতে পেলুম—মাসে মাসে কাগজ, ছাপা, ম্যানেজমেণ্ট প্রভৃতির সমস্ত খরচ নির্বাহ করেও যথেষ্ট আয় উদ্বৃত্ত থাকে; এটি স্বত্বাধিকারীর তহবিলে জমা হয়, এতে তারই পকেট ভরে। পত্রিকাখানির গৌরব ও কীর্তি যে লেখকদের লেখার দরুন হয়, তাঁরা এর একটি কপর্দক পান না। আমার মনে হতে লাগল এটা ঠিক নয়। সম্পাদকের খাটুনি আছে বটে, তার দরুন

লাভের একটা নির্ধারিত অংশ সম্পাদকের প্রাপ্য, কিন্তু সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী যদি একই লোক হয়, তবে ম্যানেজমেণ্টের খরচ বাদে বাকী সব উদ্বৃত্তটা স্বত্বাধিকারী একাই কেন গলাধঃকরণ করবে? যে সব লেখকের সহযোগিতায় কাগজখানি গরীয়ান ও স্বত্বাধিকারী লাভবান, সেই লেখকেরা লভ্যাংশের কিছু কিছু পাবে না কেন? শ্রমিক ও মূল ধনিকের সমস্যাটা, Capital ও Labourএর দ্বন্দ্বটা এ বিষয়ে বই পড়াপড়ি করে নয়, স্বতঃই সহজভাবে এই রকম করে আমার মনে উঁকি মারলে। আমি একটা নিয়ম করলুম—ভারতীর প্রত্যেক লেখককেই কিছু না কিছু পারিশ্রমিক উপহার দেব। এখনকার অনেক লোকেদের শুনে আশ্চর্য লাগবে যে, সেকালে এমন লেখকও ছিলেন যাঁরা লিখে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা তাঁদের আত্মসম্মানের পক্ষে হানিজনক মনে করতেন। তাঁদের মত এই—লিখব, সাহিত্যসেবা করব নিজের মনের আনন্দে, তার দরুন অর্থ-গ্রহণ কেন? তাঁরা বলতেন, এতদূর অর্থলিপ্সা এই ভারতে অশোভন। যাঁরা অনাময় ছিলেন, তাঁদের সাধ্যমত অর্থদান করে আমি আনন্দ পেতুম এবং অর্থ গ্রহণ অনেচ্ছুদের কোন না কোন আকারে বাণীর প্রীতির নিদর্শন পাঠাতুম নববর্ষে বা আশ্বিনে, হয়ত একটি সোনার ফাউণ্টেন পেন, হয়ত একখানি ভাল বই।

ভারতীর এই নিয়ম জারীর ফল এই হল যে, প্রত্যেক মাসিক পত্রিকার সম্পাদক, স্বত্বাধিকারীরাই ভাল লেখকদের লেখার জন্যে পারিশ্রমিকের খাতা খুলতে বাধ্য হলেন। এর ফলে লেখকজাতির উপকার হল বটে, কিন্তু আমি নিজে ঠকলুম—কারণ ভারতীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হবার জন্যে আমার চেয়ে অধিক বিষয়াদিসম্পন্ন বিজ্ঞ সম্পাদকেরা বিশেষ বিশেষ লেখকের পারিশ্রমিকের হার এত বাড়িয়ে দিলেন যে, তাঁরা তাঁদেরই একচেটে হয়ে গেলেন, আমি পড়লুম ফাঁপরে।

"ভারতী" হাতে নিয়ে মাসিক-পত্রিকাজগতে আরও একটি নতুনত্ব আমি ঢুকিয়েছিলুম, 'punctuality'—যথাসাময়িকতা। দেখতুম তখনকার দিনে সাময়িক পত্রিকা কখনই ঠিক সময়ে বেরয় না—বৈশাখের পত্রিকা হয়ত আষাঢ়ে হস্তগত হল, আশ্বিনের অগ্রহায়ণে দেখা দিলে। আমার দৃঢ়পণ হল এই দোষটার সংশোধন করব। করলুমও। সময় অতিক্রান্ত করে বেরনর অপবাদ মুছে দিলুম মাসিক-পত্রিকা-জগৎ থেকে। দরোয়ান বেয়ারার হাতে প্রুফ আনান ও পাঠানর অপেক্ষা না রেখে, নিজে গাড়ি করে গিয়ে গাড়িতে বসে বসেই শেষ প্রুফটা দেখে ছাপাবার অর্ডার

দিয়ে ছাপাখানার 'ভূতদের' অস্থির করে তুলতুম। শুধু তাই নয়, দরকার হলে চামড়ার গন্ধে ভরপুর দপ্তরী পাড়ায় গিয়ে অপেক্ষা করে গাড়িতে করে দুচারখানা ভারতী টাটকা বাঁধিয়ে সঙ্গে নিয়ে আসতুম, তারপর ভরসা হত ম্যানেজারকে ছেড়ে আসতে সন্ধ্যের মধ্যে সবগুলো বাঁধিয়ে ছ্যাকরা গাড়ি করে বাড়ি নিয়ে আসবে। শুধু ঠিক দিনে বেরন নয়, ঠিক দিনে গ্রাহকদের হাতে পৌঁছান চাই। ভারতী হাতে এলেই পাঠকরা সচেতন হয়ে বলতেন—"ওঃ আজ মাসের ১লা যে, ভারতী এসে গেছে।" দেখাদেখি অন্য পত্রিকাদেরও চটপটে হতে হল। যথাসময়ে বেরনই মাসিক-পত্রিকা-জগতের নিয়ম বেঁধে গেল। তার অন্যথা করাটা নিয়মের ব্যত্যয়।

লেখক তৈরি করা আমার আর একটি সম্পাদকীয় কাজ ছিল। তৈরি লেখকের লেখা দিয়ে পত্রিকার পৃষ্ঠা ভরা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য সাধনা। কিন্তু তাতেই আমি সন্তুষ্ট থাকতুম না। কোন কোন লেখা প্রথম দৃষ্টিতে রদ্দির টুকরীতে ফেলে দেওয়ার উপযুক্ত হলেও, তার ভিতরকার কতকগুলি মশলা উল্টে পাল্টে সাজালে দিব্যি জিনিস দাঁড়াবে অনুমান করে নিতুম। যে লেখাটার শরীরখানা এখন মড়ার মত, টেবিল থেকে টেনে বাইরে ফেলে দেবার যোগ্য, তারই পা থেকে মাথা পর্যন্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি কাটা চেরা করে নতুন করে বসিয়ে খাড়া করলে জীবন্ত হয়ে উঠবে এই সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তার উপর 'অপারেশন' আরম্ভ করতুম—কঙ্কালের অস্থিগুলি reset করতুম, তার উপর মাংস ও চর্মের প্রলেপ দিয়ে রক্ত চলাচল করাতুম—হয়ে উঠত একটি জীবন্ত বস্তু। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমার চোখে ভেসে উঠছে একটি লেখা। বেহারের কোন বাঙালী বেহারী জীবনের দুই-একটা চিত্র লিখে পাঠিয়েছিলেন। দেখলুম সেগুলিতে বস্তু আছে কিন্তু লেখার কুশলতা নেই। সিরিজগুলির প্রথমটির আমি নাম-করণ করলুম—"রাম অনুগ্রহনারায়ণের জন্মকথা!" নামেতেই সকলের কৌতূহল আকর্ষণ করলে। ভিতরের বস্তু হচ্ছে বেহারী গৃহে শিশুর জন্ম হলে বেহারী মা-রা কি করেন না করেন। "রাম অনুগ্রহনারায়ণ" বেশ ঢাক পিটিয়েই জন্মালেন এবং পাঠকের মনোরঞ্জক তার কীর্তিকলাপ ভারতীতে চলতে থাকল। দু-একবারের পর লেখক নিজেই তৈরি হয়ে উঠলেন—পরের সংখ্যাগুলিতে আর আমায় বেশি বেগ পেতে হল না। এই রকম করে আমার হাতে সেকালে অনেক চলনসই সুলেখক গড়ে উঠলেন। আজকালকার মত তাঁদের এত প্রাচুর্য ছিল না। কিন্তু genius-

এর কুঁড়িও দুই-একটি আবিষ্কার করেছিলুম। মালীরা যেমন মুদিত পাপড়িগুলির এক একটি হাতে করে খুলে খুলে পূর্ণ প্রস্ফুটিত পদ্ম একটি লোকের সামনে ধরে, আমিও তেমনি এই প্রতিভা-পদ্মকুঁড়িগুলির পাপড়ি খুলে খুলে দিয়ে তাদের স্বরূপটি ফুটিয়ে ধরতুম। ভারতীতে তাই আমার সম্পাদন-ক্রিয়া কেবল mechanical ছিল না, শুধু মেশিনের মত কাজ নয়, মানবীয় রসে ভরা ছিল আমার সম্পাদকীয় জীবন। অথচ আত্মীয় ছাড়া আর কোন লেখকের সঙ্গেই আমার চাক্ষুষ পরিচয় হত না। চিঠিতে পত্রেই দেখাশুনা। যাদের লেখা একেবারে অচল বুঝতুম তাদেরও লেখক-হৃদয়ের প্রতি একটা মায়াদয়া রেখে সৌজন্যের ত্রুটি না করে লেখা ফেরত দিতুম। তবু যা অপ্রিয় তা অপ্রিয়ই হত। লেখা ফেরত পাওয়ায় একজন আমায় ক্ষোভভরে লিখেছিলেন--"You are a past mistress in the art of denial." এই রকম অনিচ্ছাকৃত আঘাতের প্রতিঘাত পরজীবনে যে পাইনি একেবারে তা বলতে পারিনে।

আমার হাতের ভারতী শুধু সুকুমার সহিত্যের রঙ্গভূমি ছিল না, বাহন হয়েছিল জাতীয়তার সে কথা আগেই বলেছি। আমার জাতীয়তা যখন জাতিকে আত্মমর্যাদার কণ্টকঘন সর্বাবস্থায় পথের কাঁটা তুলে তুলে চালাতে ব্যস্ত তখন স্বামী বিবেকানন্দের অভ্যুদয় হল। স্টার থিয়েটারে দেশবাসীর দ্বারা তাঁর অভিনন্দন ও তার উত্তরে তাঁর বক্তৃতা উপলক্ষ্য করে ভারতীতে আমার একটি লেখা বেরল। সেইটি পড়ে বিবেকানন্দ স্বামী আমায় একটি পত্র লিখলেন, সে পত্রের উত্তর দিলুম। ক্রমে ক্রমে দুটি একটি পত্রবিনিময় হতে হতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপ-পরিচয়ের সূচনা আরম্ভ হল। তাঁর দূতী হয়ে সিস্টার নিবেদিতা এলেন আমায় নিমন্ত্রণ করে বেলুড় মঠে নিয়ে যেতে। আমি আমার ঘরটির ভিতরে বসে বসেই সকল লক্ষ্যভেদে নিযুক্ত থাকতুম, বাইরে যেতুম না পারতপক্ষে আগে সে কথা বলেছি। আধুনিক মেয়েদের মত আমাদের বাইরে যাবার প্রবণতা ছিল না, তাতে সঙ্কুচিত বোধ করতুম—আজ পর্যন্ত এ যুগেও ট্রামে বাসে উঠে ঠেলাঠেলি করে কোথাও যাতায়াতের প্রবৃত্তি আমাদের নেই। সিস্টার নিবেদিতা আমায় নিমন্ত্রণ করে গেলে আমি কি করি কি করি ভেবে সুরেনকে ধরলুম আমায় সঙ্গে করে নিয়ে যেতে, একা একা যেতে কিছুতেই সাহসে কুলোল না। সুরেন গেল আমার সঙ্গে। প্রথমে ঘরের গাড়ি করে বাগবাজারে গিয়ে সেখানকার ঘাটে নিবেদিতার সঙ্গে মিলিত হয়ে নৌকা করে পাড়ি দেওয়া হল বেলুড়ে। গঙ্গার অব্যবহিত

উপরেই ঘাটের ধাপের পাশে খানিকটা পেটান জমির উপরে বেতের চৌকি বিছিয়ে বসে আছেন জাপানী কিমোনো পরা মিসেস ওলেবুল ও মিস মাকলাউড, তাদের পাশে স্বামী বিবেকানন্দ সাধারণ সাধুর গৈরিক বেশে, ছবিতে দেখা পোশাকে নয়, মাথায় পাগড়ি নেই। তবু তাঁকে দেখলেই একটা অসাধারণ দীপ্ত ভাব চোখে পড়ে। তার সঙ্গে আছেন স্বামী স্বরূপানন্দ—যিনি পরে মায়াবতী অদ্বৈতাশ্রমের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। যেখানে মাটি ধ্বসে ধ্বসে পড়ার সম্ভাবনা নেই, সেই রকম একটা চওড়া মাটিপেটা জায়গা দেখে বসবার আয়োজন হয়েছে, চায়ের সরঞ্জাম সাজান হয়েছে। আমাদের পক্ষে এ রকম জায়গায় বসা একেবারে নতুন ও ভয়সঙ্কুল, এর নিরাপত্তা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ মনে উস্‌খুস্‌ করছিল। কিন্তু তার রমণীয়তাও যথেষ্ট অনুভব করছিলুম। মাথার উপর অবাধ আকাশ, পায়ের নীচে কলকলবাহিনী গঙ্গা, সামনে দক্ষিণেশ্বরের মন্দির, সাধক রামকৃষ্ণদেবের কাহিনীসঙ্কুল, পশ্চাতে বেলুড় মঠগৃহ। তখনও সে মঠের মঠত্ব শুধু ঘাটের উপর একটি ভগ্নপ্রায় বাড়িতে। সেটির জীর্ণ-সংস্কার হয়ে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হয়েছে এখন, আদি মঠ ঐ। তারই একটি ঘরে যেটি স্বামী বিবেকানন্দের শয়নাগার ছিল তাঁর স্মৃতি সকল রক্ষিত আছে। আমেরিকান মেয়েরা ও নিবেদিতাই বেশি কথাবার্তা কইতে লাগলেন, স্বরূপানন্দ তাঁদের সঙ্গী। স্বামী বিবেকানন্দ বেশির ভাগ নীরব, আমরাও। ফেরবার সময় স্বামী স্বরূপানন্দ আমাদের সঙ্গে নৌকায় যাত্রা করলেন। নানারকম গল্প হতে থাকল, নিবেদিতাই সব গল্প উস্কিয়ে দিতে লাগলেন। এই গেল প্রথম দিনের ভিজিট। তারপরে আরও দু-চারবার নিবেদিতা এসে এসে আমায় নিয়ে গেলেন। প্রত্যেকবারই সুরেন সঙ্গে থাকত। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর "রাজযোগ" প্রভৃতি পুস্তিকাগুলির এক এক কপি আমায় উপহার দিলেন, বইয়ের ভিতর পৃষ্ঠায় তাঁর নিজের হাতে ইংরেজীতে লেখা তাঁর "ভালবাসা-সহ প্রদত্ত।" আমি ভারতীর দুখানি কপি তাঁকে পড়তে দিলুম একবার—যাতে 'আহিতাগ্নিকা' ও আমার 'ক্ষণ শেষের—বিলাপ' ছিল। আমরা বসে থাকতে থাকতেই এক নিঃশ্বাসে তিনি পড়ে ফেললেন। নিবেদিতা পরে গল্প করেন স্বামীজী তাকে বলেছেন—"সরলার 'education perfect', এই রকম education ভারতের সব মেয়েদের হওয়া দরকার।" তারপরেই একটা প্রস্তাব নিয়ে এলেন—স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর 'next trip'এ আমারও বিলেত যাওয়ার জন্যে, সেখানে ভারতের

মেয়েদের প্রতিনিধি হয়ে প্রাচ্যের আধ্যাত্মিক বার্তা প্রতীচ্যের মেয়েদের শোনাবার জন্যে। আমার সঙ্গে দেখা হওয়ার পূর্বে যে পত্রাবলী আমায় লিখেছিলেন তার একখানিতেও তাঁর এ বিষয়ের কল্পনা জ্বলন্ত ভাষায় ফুটে উঠেছিল—সেগুলি তাঁর জীবনচরিতে সন্নিবিষ্ট আছে। এমন অমূল্য সুযোগ গ্রহণ করার সৌভাগ্য আমার হল না। আমার নিজের মনের অপ্রস্তুততা, সঙ্কোচ এবং অভিভাবকদের অমত এই দুইই প্রবল-ভাবে বাধা দিলে। নিবেদিতাকে সঙ্গে নিয়ে স্বামীজী চলে গেলেন। সে-ই তাঁর বাণী-বাহিনী হল। ফিরে এলে আর দুই একবার মাত্র তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। শেষ দেখা চিরস্মরণীয়—কি আতিথ্য, কি সম্মান, কি সৎকারে আমায় আপ্লুত করলেন। সেদিনকার ভোজ একটি ভৌগোলিক ভোজ, আর তার প্রত্যেক জিনিসটি তাঁর নিজের হাতে রাঁধা। নরওয়ে, কাশ্মীর, ফ্রান্স, আমেরিকা কোন দেশের সুস্বাদু আহার্যের পরিচয়ের বাকী ছিল না। তাঁর শিষ্যেরাও সকলে শশব্যস্ত আমায় কি করে খাতির দেখাবেন, কি করে সেবা করবেন। খাওয়া শেষ হলে যখন তাঁদের একজন চিলিমচি ও গাড়ু নিয়ে এসে আমার হাত ধোয়াতে দাঁড়ালেন আমি বিদ্রোহী হয়ে পড়লুম। তাঁদের এতদূর অবনত হতে দিতে পারিনে আমার কাছে। আমি কে? আমার ভিতর যে দেবীকে দেখেছেন তাঁরা, সে কে? আমি ত মানবী-তনয়া। সে তাঁদেরই কল্পনারই একটি সৃষ্টি।

॥ বাইশ ॥

ভারতী সম্পাদনসূত্রে অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানে প্রবেশ

অনেক দিক থেকে অনেক জলধারা এসে একটি স্রোতস্বতীকে ভরে তুলে। স্বামী বিবেকানন্দের সংস্পর্শে আমার জীবননদী আর একটা ভাবের ধারায় ভরাট হল। ভারতীর সম্পাদনসূত্রে কত অজানা লোকের সংস্পর্শে এসেছিলুম, তার মধ্যে স্বদেশে বিদেশে এক নবযুগের প্রবর্তক স্বামী বিবেকানন্দ আমারও অন্তরের উপাদানে এক নতুন তত্ত্বের সমাবেশ করলেন—সেটি হচ্ছে আধ্যাত্মিক জীবনের আকাঙ্ক্ষা। অনেকে অনেক কিছু মনে করত স্বামী বিবেকানন্দকে। জাতীয়তাবাদীরা তাঁকে

জাতীয়তার পতাকাধারী বলে দেখত, কর্মবাদীরা তাঁকে কর্মের প্রচণ্ড উত্তেজক বলে জানত। তাঁর শিষ্যেরাই কেউ কেউ বলতেন—"পরমহংস-দেবের আমলে বেশ ছিলুম। ভগবানের ধ্যানে ভোঁ হয়ে থাকতুম, কোন বালাই ছিল না। স্বামীজীর কি হল—আমেরিকা থেকে ফিরে এসে খালি বলেন—কাজ, কাজ, কাজ—সেবা, সেবা, সেবা। একদণ্ড স্থির হয়ে বসার যো নেই, মহাবিপদেই পড়া গেছে।"

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দুই ভূখণ্ডের লোকের মধ্যে গভীরভাবে প্রবেশ করে দেখেছিলেন—যে সত্ত্ব রজ ও তম তিনটি গুণের মিশ্রণ এক একটি মানুষ—তাদের প্রত্যেকটির পরিমাণের তারতম্য আছে প্রতি মানুষে এবং সেই তারতম্য-ভেদে একটা দেশের মানুষদের বা একটা জাতির জাতীয় গুণের ভেদ হয়। ভারতবাসী আপাততঃ বহু পুরুষানুক্রমে স্তূপীকৃত তামসিকতার তলায় প্রোথিত হয়ে আছে। সেই স্তূপ ভেঙ্গে ভেঙ্গে, সরিয়ে সরিয়ে, রাজসিকতা ধরে ধাপে ধাপে উঠলেই তবে আবার আধ্যাত্মিকতার চরম শিখরে আরূঢ় হবে, এখন সেখান থেকে স্খলিত হয়ে আছে—এই তাঁর সিদ্ধান্ত ছিল। তাই তিনি গীতার কর্মযোগের উপদেশ শিষ্যদের মধ্যে প্রচার করলেন এবং সাবেক গুরুভাইদের মধ্যেও প্রতিষ্ঠিত করলেন। গুরু রামকৃষ্ণদেবের নামে উন্মুক্ত মিশনের ধর্ম হল আর্তের, দুঃস্থের, বিপন্নের সেবাকার্য ও অতিথি সৎকার, শুধু ভগবদ্-ধ্যানে ভোঁ হয়ে থাকা আর কলকে টানা নয়। আজ ভারতে বা ভারতের বাইরে যেখানে যেখানে রামকৃষ্ণ মিশনের পতাকা উড়ছে, সেখানে সেখানেই দরিদ্রনারায়ণের সেবা বিশেষভাবে পরিদৃশ্যমান হচ্ছে। ভারতের সামাজিক বা রাজনৈতিক সংস্কাররূপ বিপ্লব-প্রবর্তক ও দ্বন্দ্বমূলক কর্ম তাঁদের প্রোগ্রামে নেই। মহাত্মা গান্ধী স্পষ্টাস্পষ্টি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কর্মশীল, সুতরাং বিপ্লবমুখী দ্বন্দ্বপরায়ণ কর্ম তাঁর। কিন্তু সে দ্বন্দ্বের বিষদাঁত ভেঙ্গে ফেলেছেন দ্বন্দ্বটাকে 'নিরস্ত্র' করে। রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের মত সেবা করেন, বিপ্লবের পাশ দিয়ে যান না। বরঞ্চ বিপ্লবের কাজে ধরা পড়া ও ছাড়া পাওয়া অনেক যুবকদের মিশনের ক্রোড়ে স্থান দিয়ে তাদের ক্ষতবিক্ষত জীবনকে শান্তির পথে নিয়ে যান। ভারতের জাতীয়তা বিবেকানন্দের শিষ্যদের প্রাণের মর্মমূলে বিরাজ করছে, কিন্তু সে জাতীয়তা বাহু প্রসার করে সর্বমানবিকতায় বিস্তৃত, সকল জাতির নরনারীকে তাঁদের জাতীয় কৃষ্টির অন্নে পুষ্ট করতে প্রস্তুত। সেই কৃষ্টির বীজ বোধ হয় আমার ভিতর লক্ষ্য করে-

ছিলেন, তাই স্বামীজী নিবেদিতাকে বলেছিলেন, "সরলার education prefect"। আমার রচনায় যে আত্ম-অভিব্যক্তি পেয়েছিলেন, সে ভারতীয় আত্মা—ইংলণ্ডীয় নয়, ফরাসীয় নয়। ভারতীয় সভ্যতার বীজ তাতে নিহিত দেখেছিলেন। তাই 'ভারতী'তে তাঁর সম্বন্ধে আমার প্রথম লেখাটি পড়েই তাঁর কল্পনার চোখে সে বীজের ভিতর অঙ্কুরিত ও পল্লবিত বৃক্ষকে দেখতে পেয়েছিলেন। তাই তখনই তাঁর একান্ত উৎসাহ জাগ্রত হয়ে উঠেছিল এই রকম ভারতীয় নারী, ভারতীয় বেশে বিদেশে গিয়ে ভারতীয় শিক্ষা প্রচার করুক। পরে আমাকে সাক্ষাতে দেখে শুনে, আমার কথায়-বার্তায়, আমার লেখা গদ্যে পদ্যে সেই ভাব স্থায়ী হয়ে তাঁকে পেয়ে বসেছিল, আমাকে তাঁর সঙ্গে প্রচারকার্যে বিদেশে নিয়ে যাবার জন্যে আগ্রহযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর আগ্রহের প্রাবল্যে আমার অপ্রস্তুততার মাত্রার প্রতি দৃষ্টি দেননি বোধ হয়। নিবেদিতা একেবারে আনকোরা পাশ্চাত্য মেয়ে ছিলেন, ভারতীয় ধর্ম সম্বন্ধে শিক্ষা-দীক্ষা তাঁর একেবারেই ছিল না, তাঁকে যদি গড়ে তুলতে পেরে থাকেন তবে আমাকে প্রয়োজন মত গড়ে পিটে নেওয়া খুবই সহজসাধ্য এইটে অনুমান করেছিলেন বোধ হয়। নিবেদিতাকে যদি "কালীতত্ত্ব" বুঝিয়ে তাঁকে দিয়ে এলবার্ট হলে কালী সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়ান সম্ভবপর হয়ে থাকে, তবে আমাকে বোঝান আরও সহজ হবার কথা। নিবেদিতার বক্তৃতা শুনে সায়ান্স এসোসিয়েশনের ডাক্তার মহেন্দ্র সরকার ভীত হয়ে বলেছিলেন —"এতদিন কালো কালী ছিল—তাই রক্ষে, এ সাদা কালী এসে দাঁড়ালে দেশকে পৌত্তলিকতা থেকে আর বাঁচান যাবে না।" স্বামী বিবেকানন্দ জানতেন, আমি মহর্ষির দৌহিত্রী বটে, ব্রাহ্মভাবে মানুষ বটে, কালী-দুর্গার বিদ্বেষপুষ্ট ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব আমার উপর খুব বেশি হওয়ার সম্ভাবনা বটে, এ সবই সত্য। কিন্তু তা হলেই বা? নরেন দত্তরূপে তিনি যখন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের অনুগামী ছিলেন, তিনিও কি তখন ব্রাহ্ম-ভাবাপন্ন ছিলেন না? পরমহংসদেবের সংস্পর্শে এসে সাকার-নিরাকার-ভেদের পর্দা তাঁর জ্ঞানচক্ষু থেকে আস্তে আস্তে সরে যায় নি কি? আমারও যেতে বাধ্য। এই নিশ্চয়তায় প্রতিষ্ঠিত থেকে তিনি আমায় তাঁর সঙ্গে নিয়ে যেতে ইচ্ছুক হয়েছিলেন। এদিকে আমার এ বিষয়ে যে ততটা উৎসাহ হল না তার কারণ কতকগুলি চিরাগত তামসিক সংস্কারের বশে ও তার দরুন ভীরুতায়।

বিবেকানন্দ দেহরক্ষা করলেন। দেশ শোকসন্তপ্ত হল, কিন্তু দেশের

ভিতর তাঁর কাজ চলতে থাকল। আমারও ভিতর বিবেকানন্দের কাজ চলতে থাকল। যেমন একটা ছোট্ট অশ্বথ বীচি দেওয়ালের একটা ফাটলে উড়ে পড়ে ক্রমে ক্রমে সে ফাটলকে ঠেলে ঠেলে বাড়িয়ে বাড়িয়ে একদিন ডালপালা বের করে গাছ হয়ে দেখা দেয়, তেমনি আধ্যাত্মিক জ্ঞানের পথে চলার আকাঙ্ক্ষা আমার জীবনে অলক্ষ্যে সুড়ঙ্গ কাটতে থাকল। প্রথমে বিবেকানন্দের সঙ্গে পত্র-ব্যবহারে তাঁর একখানি পত্রে পাতঞ্জল যোগসূত্রের একটি বচনের উল্লেখে বইখানি আদ্যোপান্ত পড়ার উৎসাহ উদ্দীপ্ত হল। বাঙলা তর্জমাসমেত সূত্রগুলি একদিন হুহু করে পড়ে ফেললুম। রাজযোগশাস্ত্রের সঙ্গে একটা সাধারণ পরিচয় হল। তারপরে হঠযোগসমন্বিত রাজযোগের অনেকানেক পুস্তক অনুধাবন করেছি এবং যোগীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপও হয়েছে। স্বামীজীর কর্মযোগ পুস্তিকা উপহার পেয়ে ভগবদ্গীতার প্রতি প্রথম দৃষ্টি আকৃষ্ট হল—তার আগে এর একটি শ্লোকও পড়িনি—আমাদের পরিবারে শ্রীকৃষ্ণের গরিমা ছিল না। এই রকম করে করে নিজে নিজে অবগত হতে থাকলুম আমার শিক্ষার ভিৎটায় ভারতীয় আধ্যাত্মিক উপকরণ কিছুটা থাকলেও অনেকটার অভাব রয়ে গেছে। ভারতীয় কৃষ্টি যে হীরকখানি তার সব দিকের আলো ও ছায়া আমার বুদ্ধিতে হৃদয়ে ও আত্মায় সম্পাতিত হয়নি। সেই হিসেবে আমার 'education perfect' হওয়া থেকে এখনো বহুদূরে। এই অভাব পূরণের একটা স্বতঃপ্রবণতা এল আমার। হিন্দুর হিন্দুত্ব জিনিসটি যে কি তা ভাল করে জানবার একটি প্রবৃত্তি জাগল। তার এক সীমায় ঔপনিষদিক বেদান্তের ব্রহ্মের উপাসনা, আর এক সীমায় পৌরাণিক প্রতিমার ধ্যানধারণা ও পূজার বিধান। আমাদের পূর্ব পুরুষ ঋষিদের মনীষায় এই দুই বিপরীতের স্থাপনা কেমন করে স্থান পেয়েছিল তাই জানতে আগ্রহ হল। যখন তাঁরা দুইকেই আসন দিয়েছেন তখন ফেলবার জিনিস নয় কোনটি—তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা আমায় এতে স্থিতধী করলে। ষড়দর্শনগুলি মোটামুটি অধ্যয়নের পর এক একখানি পুরাণ খুলতে খুলতে দৃঢ় অনুভূতি হল পুরাণগুলি parables, গল্পচ্ছলে গভীরতত্ত্ব—সেই বৈদান্তিক ব্রহ্মতত্ত্বই—তাদের ভিতর নিহিত। কোরাণ ও বাইবেলের দ্বারা প্রভাবিত রামমোহন রায় সাকার পূজার বিরোধী হয়ে কেবলমাত্র নিরাকার ব্রহ্মোপাসনার প্রচার করেন। খ্রীস্টীয় চিন্তাধারার টীকা নেওয়া ভারতবর্ষ সম্পূর্ণরূপে আকারবর্জিত নিরাকার ঈশ্বরের প্রণিধানের পক্ষপাতী হল। কিন্তু পারলে কৈ? ঈশ্বরের চরণকল্পনা

ব্যতিরেকে তাঁকে প্রণিপাত করা যায় না, তাঁর হস্তকল্পনা ব্যতিরেকে তাঁর হাতে হাত রেখে চলা যায় না, তাঁর আঁখি কল্পনা ব্যতিরেকে দিবীব চক্ষুরাততং—আমাদের প্রতি তাঁর স্নেহমাখা নির্নিমেষ আঁখি দেখা যায় না—সে আঁখিতে আঁখি রাখা যায় না। কল্পনাতে তাঁকে ইন্দ্রিয়ময় রূপময় দেবমূর্তিতে দেখতে হয়, সাকার করতেই হয়। তা দোষের নয়, কেননা, খ্রীস্টানরাও তাই করেন। কিন্তু ছবিতে, মৃত্তিকায় বা প্রস্তরে আমার কাল্পনিক ভাবমূর্তিকে আকারযুক্ত করলেই Heathenism হল। নবযুগের খ্রীস্টান মিশনারির অঙ্কুশাঘাতে বিদ্ধ ভারতবর্ষ এই Heathenism-এর অপবাদ সহ্য করতে পারলে না। অথচ দেশের যুবকদের খ্রীস্টান হয়ে যাওয়াও সহ্য করতে পারলে না—তাতেও জাতীয় আত্মাভিমানে ঘা লাগে। তাই নিরাকার ব্রহ্মোপাসনার ঘোষণা হতে থাকল, তারই প্রচার ও প্রতিষ্ঠা চলল—দেশ থেকে প্রতিমা পূজা তুলে দেবার প্রচেষ্টা হল—না হলে যেন 'অসভ্য' 'বর্বর' আখ্যার যোগ্য হব আমরা। এই হল রামমোহনের বা ব্রাহ্মধর্মের যুগ। কিন্তু শীঘ্রই নবতর যুগ দেখা দিল—এবার নিরাকারের সঙ্গে সঙ্গে সাকারের যুক্তিপূর্ণ পুনঃপ্রতিষ্ঠা হল, কেননা এ যুক্তির যুগ। শুধু উপনিষদ নয়, হিন্দুর সকল ধর্ম-পুস্তক—সকল 'scriptures'-গুলিই আবার সকলে ভাঁজতে লাগল, সেগুলি ঘেঁটে ঘেঁটে উল্টেপাল্টে দেখতে লাগল। দেখলে অমূল্য রত্নরাজিতে ভরা, বঙ্গোপসাগরে ভাসিয়ে দেওয়ার মত একেবারে নয়। অনেক ব্রাহ্মসমাজীরাও আবার 'হিন্দু' বলে নিজেদের পুনরাখ্যাত করলেন, সাধনার সহায়স্বরূপ গৃহে প্রতিমার পুনঃস্থাপনা করলেন। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী যিনি ব্রাহ্মসমাজের একজন নেতা ছিলেন—দলভঙ্গ করে বেরিয়ে এলেন, দলে দলে ব্রাহ্মরাই তাঁর শিষ্য হলেন। তারপরে এলেন এক 'dynamic personality'—স্বামী বিবেকানন্দ। 'Dynamic' সেই—যার ভিতর বারুদের ধর্ম আছে, প্রচণ্ড তেজ, প্রচণ্ড ভাঙ্গাগড়ার শক্তি। সেই বারুদের আগুন থেকে একটা স্ফুলিঙ্গ আমার ভিতর এসে পড়েছিল—আমায় ভেঙ্গে গড়ে তুলছিল। আমার আধ্যাত্মিক পিপাসা আমায় শৈশবের গতানুগতিক 'ব্রাহ্মধর্ম' থেকে অনেক দূরের পথে নিয়ে চলছিল।

॥ তেইশ ॥

ভারতীতে বিদেশী লেখক ও হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের সমস্যা

আজকাল 'বিদেশী' কথাটায় শুধু পাশ্চাত্যদেশ য়ুরোপ আমেরিকার লোক বোঝায়। সেকালে বাঙালীর পক্ষে ভারতের অন্যান্য প্রান্তের লোকও বিদেশী ছিল—অবাঙালীমাত্রে তখন বাঙালীর চোখে বিদেশী। অর্ধ-শতাব্দী ব্যাপক কংগ্রেসের কার্যপ্রভাবে ভারতবর্ষ আজ সত্যিই একটি মহাদেশ বলে গণ্য; এক প্রান্তের ভারতীয় আজ অন্য প্রান্তের ভারতীয়র ধারণায় স্বদেশী। পূর্ব কয়েক শতাব্দীতে বাঙলার এক জেলার লোকের সঙ্গেও আর এক জেলার লোকের বিষম ভেদজ্ঞান ছিল—তাইতে বরেন্দ্র-ভূমি ও রাঢ়ভূমিবাসীদের পরস্পরের প্রতি বিদেশীয়তা-বুদ্ধি প্রবল ছিল, তাইতে একই জেলাভুক্ত এক গ্রামের কায়স্থদের সঙ্গে অপর গ্রামের কায়স্থদের কন্যা-ব্যবহার হত না—"ভিন্-গাঁ" বলে অবহেয়তার ভাব আসত। সেই অনেকানেক ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র ভেদজ্ঞতা এখনো নিম্নস্তরে কিছু কিছু থাকলেও শিক্ষিত সমাজ থেকে অনেক পরিমাণে চলে গেছে। তাই বাঙলার বাইরের যে কোন ভারতীয় ব্যক্তিকে 'বিদেশী' বলে আখ্যাত করা এখনকার দিনে দোষাবহ হবে। কিন্তু আমি যেকালে ভারতী সম্পাদন করতুম, সেকালে এ দুর্ভেদ্য দুর্গ মাথা তুলে খাড়া ছিল। আমি তার মাথায় হাত বুলিয়ে কিছুটা নুইয়ে আনলুম। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রান্তের দু-একটি প্রসিদ্ধ পুরুষের সঙ্গে আমার আলাপ-পরিচয়ের সুযোগে তাঁদের অনুরোধ করে যে যে ক্ষেত্রে তাঁরা প্রতিষ্ঠাবান, সেই সেই ক্ষেত্রবিষয়ক এক একটি মৌলিক প্রবন্ধ আনালুম। বম্বে হাইকোর্টের জজ মহাদেব গোবিন্দ রাণাডের লেখনী হতে পেশোয়াদের আমলে ধর্মচ্যুত হিন্দুদের স্বধর্মে ফিরিয়ে তাদের অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ সম্বন্ধে একটি মৌলিক প্রবন্ধ যোগাড় করলুম। তিনি লিখেছিলেন ইংরেজীতে—ভারতীতে বেরল বাঙলায়—আমার হাতে অনুবাদিত হয়ে। আর একজন 'বিদেশী'ও সেই সময় ভারতীর লেখক-তালিকায় ধরা পড়লেন—নাম তাঁর মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। তখনও তিনি 'মহাত্মা গান্ধী' হননি, আফ্রিকায় কার্যকলাপের সূচনায় তাঁর নাম-যশ সবেমাত্র আরম্ভ হয়েছে। সেবার দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে কলিকাতা কংগ্রেসে এসেছেন। আমাদের বাড়িতে একদিন একটি সায়াহ্ন পার্টিতে অন্যদের সঙ্গে এলেন। দেখতে

শুনতে চটকদার মোটেই নয়—তবে গালভরা হাসিতে ভরা—মাথায় 'পিরিলি পাগড়ী' পরা। নানা প্রান্ত থেকে সমাগত অতিথিবহুল পার্টিতে অল্পক্ষণের জন্য মাত্র তাঁর সঙ্গে আমার সেদিন পরিচয় হল। পরে তিনি আমায় গল্প করেন, আমায় কি রকম সমীহের চক্ষে দেখলেন সেদিন,—কেননা আমার পিতা—যিনি কংগ্রেসের অক্লান্তকর্মী জেনারেল সেক্রেটারী তাঁর কন্যা আমি, আমার নিজস্ব কার্যকলাপের বিশেষ কোন পরিচয় পাননি। আমি তখন ভারতীর জন্যে মৃগয়াপরায়ণ, সিংহান্বেষী—সেই চোখেই মোহনদাস গান্ধীকে দেখেছিলুম। ইনি ভারতবাসীর হয়ে বিদেশে কাজ করায় নামকরা একটি সিংহ হয়েছেন, এঁর কাছ থেকে একটা লেখা আদায় করে ভারতীর কলেবর পুষ্ট করতে পারলে বেশ হয়—এই প্রয়োজন-বুদ্ধিতে মাত্র আমি তখন তাঁকে দেখেছিলুম।

আর একজন আমায় ইংরেজিতে মৌলিক প্রবন্ধ লিখে দিয়েছিলেন। তাঁকে ঠিক 'বিদেশী' বলতে পারিনে, অথচ আমাদের পক্ষে ঠিক বিদেশী-তুল্যই ছিলেন—হাইকোর্টের জজ হওয়া ব্যারিস্টার সৈয়দ আমীর আলি—যাঁর ইংরেজ পত্নীজাত পুত্রও এখন দ্বিতীয় জাস্টিস আমীর আলি। তিনি তাঁর "Spirit of Islam"এর এক কপি আমায় উপহার দিয়েছিলেন। হিন্দু-মুসলমান ঐক্য সম্বন্ধে আমার পক্ষপাতিতা তখন থেকেই প্রকট ছিল। একবার শ্রীশ সেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের "দেবালয়"-এর কোন অধিবেশনে আমায় একটি বক্তৃতা দিতে অনুরোধ করেন। আমি "হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য" সম্বন্ধে বলতে প্রস্তুত আছি বল্লুম—আর কোন বিষয়ে নয়। তাঁদের কমিটি তাতেই স্বীকৃত হলেন। হ্যারিসন রোডের 'মিত্র ইনস্টিটিউটে' বক্তৃতার স্থান নির্দিষ্ট হল। বলেছি, কোন সভায় নিজে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করা আমার বড় অস্বস্তিকর ঠেকত। সেবারও আমি নিজে গেলুম না, বক্তৃতা লিখে পাঠিয়ে দিলুম। শুনলুম, লোক ভেঙে পড়েছিল মিত্র ইনস্টিটিউটের হলে। কিন্তু আমি আসব না, শ্রীশবাবু আমার হয়ে বক্তৃতা পড়ে শোনাবেন জানতে পেরে ছেলের দল ক্ষেপে উঠেছিল—শ্রীশবাবুকে মারতেই বাকী রেখেছিল। হ্যান্ডবিলের দ্বারা আমি বক্তৃতা দেব ঘোষণা করায় মিথ্যাবাদী, প্রতারক প্রভৃতি বলে শ্রীশবাবুর প্রতি কোনরকম গালিবর্ষণের ত্রুটি করেনি তারা। পরের দিন শ্রীশবাবু এসে আমাকে হাতে-পায়ে ধরে অনুরোধ করলেন—আর একদিন মিটিং করতেই হবে এবং তাতে আমায় নিজে উপস্থিত হতেই হবে—নয়ত শ্রীশবাবুর মান থাকে না। আমি অগত্যা স্বীকার করলুম। এবার এলবার্ট হলে মিটিংয়ের

আয়োজন হল—জগদীশ বসু তার প্রেসিডেণ্ট, বিপিন পাল তাতে অন্যতম বক্তা। আমি গেলুম, নিজেই বক্তৃতা পড়ে শোনালুম। লোকে লোকারণ্য। মুসলমান শ্রোতাও অনেক।

বক্তৃতার সারমর্ম এই ছিল যে, ভারতবর্ষে আবহমানকাল নবাগতের সঙ্গে পুরানো বাসিন্দাদের স্বার্থ নিয়ে ঝগড়া চলে এসেছে—আর্য-অনার্যর যুগ থেকেই। যখন সেই এককালীন 'নব'রা পুরানো হয়ে যায়, বিদেশী আর থাকে না, দেশস্থ হয়ে যায়, দেশের পূর্বলোকদের সঙ্গে মিলে মিশে এক হয়, সমস্বার্থ হয়, তখন তাদের সন্তানেরা সবাই একই ভারত-মাতার সন্তানস্বরূপ নবতর অভিযাত্রীর বিরুদ্ধে একজোট হয়ে দাঁড়ায়। যেমন ইংলণ্ডের আদিম বাসীরা ব্রিটনের অ্যাঙ্গলস ও স্যাক্সনেরা ক্রমাগত বিদেশী অভিপ্লবে প্লাবিত হয়ে হয়ে, পরাহত হয়ে হয়ে ক্রমে মিলেমিশে ঐক্যসাধন করে, আজ এক ইংলিশ বা ব্রিটিশ জাতিতে পরিণত হয়েছে। অতীতে যা যা ঘটেছিল, তা বিস্মৃতির গর্ভে ডুবিয়ে দিয়ে অতীতের দ্বন্দ্ববিবাদ অনৈক্য মিটিয়ে আজ দম্ভভরে ঐকজাত্য অভিমানে গান গাইছে—"Britons never shall be slaves."

আর্য অনার্য, হূন-শক ও আর্য, রাজপুত পাঠান এবং পাঠান ও মোগলের যে দ্বন্দ্বধারায় ভারতের ইতিহাস-কলেবর গঠিত তারও শিক্ষা এই। স্বার্থগত একতাবুদ্ধিই সকল ঐক্যের মূল, সেই স্বার্থের বিরুদ্ধে যারা দাঁড়ায় তারাই বাকী সকলের শত্রু হয়। একসময় ভারতবাসী অনার্যদের শত্রু ছিল অভারতীয় আর্যরা। সেই আর্যেরা যখন ভারতসন্তান হয়ে গেলেন তাঁদের শত্রু হল ভারতসীমার বাইরে থেকে আসা তাঁদেরই এককালীন জ্ঞাতিগোত্র হূন-শকেরা। তারাও ভারতীয় হয়ে গেলে তাদের রক্তে আর্যদের রক্ত মিলিত হলে, তারাও আপন হয়ে গেল, আর পর রইল না। তখন পর হল আরও পরন্তন আগন্তুকেরা—নূতন মহম্মদীয় ধর্মাবলম্বীরা। এইবার বিরোধের শিকড়টা অনেক গভীরে প্রবেশ করলে। সেমিটিক আরবের বর্বর মূর্তি-পূজকদের মূর্তি সম্বন্ধে পরিকল্পনার সঙ্গে অসূক্ষ্মদৃষ্টিতে ভারতীয় আর্য ঋষিদের মূর্তিপূজাতত্ত্ব একই পর্যায়ে ফেলা হল, দুই একই নজরে দৃষ্ট হল। মূর্তিমাত্রকে মারমার কাটকাট করতে করতে এবার বিদেশীরা এসে হাজির হল। এবার শুধু খাদ্যান্বেষীরা এল না, তাদের পিছনে এল ধর্মধ্বজীরা—নিজের ধর্ম প্রচারই যাদের জীবিকা। এখন থেকে শুধু স্বার্থে স্বার্থে দ্বন্দ্ব বাধালে না, দেশস্থ ভারতীয়দের আত্মাভিমানে বিষম ঘা দিলে বিদেশীয়েরা। সেই ঘা

দেওয়াটা পুনঃ পুনঃ নানাভাবে চালাতে থাকল। ঘাতের প্রতিঘাতও চলল। এই বিদেশীয়দের সঙ্গে দেশস্থদের পূর্ববৎ "রুটি ও বেটি ব্যবহার" অসম্ভব হল। আর একটা ব্যাপার দেখা দিলে। বিদেশীরা ভারতের প্রতি প্রান্তে প্রান্তিক ভারতীয় ভাষা ব্যবহার করতে বাধ্য হলেও, তাদের ছেলে-মেয়ের মাতৃভাষা ভারতীয় হয়ে গেলেও—পঞ্জাবে পাঞ্জাবী, গুজরাটে গুজরাটী, মাদ্রাজে তামিলতেলেগুমলয়ালম্, ইউ-পিতে খিচুড়ি হিন্দী এবং বঙ্গদেশে বাঙলা—ছেলেদের নামকরণ আরবী, ফার্সি ভাষাতেই হতে থাকল। মুল্লাদের কৃপায় মাথা ন্যাড়া বৌদ্ধ, বাগদী, ডোম, মেথর, মুচি বা অন্যান্য ইতর জাতির বাঙ্গালীরাও নামের গৌরবে যেন আরব পারস্য বা তুরস্ক দেশ থেকে সদ্য চালান বলে প্রতীয়মান হতে লাগল। পৌত্তলিকতা-দ্বেষে হিন্দু দেবদেবীর অভিধা প্রথম প্রথম ব্রহ্মসমাজীরাও বর্জন করে ছেলেমেয়ের নামকরণপরায়ণ হয়েছিলেন, তাঁরা নানারকম কবিত্বরসে ভরা সুন্দর সুন্দর ভাব বা প্রাকৃতিক বস্তু খুঁজে খুঁজে নাম দিতে লাগলেন। কিন্তু খ্রীস্টান মিশনারীদের হাতে কনভার্ট হওয়া 'নেটিভ খ্রীস্টান'দের বিদেশীয় নামের আবরণের মত, মুল্লাদের হাতে কনভার্ট হওয়া "নেটিভ মুসলিম"দেরও নেটিভত্ব ঢাকা পড়তে লাগল বিদেশীয় নামের উত্তরীয়ে। সেটি খুলে ফেললেই তারা যে এদেশী নেটিভ, সেই এদেশী নেটিভ। এবার প্রধানত এই দুটি কারণে—নামগত ও ধর্মের আদর্শগত বা কৃষ্টির স্তরগত প্রভেদে আরবের মরুভূমিজাত অনেকগুলি প্রথা কনভার্ট মুসলমানেরা গ্রহণ করায় ভারতীয়দের শুচিজ্ঞানে খটকা দিলে। তেলেজলে মিশ খেলে না। দুদিকেই গোঁড়ামি পরস্পরের সঙ্গে ব্যবচ্ছেদ বাড়িয়ে দিলে। "সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ" —সুতরাং সেই গোঁড়ামিরূপ অর্ধটা ত্যাগ না করলে ভারতবাসীর আজ রক্ষা নেই। এই ছিল আমার সেদিনকার বক্তৃতার মূল কথা।

যে 'জিনা' আজ হিন্দুস্থানের বুকে বসে হিন্দুস্থানের মহা শত্রু হয়ে তার বুক চিরতে উদ্যত হয়েছেন—তাঁর নামই পরিচয় দিচ্ছে যে তিনি হিন্দুস্থানের বুকের সন্তান। 'জিনা' শব্দটি একটি গুজরাটি শব্দ, অর্থ তার 'ছোট্ট'। দুই-এক পুরুষ আগে থেকে যদি 'জিনা' শব্দটি এই পরিবারে পদবীস্বরূপ চলে এসে থাকে, তাতে দেখায় কনভার্ট হওয়া পরিবারের কর্তাটি মায়ের কোলে যখন শিশু ছিলেন—মা যখন তাঁকে 'জিনা' বলে 'আমার খুদু' 'আমার খোকন' বলে আদর করতেন, মুখে চুমু খেতেন, তখন থেকেই 'জিনা' নামটি লেগে গেছে এই পরিবারে—

বাঙলায় যেমন বাড়ির খোকা বড় হয়ে গেলেও পাড়াপড়শী সকলেই তাকে 'খোকা' বলেই ডাকে। গুজরাটি হিন্দু মা-বাপেরই এই খোকাটি, হিন্দুস্থানের ছেলেটিই আজ হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত, উদ্যত-আয়ুধ। এতে যে তাঁর কতদূর আত্মাবমাননা করা হচ্ছে, তা তিনি উপলব্ধি করছেন না কিসের প্রেরণায়, কিসের উত্তেজনায়? বলাৎ চালাচ্ছে তাঁকে কি? "কাম এষ ক্রোধ এষঃ!" নেতৃত্ব-কামনা, একটা দল গড়ে দলপতিত্ব কামনা। আমার হিন্দু-মুসলমান ঐক্যবাদে এ কথা ছিল না যে, কেউ কারো অন্যায় আবদার বরদাস্ত করে যাবে। গান্ধীর অহিংস অসহযোগে যেমন নেই ইংরেজ গবর্নমেণ্টের পতাকাতলায় থেকে প্রজাবংশের প্রতি রাজবংশের অন্যায় অসম-আচরণ সহ্য করা, বরঞ্চ অসহযোগের প্রতিষ্ঠাই হচ্ছে এই অন্যায়কারী গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে দাঁড়ানর জন্যে একটা উত্তেজনাময় কর্মপ্রেরণায়, চুপচাপ বসে থেকে সহ্য করার উপদেশ নয় সেটা।

যখন এক রাত্রিতে "ঔরঙ্গজেব" অভিনয়ের সময় হঠাৎ একদল বঙ্গীয় মুসলমান যুবক এসে পশ্চিমী গুণ্ডাদের দিয়ে মিনার্ভা থিয়েটার ঘেরাও করলে এবং অমর দত্ত স্টেজ ছেড়ে পিছনের দরজা দিয়ে পলাতক হলেন, তখন অমর দত্তের কাপুরুষতায় আমার ধিক্কার ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল ভারতীর পৃষ্ঠায়।

ময়মনসিংহে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেন্সের সম্পর্কে সুহৃদ সমিতি আমাকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যায় তাদের সাম্বৎসরিক উৎসবে। সেই সময় তাদের 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি কালে সমগ্র ভারতের জাতীয় ধ্বনিতে পরিণত হল, সে কথা আগে বলেছি। সেই সময় আমার সম্বর্ধনার জন্যে তারা যে যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল তার মধ্যে "আনন্দমঠ"-এর অভিনয় অন্যতম ছিল। প্রাদেশিক কনফারেন্সে সুরেন্দ্র বাড়ুয্যে প্রমুখ অনেক বড় বড় নেতারা সমাগত হয়েছিলেন, আমার পিতাও এসেছিলেন। আমি ও আমার পিতা স্যার টি পালিতের ভ্রাতুষ্পুত্র ব্যারিস্টার নৃপেন পালিতের বাড়িতে ছিলুম।

প্রথম দিন সুহৃদ সমিতির অধিবেশনে যখন নানাবিধ অস্ত্রক্রীড়ার প্রদর্শনী চলছে, আমি সভানেত্রীর আসনে আসীন রয়েছি, হঠাৎ কেদার চক্রবর্তী আমায় একটু উঠে অন্তরালে যেতে অনুরোধ করলেন। আমি গেলে বললেন,—"আপনার কাছে একটা বিষয়ে পরামর্শ নেওয়ার প্রয়োজন হয়েছে। আমরা আপনাকে দেখানর জন্যে "আনন্দমঠ" অভিনয়ের

আয়োজন করেছি। তাতে মুসলমান শ্রোতাদের ধর্মপ্রাণে আঘাত লাগার মত কথা যেখানে যেখানে আছে বলে সন্দেহ হয়েছে, তা আমরা নিজে হতেই বাদ দিয়েছি। তবু প্রাদেশিক কনফারেন্সের কর্তা-ব্যক্তিরা আমাদের বলে পাঠিয়েছেন—"এবার কলকাতা থেকে অনেক কষ্ট করে কয়েকটি মুসলমান বন্ধুদের যোগাড় করে এনেছেন সুরেন্দ্রবাবু কন-ফারেন্সে যোগ দিতে। তোমরা ময়মনসিংহের হিন্দু ছেলেরা যদি এই সময় 'আনন্দমঠ' কর তারা থাকবে না বলছে, কনফারেন্সে যোগ দেবে না, কলকাতায় ফিরে যাবে। সুতরাং তোমাদের 'প্লে' বন্ধ কর, আমাদের সিরিয়স কাজে বাধা দিও না।" দুই-একটি সহকর্মী সহ কেদার চক্রবর্তী কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে আমায় বললেন—"আপনি উপদেশ দিন, আমরা কি করি এস্থলে।"

আমি বললুম—"লীডারদের ডেকে তাঁদের সামনে রিহার্সাল করে দেখাও। তাঁদের মতে তোমাদের অলক্ষ্যে এখনো যদি আপত্তিকর কোন ভাষা কোন শব্দ প্রয়োগ থেকে গিয়ে থাকে ওর ভিতর তা ছেঁটে দাও।"

তারা বললে—"সে প্রস্তাব করেছি আমরা। তাতে তাঁরা সন্তুষ্ট নন। তাঁরা বলেন—অংশবিশেষ ছাঁটলে, শুধু দুচারটে কথা বা সেণ্টেন্স ছাঁটলে হবে না, মুসলমানদের ও বইখানার আগাগোড়াতেই আপত্তি। সুতরাং ন্যায় হোক অন্যায় হোক তাদের আপত্তি এস্থলে মানতেই হবে, ময়মন-সিংহে এখন ওর অভিনয় বন্ধ রাখতেই হবে।"

আমি শুনে বললুম—"বল কি? সুরেনবাবুর অনুগামী চেলাদের এই কথা? যে সুরেন্দ্রনাথের motto হচ্ছে 'Surrender not!' আমারও সেই motto—অন্যায় আবদারের কাছে ভয়বশে surrender কোরো না। আমার উপদেশ এই—অভিনয় তোমাদের জারী রাখ। এ স্থলে তোমাদের কর্তব্যই তাই।"

তার পরদিন সকালে গৃহস্বামী নৃপেন পালিত আমার কাছে এসে জানালেন—"অনাথ গুহ প্রভৃতি এখানকার পোলিটিকাল লীডাররা, ও শহরের বড় বড় মাতব্বর ব্যক্তিরা সবাই আপনার কাছে ডেপুটেশনে এসেছেন।" আমার মতো বয়ঃকনিষ্ঠের কাছে পিতৃতুল্য বয়োজ্যেষ্ঠদের ডেপুটেশনে আসা কি কারণে? আমি কৌতূহলী হয়ে তাঁদের কাছে গেলুম। আমার পিতাও সেখানে উপস্থিত। আমি যেতে তাঁদের মুখপাত্র-রূপে অনাথবাবু বললেন—"আপনার কাছে আমাদের একটি বিনীত

অনুরোধ আছে।” আমি লজ্জিত হয়ে বললুম—“সে কি? কিসের অনুরোধ?”

তিনি বললেন—“সুহৃদ সমিতির ছেলেরা 'আনন্দমঠ' অভিনয় করতে যাচ্ছে, আপনি সেটি বন্ধ করে দিন।”

“সুহৃদ সমিতির ছেলেরা ত আপনাদেরই শহরের ছেলে, আপনাদেরই কর্তৃত্ব তাদের উপর। আমি ত একদিনের অতিথি অভ্যাগত। আমার কথার চেয়ে আপনাদের কথারই ত বেশী জোর হবে তাদের উপর। আপনারাই বলুন না, আপনারাই তাদের আদেশ করুন না অভিনয় বন্ধ করতে।”

হেমন্ত বসু নামক ব্যারিস্টার—ডাক্তার ধর্মদাস বসুর পুত্র ও রজনী রায়ের জামাতা—উষ্ম হয়ে বলে উঠলেন—“ওসব চালাকির কথা রেখে দিন। আপনি বেশ জানেন, তারা আমাদের কথা শুনবে না, আপনার ইঙ্গিতেই চলবে।”

“তাই যদি সত্যই হয়, তাহলে তাদের বারণ করবার আগে আমি নিজে বুঝে নিই বারণ করার কারণটি কি?”

“বারণ করার কারণ মুসলমানদের আপত্তি। ঐ বইখানার অভিনয় হলে মুসলমানরা আমাদের ত্যাগ করবে, কনফারেন্সে ঢুকবে না, সুরেনবাবু অনেক সাধ্য সাধনা করে রেলভাড়া দিয়ে তাদের এনেছেন। তাঁর সব পরিশ্রম পন্ড হবে।”

“বইখানা যদি নির্দোষ করে অভিনয় করা হয়, তবুও?”

“হ্যাঁ, তবুও।”

“এটা কি ঠিক? তাদের কনফারেন্সে যোগ দেওয়ানর জন্যে তাদের প্রত্যেক অন্যায় আবদারটাও মেনে চলতে হবে কি? তাহলে আবদারের আর শেষ থাকবে কি কোনদিন? তার চেয়ে তাদেরই অনুরোধ করুন না রিহার্সাল দেখুন, যেখানে যেখানে বর্জনীয় মনে করেন—বলুন, ছেলেরা নিশ্চয় তাতে আপত্তি করবে না।”

হেমন্তবাবু গর্জে উঠলেন—“তা হবে না। ও অভিনয়টাই সুহৃদ সমিতির প্রোগ্রাম থেকে সম্পূর্ণরূপে বাদ দিতে হবে।”

“ছেলেরা যদি রাজী না হয় তাতে?”

“তাহলে রক্তের স্রোত বইবে—খুনোখুনি হবে।”

“তাই যদি হয়, এই ডরাও যদি দেয় আপনাদের মুসলমান বন্ধুরা, আমি সুহৃদ সমিতির ছেলেদের বলব—“ডোরো না, অন্যায়ের পায়ে মাথা নত কোরো না, বহুক রক্ত—লড়, মরতে হয় মর।”

ডেপুটেশনের লীডাররা, মাতব্বর মৈমনসিংহবাসীরা কন্যার দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় আমার পিতা অপ্রতিভ হয়ে বলতে লাগলেন—"ও পাগলী, ওর কথা ধরবেন না।"

হেমন্ত বসু গর্জাতে গর্জাতে ও অনাথ গুহ প্রমুখ বাকী সকলে মিষ্ট হাসি হেসে আমায় নমস্কার করতে করতে চলে গেলেন। কিন্তু ব্যারিস্টার হেমন্ত বসুরই জয় হল। তিনি তখুনি তাঁর বন্ধু পুলিস সাহেবের কাছে গিয়ে একটা 'Breach of the peace'-এর সম্ভাবনা হবে জানিয়ে পুলিসের হুকুম পাঠিয়ে অভিনয় বন্ধ করালেন এবং জয়গর্বে স্ফীত হলেন। অনাথবাবু কিন্তু সেই পর্যন্ত আমার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা-সম্পন্ন ও আমার নানাকার্যে সাহায্যদাতা হলেন।

এইখানে একটা কথা বলি। আমি যে বাড়িতে ছেলেদের ক্লাবখোলা, তাদের হাতে লাঠি-ছোরা ধরান, ধুমধামে বীরাষ্টমীর উৎসব করা প্রভৃতি নানা কারখানা চালাচ্ছিলুম, তাতে আমার বাবা-মা-রা কি বলতেন? কিছু না—কোন বাধাই দিতেন না। তাঁদের মৌন সম্মতিই আমার পশ্চাতে বল ছিল—না হলে এসব কাজে এক পা-ও অগ্রসর হতে পারতুম না।

॥ চব্বিশ ॥

সমাজ—পারিবারিক, বান্ধবিক ও সাধর্ম্যিক
তিলক মহারাজা

মানুষের জন্মগত সমাজ হয় পারিবারিক, বন্ধু বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে একটা বান্ধবিক সমাজ তাকে ঘেরে, এবং একই ধর্মসম্প্রদায়গত সমাজও তার আর একটি স্বতন্ত্র থাকে। ছেলেবেলায় আমাদের সমাজ ছিল যোড়া-সাঁকোর পরিবারের মধ্যে আবদ্ধ। আমাদের মেলামেশা, খাওয়া-দাওয়া, উৎসব ও শোকে সম্মিলন ছিল শুধু আপনা-আপনির মধ্যে। কাশিয়া-বাগানে এসে, থিয়সফি ও সখি-সমিতির দরুন বাইরের অনেক পরিবারের মেয়েদের সঙ্গে মায়ের বন্ধুতা হওয়ায় মেলামেশার সমাজটা বড় হতে লাগল কিন্তু সে মেলামেশাটা অনেকটা উপর উপর। হিন্দুসমাজের প্রকৃতিই হচ্ছে নিজেদের বৈবাহিক গণ্ডীর মধ্যে নিবদ্ধ থাকা। যাদের সঙ্গে

বৈবাহিক সম্বন্ধ হতেই পারে না তাদের সঙ্গে হাজার মনের মিল হলেও দুধের উপর সরের মত একটা পাৎলা পার্থক্যের স্তর সদাই বর্তমান থাকে —সেটা বোধ হয় জাতিভেদগত স্তর। যে সকল গোঁড়া হিন্দু-বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে আমাদের ভাবসাব হল, তাঁদের গৃহে সবরকম শুভকার্যে আমরা যেতে থাকলুম বটে, কিন্তু তাঁদের অধিকাংশই কায়স্থ হওয়ায় একটু বাইরের লোকের মতই যেতুম। সে বাইরের ভাব ঘুচে গেল 'ইঙ্গ-বঙ্গ" সমাজ বলে একটি সমাজ গড়ে উঠলে এবং আমরা তার অন্তর্ভুক্ত হলে। তাতে যেন পারিবারিক পরিধিটাই বেড়ে গেল। এই সমাজ প্রধানতঃ সাধারণ ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী সমাজ, তাঁদের মধ্যে যাঁরা আঢ্য ও বিলাত প্রত্যাগত তাঁদের সমাজ—দুচারটি খ্রীস্টানও তাতে ছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মদের নিজস্ব সাধর্ম্যিক একটি সমাজও ছিল, যাতে সব অবস্থার ব্রাহ্ম-ব্রাহ্মিকারা ও তাঁদের পুত্রকন্যারা সামিল ছিলেন। আমাদের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক ছিল না। এই ধর্মগত পরিবারের চিত্র ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের কন্যাদের গৃহে ও ব্যবহারে অত্যুজ্জ্বল দেখেছি। কলুটোলা বা গোরফের বৈদ্য আত্মীয়রাই শুধু তাঁদের নিজস্ব আত্মীয় ছিলেন না, নববিধান সমাজের প্রচারকমাত্রের, কেশবচন্দ্রের ভক্তমাত্রের পরিবার যেন তাঁদের অন্তরঙ্গ আপন পরিবারস্থ লোক ছিলেন। কুচবিহারের মহারাণী সুনীতি দেবী বা মোরভঞ্জের মহারাণী সুচারু দেবীর সঙ্গে নববিধানী সর্বসাধারণ মেয়েদের নিশ্চয়ই পার্থক্য ছিল. কিন্তু তাঁরা সেটা তাঁদের স্বভাবসিদ্ধ বিনয়ে ও ভদ্রতায় ঢাকবারই চেষ্টা করতেন, তাদের অনুভব করতে দিতেন না।

এই ধার্মিক এক-পরিবারত্বের অভিজ্ঞতা মহর্ষির পরিবারে আমাদের ছিল না। কারণ ৬নং যোড়াসাঁকোর বাইরে যাঁরা আদি ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন—তাঁরা শুধু সমাজে যেতেন আসতেন, উপাসনায় যোগদান করতেন ও ব্রহ্মসঙ্গীত শুনে তৃপ্ত হয়ে বাড়ি ফিরে যেতেন। মহর্ষির পরিবারের সঙ্গে তাঁদের পরিবারের মিলন করাতে সঙ্কুচিত হতেন, অন্তত কোনদিন করাননি। তার একটা কারণ বোধ হয় তাঁরা পুরুষেরা বাইরে এসে নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা করলেও, তাঁদের বাড়ির ভিতরে মেয়েদের দরুনই কোন রকম পুরানো আচার অনুষ্ঠানের পরিবর্তন হয়নি। তাই আমাদের সাধর্ম্যিক সমাজ বলে কিছু ছিল না।

ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজে আমরা অল্পে অল্পে গ্রস্ত হলুম—বিশেষ করে কাশিয়াবাগান ছেড়ে যখন বালিগঞ্জে উঠে এলুম। নিজ বালিগঞ্জে তখন

বেশী ঘর বাসিন্দা ছিলেন না—তখন ঘরবাড়ি সেখানে বেশি ছিল না, শুধু বড় বড় বাগান ও জমি ছিল। তার অধিকাংশের মালিক ছিলেন টি পালিত। তিনিই লোক বসাতে লাগলেন, আবাদ করতে লাগলেন বালিগঞ্জে—নিজের বাগান টুকরো করে করে বেচে বন্ধু-বান্ধবের কাছে। আমরা কাশিয়াবাগান থেকে যে ২৬নং বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে উঠে এসেছিলুম—সেটা যদু মল্লিকের সম্পত্তি ছিল—পরে ৩নং সানি পার্কে আমাদের নিজের বাড়ি হল। ৬নং সানি পার্কে আশু চৌধুরী বাড়ি করলেন, ১৯নং স্টোর রোডের উপর তৈরি পুরানো বাড়ি মেজ মামা কিনলেন—কে জি গুপ্ত ৬নং স্টোর রোডে বাড়ি করলেন, ইন্দিরার বিয়ে হলে প্রথম প্রথম ১৪নং বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে রইল, পরে ব্রাইট স্ট্রীটে নিজের বাড়িতে গেল। দিদি প্রথমে ঝাউতলা রোডে বাড়ি করলেন, পরে হাজরা রোডে এলেন। এই রকমে বালিগঞ্জ ময়দানের আশেপাশে ও কাছাকাছি আমাদের আত্মীয় ও বন্ধুবর্গের একটি বৃহৎ কলোনি স্থাপিত হল। ইঙ্গ-বঙ্গ বন্ধুদের সবাই প্রায় পূর্ববঙ্গের লোক। তাঁদের সকালে বাঙ্গাল দেশীয় ব্যঞ্জনসহ ভাত খাওয়া ছাড়া আর সব বিষয়ে পুরো সাহেবিয়ানার সঙ্গে চাক্ষুষ হল। তাই দেখে আমার প্রাণ তাঁদের ভিতর কতক পরিমাণে স্বদেশীয়তা ঢোকাবার জন্যে পথ খুঁজে নিলে। কপালে টিপ পরা, পায়ে আলতা পরা ত ধরালুমই—তার উপর বাঙলার দেশীয় পালপার্বণগুলিকে সাহেবী রূপ দিয়ে এঁদের গ্রহণোপযোগী করলুম। শ্রীপঞ্চমীর দিন নিমন্ত্রণ পত্রের উপর পৃষ্ঠায়—"বসন্তোৎসব" লিখে ভিতর পৃষ্ঠায় চা খাওয়ার নিমন্ত্রণ করলুম। তার ফুটনোটে এক লাইন টোকা রইল—"মেয়েদের বাসন্তী রঙের শাড়ি বা ব্লাউজ ও পুরুষদের পরিচ্ছদের কোথাও না কোথাও একটুখানি বাসন্তী রঙের আভাস ধারণ বাঞ্ছনীয়।" মেয়েরা ত বাসন্তী রঙের সুন্দর সুন্দর শাড়ি-জামা পরে এলেনই—পুরুষরাও এলেন ধুতি-চাদরের সঙ্গে ফিকে বাসন্তী রঙের পাঞ্জাবী পরিধান করে, এবং যাঁরা কোটপ্যাণ্ট পরে এলেন তাঁরাও কণ্ঠে বাসন্তী রঙের নেকটাই ধারণ করলেন বা বাদামী রঙের রেশমী রুমাল তাঁদের বুক পকেট থেকে উঁকি মারতে লাগল। সন্ধ্যে হলে ঘরের ভিতর এসে গান-বাজনা হতে লাগল। আমার

"হে সুন্দর বসন্ত বারেক ফিরাও
আজি মধুর অতীত কাল"

গান এই উপলক্ষে রচিত হয়ে প্রথমে গীত হল।

তারপর পূর্ববঙ্গের মেয়েরা যে অনেকেই সুন্দর মিষ্টান্ন তৈরি করতে পারেন তার পরিচয় পেয়েছিলুম। সেটা জাতীয়ভাবে কাজে লাগাবার চেষ্টা করলুম—"পৌষপার্বণ"-এর নিমন্ত্রণ পত্র পাঠিয়ে। অনেকগুলি মেয়েকে আমাদের বাড়িতে সকালেই আমন্ত্রণ করলুম বাড়িতে এসে সকলে মিলে নানারকম পিঠেপুলি, পাটিসাপটা, সরুচাকলি প্রভৃতি তৈরি করতে। একটা রীতিমত যজ্ঞিবাড়ি বসে গেল যেন। মধ্যাহ্নে সবাই একত্রে মিলে খিচুড়ি খেয়ে আবার তাড়াতাড়ি পিঠে গড়তে লেগে গেল। কাজ শেষ হলে তবে খানিকটা বিশ্রাম করে, অপরাহ্ণে মুখ-হাত ধুয়ে, সঙ্গে আনা ভাল কাপড় পরে ফিটফাট হয়ে মাঠে নিমন্ত্রিতদের সঙ্গে মিলিত হল। তাদের বাড়ি থেকে মা-বাপ ও অন্যান্য বোন-ভাইরাও ততক্ষণ এসেছেন।

আর একবার 'নবান্ন'র নিমন্ত্রণ করলুম। চায়ের পেয়ালায় প্রথমে এক এক পেয়ালা নবান্ন দেওয়া হল, তারপরে চা ও তার আনুষঙ্গিক সব কিছু এল।

এই সময় ছেলেমেয়েদের একটি মিশ্র সঙ্গীত ক্লাবও খুলেছিলাম—আমাদের বাড়িতেই—ইংরেজী ও দেশী উভয়বিধ সঙ্গীতাভিজ্ঞদের সঙ্গীত-চর্চার জন্যে। এতে অতুলপ্রসাদ ও তাঁর বোনেরা সবাই ছিলেন। তাদের মুখে ও অতুলের নিজের মুখে তাঁর গান প্রথম শোনার সুযোগ হল। 'উঠগো ভারতলক্ষ্মী' সার্কাসে শোনা একটি ইতালীয় সুরে বসান। বাঙ্গলা কথায় সুরটি ভারি খাপ খেয়েছে। আরও কতকগুলি প্রেমের গানের কথায় ও সুরে মুগ্ধ হলুম। তার মধ্যে আজও বিশেষ করে মনে পড়ে—

"আজি স্বরগ আবাস তুমি এসো ছাড়ি।
আজি বরষে বরষা বিরহ বারি!
আজি ফুলে নাহিক মধুগন্ধ,
মলয়ে নাহিক মৃদু মন্দ,
জীবনে নাহিক গীত ছন্দ
তোমারে ছাড়ি।"

তাঁর যে যে গান তখন শুনেছিলাম সবগুলির স্বরলিপিই "শতগানে" আছে।

ক্লাব থেকে মধ্যে মধ্যে একটি করে কন্সার্ট হত—তাতে বাইরের সকলকে নিমন্ত্রণ করা হত! শেষ কন্সার্ট হয়েছিল দিদির আয়োজনে

খুব ধুমধাম করে আমার একটা জন্মদিনে। এ-ক্লাব চলল ততদিন, যতদিন মেয়ে মেম্বররা একে একে প্রজাপতির নির্বন্ধে দূরে সরে না পড়লেন।

সাহিত্য ও সঙ্গীতের ভিতর দিয়ে প্রজাপতির বার্তা নিয়ে আমারও কাছে তাঁর দূত দুই-একবার উঁকি-ঝুঁকি মেরেছিল—কিন্তু বিধাতার দূত তাকে বিদায় করে দিলে—"এখনো সময় আসেনি" বলে। বিধাতার বিধান-পাশ হাতে নিয়ে সময় এল কয়েক বছর পরে পঞ্চনদের কূল হতে এবং আমায় বন্ধনে বাঁধলে।

"হিন্দু-মুসলমান"এর উপর বক্তৃতাটি ভারতীতে বেরয় এবং ইংরেজীতে ভাষান্তরিত হয়ে এলাহাবাদের "Hindusthan Review"তে দেখা দেয়। তাছাড়া "কংগ্রেস রিপাব্লিক" বলে ভারতীতে লেখা আমার আর একটি বাঙলা প্রবন্ধও "Hindusthan Review"তে ইংরেজীতে প্রকাশিত হয়। এই দুটি প্রবন্ধ ভারতের উত্তর-পশ্চিমবাসী অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। লালা লাজপৎ রায় সেই সময় একবার বাঙলা দেশে আসেন। প্রবন্ধ দুটি পড়ে ও যোগেশ চৌধুরীর কাছে "বীরাষ্টমী" প্রভৃতির কথা শুনে তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। আমি বাড়ি ছিলুম না। শুনলুম. এত আগ্রহ ছিল তাঁর—দু-তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করে বসে ছিলেন। কিন্তু সেদিন আমার ফিরতে অনেক দেরী হওয়ায় অবশেষে চলে যান। পরের দিন আবার আসেন। এবার আমার সঙ্গে দেখা হল ও অনেকক্ষণ ধরে অনেক কথাবার্তা হল। তিনি জিজ্ঞেস করায় দেশকে স্বাধীন করার জন্যে আমি আমার প্ল্যান ব্যক্ত করলুম, তিনিও তাঁর প্ল্যান কতকটা বললেন। মিলে গেল অনেক, দুজনেরই মতে পেতে হবে—Victory from within or mighty death from without.

"আত্মনৈব আত্মানং জয়তে
আত্মৈব রিপুরাত্মনাং।"

ইতিমধ্যে বরোদা থেকে অরবিন্দ ঘোষের চিঠি নিয়ে আমার কাছে এলেন যতীন বাঁড়ুয্যে। অরবিন্দের দাদা অক্সফোর্ড-খ্যাত কবি মনোমোহন ঘোষ আমার খুব বন্ধু হয়েছিলেন। তাঁর অতি সুন্দর সুন্দর কবিত্বরসপূর্ণ চিঠিতে আমার ডেস্ক ভরে গিয়েছিল। দুই ভাই-ই প্রকৃতিগত 'visionary' ছিলেন। একজনের vision বা স্বপ্ন কাব্যেই পর্যবসিত ছিল, আর একজনের vision কার্যে অনূদিত হল। যতীন বাঁড়ুয্যে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষার জন্যে বরোদা সৈন্যে ভর্তি হওয়া একজন

সামান্য সৈনিক। আমি তাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করতে লাগলুম। সেও আমার খুব অনুগত হল। বারীন ঘোষের নেতৃত্বে প্রকাশ্যে সাইন-বোর্ড টাঙ্গিয়ে কলকাতার এক পাড়ায় ভারত-উদ্ধার দল স্থাপিত হল। যতীন বাঁড়ুয্যে তার একজন প্রধান কর্মকর্তা—সেখানেই খায়-দায়, থাকে, আর যারা দলে আসে তাদের কসরৎ ও ড্রিল করায় এবং ঘোড়ায়-চড়া শেখায়। ঘোড়ায় চড়তে জানাটা বরোদার একটা বিশেষত্ব। রাজপ্রাসাদের অঙ্গনে মহারাণী চিম্নাবাঈকে আমি দেখেছি, একজন শিখ সর্দারের সাহায্যে ঘোড়ার পিঠে চড়ে ঘোড়াকে কাবু করা অভ্যেস করতে। যতীন বাঁড়ুয্যে তাদের দলের ছেলেদের উপরে বর্ণিত যা কিছু শেখাত, তাতে আমার অনুমোদন ছিল। খালি আমার মতভেদ হল যখন শুনলুম, তাদের দল থেকে ডাকাতি চালানর হুকুম বেরিয়েছে। এ বিষয়ে নাকি নিবেদিতার সঙ্গে তাদের দলের সম্পূর্ণ ঐকমত্য ছিল। নিবেদিতা বলতেন বটে, ব্রিটিশ-শাসনে দেশ থেকে চোর-ডাকাতের ভয় লুপ্ত হয়ে দেশব্যাপী শান্তি বিস্তারটাই হল এদেশের পুরুষদের পৌরুষ ধ্বংসের কারণ; কতকটা অশান্তি না থাকলে পৌরুষ জাগ্রত হয় না, সেইজন্যে ডাকাত থাকার দরকার। ওখানে যা কিছু পরামর্শাদি হত, যতীন বাঁড়ুয্যে আমাকে জানাত। একদিন বললে—“কাল ভোর রাত্রে একদল লোক ডায়মণ্ড হার্বারের কাছে একটা বুড়ির বাড়ি গিয়ে তাকে মেরে মাটির নীচে পোঁতা তার অগাধ ধন নিয়ে আসবে। বুড়ির কেউ নেই।”

আমি শুনে বললুম—“অতি চমৎকার কথা! এক অসহায় বুড়িকে মেরে তার ধন নেবে তোমরা! বাহবা! কত পৌরুষ!—এ রক্ত-কলুষিত ধন নিয়ে করবে কি তোমরা?”

“দেশের কাজ করব।”

“দেশমাতা কি তোমাদের এই মলিন হাতের কাজ গ্রহণ করবেন? তাঁর একটি নিঃসহায় নিরপরাধিনী বৃদ্ধা সন্তানের হনন তাঁর সইবে?”

“নিশ্চয়ই! তিলক মহারাজের এই আদেশ।”

“আমি কিছুতেই তা বিশ্বাস করতে পারিনে—যতক্ষণ না তাঁর নিজের মুখে শুনি। আমি যাব তাঁর কাছে, তাঁকে জিজ্ঞেস করব। যতদিন না আমি ফিরি, ততদিন পর্যন্ত এ হত্যা তোমরা স্থগিত রাখবে—আমাকে কথা দাও।”

“আচ্ছা তাই হবে।”

আমি দুই-একদিনের মধ্যে পুণায় গিয়ে তিলকের সঙ্গে দেখা করার

আয়োজন করলুম। আমার পূর্বোক্ত বন্ধু ডেপুটি একাউণ্ট্যাণ্ট-জেনারেল মিস্টার হায়দরী ছুটীতে বম্বে যাচ্ছিলেন, আমি তাঁর সঙ্গে বম্বে বেড়াতে যাব বললুম তাঁকে। তাঁকে জানালুম পথে পুণায় নামব আমি দুই-একদিনের জন্যে, সেখানে দু-একটি বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে বম্বেতে আসব।

পুণা এলফিনস্টোন কলেজের ভূতপূর্ব প্রফেসর আধ-পাগলা বৃদ্ধ গোবিন্দ কড়কড়ে আমাদের বহু পুরাতন পারিবারিক বন্ধু। তাঁকে টেলিগ্রাম করে দিলুম আমি আসছি। তিনি স্টেশনে আমায় নিতে এলেন। তিনি থাকেন খড়কি ছাউনিতে। খড়কি যেতে পথে মুলা ও মুঠা দুই নদীর সঙ্গম দেখা যায়। এই সঙ্গমের একটি বাংলোতে যখন মেজ-মামা থাকতেন প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্বে, তখন আমার দাদা জ্যোৎস্না-নাথের জন্ম হয় সেখানে, সুরেনের জন্মও তার এক বছর পরে এই সঙ্গমের ধারে। তাই দাদা ও সুরেন দুজনকেই "পুণা-ব্রাহ্মণ" বলি আমরা।

গোবিন্দ কড়কড়ের বাড়িতে পেঁছে স্নানাহার সমাপন করে তাঁকে বললুম—"মারহাট্টা পত্রের সম্পাদক এন সি কেলকার আমার বন্ধু। তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করতে যাব।" অপরাহ্নে গোবিন্দের ফিটন গাড়িতে কেলকারের বাড়ি পেঁছিলুম। তাঁকে বললুম—"তিলকের সঙ্গে আমার দেখা হওয়া একান্ত দরকার। তার বন্দোবস্ত করুন। তাঁর বাড়ি আমি যাব না, আপনার বাড়িতে তাঁকে ও আমাকে দুজনকেই আগামীকাল খেতে নিমন্ত্রণ করুন।" তিনি তাই করলেন। তখন তিলকের নামে তায়ি মহারাজ সংক্রান্ত ফৌজদারী মকদ্দমা চলছে। তাঁর বাড়ির মধ্যে, আশেপাশে—ডিটেকটিভ গিজগিজ করছে, তাঁর সঙ্গে সেখানে কথাবার্তা কওয়া একেবারে নিরাপদ নয়। তিলকের সঙ্গে যে দেখা করতে আসে, তারই উপর পুলিসের নজর পড়ে ও তার গতিবিধি বাধাসংকুল হয়।

পরদিন কেলকারের বাড়ি মধ্যাহ্ন ভোজনে তিলক মহারাজের সঙ্গে দেখা। তাঁর সে সময় এক মুহূর্তের অবসর নেই। নিজের ডিফেন্স নিজে প্রস্তুত করছেন। কেলকারের বাড়িতেও রাশীকৃত আইনের বই ও অন্যান্য কাগজপত্র সঙ্গে করে এনেছেন। আমার সঙ্গে তাঁর আগে কখনও দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি, এই প্রথম দেখা। চেহারায় একটা বলশালিত্বের ও একটা অটল দৃঢ়তার ছাপ। গোখলের চেহারায় যে কোমলতা ছিল, তা নেই। যেন একটি সজীব দৃঢ় বলস্তম্ভ বসে আছেন আইনের বই ও নথিপত্র

ঘেরাও হয়ে। কেলকারের কাছে আমার কথা শুনবামাত্র তিনি তাঁর এত কাজ সত্ত্বেও এসেছেন।

আমার সমস্যা আমি তাঁকে বললুম—শেষে প্রশ্ন করলুম—"আপনি কি যুবকদের ডাকাতির অনুমোদন করেন?"

খুব জোর দিয়ে বললেন—"একেবারেই না। এ বিষয়ে ধর্মের দিক থেকে দুর্নীতি-সুনীতির কথা না তুলে শুধু রাজনৈতিক দিক থেকেই বলছি, পুণা-যুবকদের ডাকাতির অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি—এ-কাজ একেবারে নিরর্থক, নিষ্ফল। ধরা পড়বেই। আর দেশের লোককে খুন করে টাকা সংগ্রহ করতে গিয়ে দেশের লোককেই নিজেদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলবে। আমার এ বিষয়ে অনুমোদন একেবারে নেই—আপনি মুক্তস্বরে সেখানে গিয়ে এ-কথা ঘোষণা করতে পারেন। যারা আমার নাম নিয়ে এ আদেশ প্রচার করছে তারা ঠায় মিথ্যে কথা বলছে।"

আমি তাঁর কথায় আশাতীত আনন্দলাভ করলুম। সেই পর্যন্ত তিনি আমার পূজ্য হলেন। নেতার মতন নেতা বটে। হাল্কা মনে কেলকারের আয়োজিত ভোজ্যবস্তুর 'বাসুন্দি' ও 'শ্রীখণ্ডে'র প্রতি বিশেষ করে অবহিত হলুম। তারপর বম্বেতে আট-দশ দিন কাটাতে গেলুম।

সে সময় পুণায় একলা একলা গিয়ে তিলকের সম্মুখীন হওয়ার জন্যে একজন নিঃসঙ্গী বাঙালী মেয়েকে যে কতটা সাহস বুকে বাঁধতে হয়েছিল, তা কেউ অনুমান করতে পারছেন কি না জানিনে। যাহোক আমার যাত্রা সফল হল, সাহস সার্থক হল, এই আনন্দে পূর্ণ হয়ে আমি বাড়ি ফিরলুম ও যতীন বাঁড়ুয্যেদের সঙ্কল্পিত ক্রিয়ার প্রতিরোধ করলুম।

॥ পঁচিশ ॥

তৃতীয় পর্যায়

বিবাহ

কোন মানুষের জীবনের প্যাটার্ন কোন আর একটা জীবনের সঙ্গে এক নয়। বিধাতার যে তিনটি কন্যার উপর জীবনবয়নের ভার দেওয়া আছে,

তাঁদের হাতে মাকুর ফেরফারে এ জীবনে সে জীবনে নব নব প্যাটার্ন ফুটতেই আছে। প্রত্যেকটিতে স্বভাবগত ও ঘটনাগত সূক্ষ্ম ইতরবিশেষ ও বৈচিত্র্য দেখা দেবেই। অচেতন মেশিনের মুখ থেকে বেরন অবিকল একই রকমের রাশি রাশি বস্তুর মত প্রাণের রসময় আদিশিল্পীর বুক থেকে বেরন জীবননামীয় শিল্পখণ্ডগুলির ভিতর একঘেঁয়েত্ব একেবারে নেই। বাইরে থেকেই দেখতে পাওয়া যায় মানুষের কররেখায়, পদরেখায়, আঙুলের ডগার অনন্ত বিভিন্নতায় জীবনসমূহের অন্তহীন বৈচিত্র্য চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। কোন মানুষের সঙ্গে কোন আর একজন মানুষের অক্ষরে অক্ষরে, পদে পদে, সেণ্টেন্সে সেণ্টেন্সে বা সূচির ক্ষেপে ক্ষেপে মিল নেই। কেউ কারো অবিকল নকল নয়। এক জাতীয় বলে দেখতে অনেকটা এক হলেও প্রত্যেকেরই স্বাতন্ত্র্য আছে। যেখানে স্বাতন্ত্র্য বা অভিনবতা খুব ডবডবে সেখানেই সকলের দৃষ্টি সহজে আকর্ষণ করে, নয়ত সাধারণ বলে দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। জীবনখানার বুনোনি আরম্ভ হয় মাতৃগর্ভে থাকতেই, শেষ হয় জীবনলীলাবসানে। আমার জীবনের প্যার্টানখানা দিনের পর দিন, বছরের পর বছর নানা ফুলপাতা কেটে কেটে দেখা দিতে লাগল। সে আস্তরণখানি যাঁর চরণের আসন তিনিই তার বিরচক হয়ে চলবেন। তাঁর হাতের মাকু হঠাৎ বাঙলা দেশ থেকে ছুটে গেল দূরে সুদূরে—পঞ্চনদের কূলে, সেখান থেকে টানা-পোড়েনের খেলা চালাতে লাগলেন।

আমি গিয়েছিলুম তখন হিমালয়ের উপর স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত মায়াবতী আশ্রমে। সেখানে দেখলুম সেই "অম্বর চুম্বিত ভাল হিমাচল" ভারতবর্ষকে আমার, সেই "শুভ্র তুষার কিরীটিনী" মাকে আমার। আহা কি সুন্দরী! চোখের সামনে ঝকঝক ঝকমক করছে কেদার ও বদ্রিনারায়ণের শৃঙ্গ। এই তুষার প্রাচীরের ওপারে অন্যান্য বর্ষ, অন্যান্য সভ্যতা; এপারে চিরসনাতন ভারতবর্ষ ও ভারত সভ্যতা, যা বেদমন্ত্রে মুখরিত হয়ে ভারতের গগন আচ্ছন্ন করেছিল, ঐ পর্বতমালার কন্দরে কন্দরে আজও কি তার প্রতিধ্বনি গুঞ্জরিত হচ্ছে না? ঐ উপত্যকা-ক্রোড়োত্থিত মেঘপুঞ্জ চিরঞ্জীব ঋষিদের হোমাগ্নিধূমে কি আজও ধূমায়িত নয়?

আমি এখানে বিবেকানন্দের গুরু-ভ্রাতা স্বামী তুরীয়ানন্দের নিকট প্রতিদিন উপনিষদ অধ্যয়নে ব্যাপৃত হলুম। ভগবদ্গীতার সঙ্গে পরিচয়সাধনও এখানে আরম্ভ হল। রাত্রে কোন কোনদিন যাজ্ঞবল্ক্য ও

নারদ ঋষি এসে আমায় উপদেশ দিচ্ছেন এই সুস্পষ্ট স্বপ্ন দেখতুম।

আশ্রম যে শুধু একটি আধ্যাত্মিক ভূমি নয়, তার ভৌতিক স্তরও যে একটি আছে—কারণ যেখানেই মানুষের নিবাস সেখানেই তার দেহ-ধারণের উপকরণাদির সংগ্রহ ও সংরক্ষণ প্রয়োজন এবং সে জন্যে বিধিব্যবস্থার একান্ত আবশ্যক—সে দিকটা আমার মনে ইতিপূর্বে কখনো উদ্ভাসিত হয়নি। এতদিনে সেকালের আরণ্যকদের সলিল-প্রচুর ও মানব পল্লী থেকে অনতিদূর কুটীর নির্মাণ করে বসবাস বিধানের মর্ম হৃদয়ঙ্গম হল। এখানে দেখলুম আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী স্বরূপানন্দ—যাঁর সঙ্গে বেলুড়ে প্রথম সাক্ষাৎ হয়—"প্রবুদ্ধ ভারত" নামীয় অতি উচ্চাঙ্গের একখানি ইংরেজী পত্রিকা সম্পাদন করছেন, ব্রহ্মচারীদের জন্য বেদান্ত ক্লাসে নিয়মিত অধ্যাপকতা করছেন, আবার তিনিই অন্য সময় অতিথি-অভ্যাগতদের সৎকারের ত্রুটি না হয় বলে আশ্রমের ভাণ্ডার-গৃহ থেকে চাল, ডাল, আটা, কিসমিস, পেস্তা, বাদাম প্রভৃতি বের করে রৌদ্রে শুখতে দিচ্ছেন, নিজের হাতে পোকা বেছে ঝেড়ে ঝুড়ে আবার ভাঁড়ারে তুলছেন। কোন কর্মই তাঁদের পক্ষে অবহেয় নয়। ধীরে ধীরে আমার মনে অনুপ্রবেশ করলে যে এই হল জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগের সমন্বয়; এঁদের এই গৃহস্থতুল্য কর্মের ভিতর গৃহস্থের স্বার্থপরবশতা নেই, শুধু কর্তব্যের ও পরসেবার অনুপ্রেরণা রয়েছে। আশ্রমবাসী প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন নিয়তকর্ম। শীতকালে এঁদের পথঘাট বরফে আচ্ছন্ন হয়ে যায়, আশ্রমেরই এক অংশ থেকে আর এক অংশে গতিবিধি দিনের পর দিন বন্ধ থাকে। শীতাগমের পূর্বেই তাই নিজেদের গাছ থেকে কাঠ কেটে স্তূপীকৃত করে রাখার একান্ত দরকার। এই আশ্রম এমন জায়গায় সন্নিবিষ্ট যার তিন মাইলের মধ্যে কোন লোকালয় নেই, পোস্টাপিসও নেই, আবার এরই ভিতর দিয়ে পাক-দণ্ডি অর্থাৎ shortcut করে সাধু-সন্ন্যাসীরা ক্রমাগত বদরি-কেদারাভিমুখে যাত্রা করেন—তাঁদের শীত-গ্রীষ্ম ঋতুভেদ নেই। আমাদের মত সৌখীন আগন্তুকেরা যদিও বেছে বেছে ভাল সময়েই আসেন তবু তাঁদের আতিথ্যের জন্যেও সর্বপ্রকার উপকরণ সকল সময় প্রস্তুত রাখার দরকার হয়—কেউ কেউ হয়ত শীত পর্যন্ত থেকে যান। যাঁরা সক্ষম, তাঁদের এখানে অবস্থান ও পান-ভোজনের জন্য একটা মাসিক হার নির্ধারিত আছে। মাদার সেভিয়ার যিনি এই বিভাগের অধিষ্ঠাত্রী তাঁর কাছে শুনলুম এ বিষয়ে তাঁদের কঠোর নিয়ম অবলম্বন করতে হয়েছে, কারণ ইতিপূর্বে এমন অনেক আগন্তুকেরা মাস মাস এখানে কাটিয়ে গেছেন

যাঁরা সম্পূর্ণ সক্ষম হলেও বিনা পয়সায় খাওয়া-দাওয়াটাই পছন্দ করেছেন, আশ্রমের পরিচালনার্থে যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য বলেও কিছু দিয়ে যান নি, 'ফ্রি হোটেল' ও স্যানেটোরিয়াম স্বরূপ এটাকে ব্যবহার করেছেন। আশ্রম এভাবে কতদিন অতিথি-সৎকার চালাতে পারে? সেইজন্যে তাঁরা আজকাল পানাহারের জন্য আগন্তুকদের কাছ থেকে একটা খরচ নেওয়া তাঁদের নিয়মাবলীর অঙ্গ করেছেন। সাধুসন্ন্যাসীরাই আশ্রমের যথার্থ অতিথি—যাঁরা "ন তিথি দ্বিতীয়া" অতিবাহিত করেন। কিন্তু যে গৃহস্থেরা পয়সা দেন ও দুচার মাসের জন্য থাকেন তাঁদের প্রতিও আশ্রমাধ্যক্ষদের সৌজন্যের কোন ত্রুটি হয় না।

দুটি পাহাড়ের উপর দুটি বাংলো, উপরটিতে সাধুদের নিবাস, নীচে থাকেন কর্নেল ও মিসেস সেভিয়ার। কর্নেল সেভিয়ার সম্প্রতি দেহরক্ষা করেছেন, আশ্রমের সকলের মাতৃস্বরূপিণী বৃদ্ধা মিসেস সেভিয়ার এখন একাকীই আছেন। তাঁরই টাকায় এ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত ও এর খরচ নির্বাহিত হয়।

একজন আমেরিকান সাধু ও একজন আমেরিকান ব্রহ্মচারী উপরের আশ্রমে সন্ন্যাসীদের সঙ্গেই থাকেন। সাধুটি কেবল আধ্যাত্মিক পথের পথিক। ব্রহ্মচারীটির রাজসিক প্রকৃতি তাঁকে কর্মবহুলতার সিঁড়ি দিয়েই আধ্যাত্মস্তরে ক্রমে ক্রমে উন্নীত করছে। আমি থাকতে একজন আমেরিকান শিষ্যা এলেন সন্ন্যাস বেশধারিণী। তাঁর একমাত্র পুত্রস্নেহে তিনি পাগল ছিলেন। পুত্রের কুব্যবহারে তিনি মর্মাহত হয়ে পড়েন। সেই সময় বিবেকানন্দ স্বামী গিয়ে একদিন তাঁকে 'মা' বলে সম্ভাষণ করায় তাঁর প্রাণের ভিতর থেকে সাড়া উঠল—স্বামীজীকে ও তাঁর উপদেশকে তিনি আঁকড়ে ধরলেন। এতদিন পরে ভারতবর্ষে এসে তিনি পূর্ণ শান্তি পেলেন।

পাহাড়ের শ্যামল বনানীতে সন্ন্যাসীদের গেরুয়া বস্ত্রের রঙ মিলিত হয়ে একটি অপূর্ব সৌন্দর্য বিকশিত করত। কোন চিত্রকর সেখানে থাকলে তার রসভোগের শেষ থাকত না।

সেই সময় একটি মারাট্টী যুবক সেখানে এসেছিল, সে হঠযোগপন্থী। হঠযোগের নানারকম মুদ্রা আমাদের দেখিয়েছিল। কিন্তু আমায় বিশেষ লাভবান করেছিল কতকগুলি বিশিষ্ট মারাহাট্টী গান শিখিয়ে। 'মায়াবতী'র ভিতর দিয়ে পথ-চলতি সন্ন্যাসী পথিকদের কাছে মীরা-বাঈয়ের গানও আমার এখানেই প্রথম শোনা ও সংগ্রহ করা হয়। আর

আশ্রমের দুই-একজন বাঙালী সুগায়ক সন্ন্যাসীদের কাছে রামপ্রসাদী ও শ্যামাবিষয়ক নানা গানে ভরপুর হলুম। মিসেস সেভিয়ার ও আমার সঙ্গে কোন কোন সাধুরা রোজ সায়াহ্নে ভ্রমণে বেরতেন। কোন একটা বসবার মত স্থানে পেঁছিলে সেখানে সকলে মিলে বসতুম ও সাধুরা গান গাইতেন, আমাকেও মাঝে মাঝে গাইতে হত। তাঁদের কাছে শোনা গানের মধ্যে দুই-একটি এখনো মনে বেজে উঠে—

"কেন মা তোর পাগলিনী বেশ!"

অস্তমান সূর্যের আলো সম্মুখের পাহাড়ে প্রতিফলিত হত। সেই আলোর ভিতর যেন এই ধরাতলের কাণ্ডকারখানার ভিতর পাগলিনীর মত ছোটা মা ফুটে উঠতেন। আমার বুকের ভিতর কি একটা ঝনঝনা জাগত। মারাট্টী ছেলেটি একদিন বললে সে এখান থেকে তিব্বত যাত্রা করবে। পথে মানস-সরোবর, কৈলাস প্রভৃতি পড়বে। 'পরাও পরাও' করে যাবে, রাস্তার মধ্যে মধ্যে 'চটি' আছে, সেখানে খাওয়া-দাওয়া পাবার কোন কষ্ট হবে না। তার আয়োজন ও দৃঢ়তা দেখে আমারও মন নেচে উঠল—আমিই বা কেন না যাব এই সুযোগে? মিসেস সেভিয়ার কিন্তু অনুমোদন করলেন না। মাকে চিঠি লিখে খবর দিলেন বোধ হয়। দিদির কাছ থেকে পত্রপাঠ লম্বা চিঠি এল—মায়ের শরীর একেবারে ভেঙ্গে গেছে, কখন কি হয় ঠিক নেই। মায়ের শেষ ইচ্ছা যে আমি বিয়ে করি। নিশ্চয়ই আমি তাঁর এ ইচ্ছা পূর্ণ করতে বাধা দেব না। তাঁরা জানেন আমি যে সে বিয়েতে মত করব না, কি সিভিলিয়ন কি রাজারাজড়া যারি সঙ্গে সম্বন্ধ করুন আমার মনের মত না হলে রাজী হব না। তাই তাঁরা এবার এমন পাত্র ঠিক করেছেন যে, মনের মত হবেই, যাকে বিয়ে করলে আমার জীবনের লক্ষ্যের সঙ্গে একেবারে মিলবে। ইনি পঞ্জাবের বড় ঘরের ব্রাহ্মণ। সমস্ত ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয়ে ঐক্য সাধিত হোক—কর্তাদাদা মহাশয়ের এই ইচ্ছা ছিল সকলে জানে। দাদার কুচবিহার রাজগৃহে অসবর্ণ বিবাহে দাদামশায় মর্মাহত হয়েছিলেন সবাই জানে। আজ তিনি বেঁচে থাকলে আমার এ বিবাহ সম্বন্ধে কত উল্লসিত হতেন! তার উপর ইনি আর্যসমাজের একজন বড় নেতা, যে আর্যসমাজের সঙ্গে আদি ব্রাহ্মসমাজের যোগ স্থাপনের জন্য বলুদাদাকে পঞ্জাবে দৌত্যে পাঠিয়েছিলেন। তা ছাড়া তিনি একজন ন্যাশনাল পেট্রিয়ট, সুবক্তা, সুপুরুষ।

কোনদিক থেকেই আমার আপত্তি করবার মত নয়। অবশ্য তাঁর পূর্বে বিবাহ হয়েছিল, এখন তিনি বিপত্নীক। আমি যেন তাঁকে না দেখে-শুনে,

তাঁর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় না করে, গোড়া থেকেই নামঞ্জুর না করি। "তুই একবারটি আয়, দেখ, তারপরে শেষ যা বলবার বলিস। একেবারে গোড়াতেই বেঁকে বসিসনে, মার বুকে মৃত্যুশেল হানিসনে।" এই কাতর অনুনয় দিয়ে দিদি চিঠি শেষ করেছিলেন। অনিচ্ছুক ছেলেকে ঠিক যে রকম করে বিয়েতে প্রবৃত্ত করাতে হয়, সহজে সম্মত না হলে মাতা বা পিতার প্রাণসংশয়ের ভয় দেখিয়ে সেইটিই বিয়ের পক্ষে শেষ বড় যুক্তি-রূপে পেশ করা হয়, এ স্থলে আমার সম্বন্ধেও তাই করা হল। আমায় নামতেই হল। হিমালয়ের অরণ্যবাসে দাঁড়ি পড়ে গেল।

মা-রা তখন শরীর শোধরাবার জন্যে বৈদ্যনাথে আছেন। আমার গন্তব্য হল সেইখানে, কলকাতায় নয়। পথে লক্ষ্ণৌ আসে, গাড়ি বদলাতে হয়। অতুলপ্রসাদকে খবর দিলুম কয়েক ঘণ্টার জন্যে সেখানে থামব। তিনি এলেন স্টেশনে আমায় নিতে। শুধু নিতে এলেন না। জানালেন আমার জন্যে লক্ষ্ণৌবাসী বাঙালীদের তরফ থেকে একটা বৃহৎ সভার আয়োজন হয়েছে, তাঁদের মানপত্র গ্রহণ করে তবে দেশে যেতে পাব আমি, সেজন্যে দু-একদিন তাঁর বাড়িতে থাকতে হবে। তাই হল। প্রবাসী বাঙালীদের স্নেহ ও সম্মান-ভাজন হয়ে নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করলুম। আমি যে কতদূর প্রবাসী হতে চলেছি তা তখনো কেউ জানেন না। অতুলের বাড়িতে হিন্দুস্থানী কংগ্রেস-ভক্তদের খুব সমাগম ছিল। তার মধ্যে গঙ্গাপ্রসাদ বর্মা সেকালের একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ও আমার পরিচিত। তিনি অতুলের বাড়িতে আমার সঙ্গে দেখা করতে এলে আমি তাঁকে বললুম—"আপনার সঙ্গে আমার একটি বিশ্বস্ত কথা আছে, একটি পরামর্শ চাই।" তাঁকে আমার ভাবী স্বামী সম্বন্ধে প্রশ্ন করলুম। জিজ্ঞেস করলুম তাঁকে জানেন কি না ও তাঁর সঙ্গে আমার বিবাহ বিষয়ে তাঁর কি মত?

তিনি বললেন—খুব জানেন তাঁকে। যদি আমার বিবাহিত জীবন গ্রহণ করতেই হয় তবে এমন উপযুক্ত জীবন-সঙ্গী দুর্লভ। সঙ্গে সঙ্গে বললেন—"এ কথাও বলি, আপনার বিবাহ-বার্তায় দেশের লোক খুশী হবে না, দেশ একজন পূর্ণমাত্রার আত্মোৎসর্গীকে হারাবে এই ভয় করবে।"

বৈদ্যনাথে পোঁছিবার আগেই দিদি ষড়যন্ত্র করে বিয়ের সর্ব আয়োজন একেবারে পাকা করিয়েছেন—আমার হাত-পা একেবারে বেঁধে দিয়েছেন—নড়চড় করবার আর উপায় রাখেননি। স্টেশনে দেখি আমি 'কনে' হয়ে এসেছি। রেলগাড়ি থেকে একেবারে পাল্কীতে পদার্পণ

করলুম, ভূমিতে পা পড়ল না। বিবাহের দিনলগ্ন পর্যন্ত সব ঠিক করে রেখেছেন। বরযাত্রীদের জন্যে একটি বাড়ি নির্দিষ্ট করে সেখানে তাঁদের আনিয়েছেন। নিমন্ত্রণপত্র গেছে চতুর্দিকে। সবই আমার অগোচরে—যাতে আমি আর টুঁ শব্দটি মাত্র করার সময় না পাই—বুঝি যেন এখন কিছু করতে গেলেই মা-বাবাকে অপদস্থ করা হবে। আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলুম। পরের দিনই আমার গায়ে হলুদ। বরপক্ষের কর্তা ভবানীপুরের শঙ্কর পণ্ডিতের কাছে ফর্দ পাঠিয়ে দিদি দস্তুরমাফিক সব জিনিস সেখান থেকে সকালে হাজির করিয়েছেন। সেদিন ভোরে রাঁচী থেকে নতুন মামা মেজমামা মেজমামী এসেছেন, বোলপুর থেকে রবি মামা বড় মামা, মধুপুর থেকে বড় মাসিমা কৃতী ও সুকেশী বৌঠান, কলিকাতা থেকে ইন্দিরা প্রমথবাবু ও সুরেন। বাড়ি আত্মীয়-স্বজনে ভরে গেছে, উৎসবের সানাই বাজছে। বিকালে ক্ষণিকের জন্য বরকে দেখলে কনে—চেহারায় চোখ ঝলসায় বটে। মন যাই বলুক। তারপর দিন সন্ধ্যাবেলা বিয়ে। পালাবার পথ নেই আর, ছাড়াছাড়ি নেই।

আমায় জিজ্ঞেস করা হয়েছিল বিবাহের অনুষ্ঠানটি যদি আর্য-সমাজের পদ্ধতি অনুসারে হয়—যাতে আদি ব্রাহ্মসমাজে ব্যবহৃত সমস্ত বৈদিক মন্ত্রই আছে, উপরন্তু হোমের মন্ত্রও আছে ও হোম আছে—তাতে আমার আপত্তি হবে কি না? আমি বলেছিলুম—"না, হোমে আমার আপত্তি নেই, বরঞ্চ বিশেষ সম্মতিই আছে।"

সে সময় মধুপুর ও বৈদ্যনাথে যে সকল পরিচিত বন্ধুবান্ধবরা হাওয়া বদলের জন্য এসেছিলেন তাঁদেরও অনেকে সস্ত্রীক আমার বিবাহ-সভায় উপস্থিত হলেন। বিয়ে হয়ে গেল। একেবারে অমোঘ বন্ধন—জন্ম-জন্মান্তরের কর্মবন্ধন। দুচারদিন পরে সবাই মিলে কলিকাতায় ফিরে যাওয়া হল। সেখানে গিয়ে আমার বিবাহ উপলক্ষে ধুমধাম করে একদিন সান্ধ্য ভোজনে কলিকাতার বন্ধু-বান্ধবীদের নিমন্ত্রণ করলেন বাবামশায় ও মা। বরপক্ষ থেকে অনেক আর্যসমাজী বড়লোক এলেন, দীপচাঁদ পোদ্দার, স্যর ছাজুরাম, এ বি রেলওয়ের প্রধান ম্যানেজার রায় বাহাদুর বলেয়ারাম প্রভৃতি। সেই সময় 'বীরাষ্টমীর' দিনও সমুপস্থিত। ক্লাবের ছেলেরা আমার অনুপস্থিতিতে আমাদের বাড়িতেই পূর্ববৎ সব আয়োজন করেছে। 'বীরাষ্টমীর' দুই-একদিন পরেই লাহোর যাত্রা করতে হল। স্টেশনে আর্যসমাজী বন্ধুরা তাদের প্রথামত নানা রকম ফল, মিষ্টান্ন ও মাল্য নিয়ে আমাদের সম্বর্ধনা করতে এলেন। সারাপথ—পাটনা, মির্জাপুর,

কানপুর, এলাহাবাদ, সাহারাণপুর, আম্বালা, জলন্ধর, অমৃতসরে এইরূপ অভ্যর্থনা চলতে থাকল। লাহোর স্টেশনে ভীষণ ভিড়। আর সবাইকে টপ্‌কে স্যর মহম্মদ শফি আমার গাড়িতে পেঁছে আমায় সর্বপ্রথম মাল্য-ভূষিত করলেন। তাঁর গাড়িতে করেই আমি আমার নতুন গৃহে পেঁছুলুম —এ গৌরব তিনি আজীবন করতেন।

॥ ছাব্বিশ ॥

শ্বশুরকুল

লাহোরের বাড়িতে পেঁছে কদিন ধরে পাঁচটি বা দশটি করে মিছরির কুঁদো ও তদনুপাতে ছোয়ারা বাদাম ও মঙ্গলসূত্রসহ টাকা হাতে নিয়ে যাঁরা নূতন বধূকে দেখতে এলেন, তাঁদের কেহই প্রায় শ্বশুরকুলের সম্পর্কীয় নয়, সকলেই আর্যসমাজী ভ্রাতাদের স্ত্রী, মাতা ও বোন বা ব্যারিস্টার উকীলদের আত্মীয়া। এঁরা বাদে সর্বপ্রথম এলেন সপত্নীক লালা লালচাঁদ, লাহোরের তখনকার পিতৃনামের গোলাব সিং প্রেসের অন্যতম অংশীদার। তাঁরা দুই ভাই, মোহনলাল ও লালচাঁদ। দুজনেরই দুটি দুটি স্ত্রী, তথাপি দুজনেই অপুত্রক। এই তাঁদের মায়ের দুঃখ। লালচাঁদের প্রথমা স্ত্রী সেকেলে, পুজো-আর্চা নিয়ে থাকেন। তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী বিলাত-ফেরৎ স্বামীর অভিরুচি অনুযায়ী চলেন, ইংরেজী বলেন, স্বামীর সঙ্গে বল-ড্যান্সেও যান। সেকালের পক্ষে অত্যন্ত প্রগতিশালিত্ব। আমাকে তাঁরা দুই বাহু বাড়িয়ে অভ্যর্থনা করলেন। লালচাঁদ অতি ‍াশুক লোক। যখন কলিকাতায় গোলাবসিং প্রেসের শাখা খুলে অবস্থানের সংকল্প করলেন, আমার পিতার কাছে পরিচয়পত্র নিলেন আমার বিশেষ বন্ধু বলে কলিকাতায় নতুন আগন্তুক হিসেবে সাহায্য পাবার উদ্দেশ্যে। কিন্তু কলিকাতায় তাঁর সঙ্গিনী হলেন যে স্ত্রী—যাঁর সঙ্গে আমার লাহোরে ভাব হয়েছিল তিনি নয়—ইতিমধ্যে রাতারাতি সকলের অগোচরে বিবাহিতা তৃতীয়া পত্নী। লালা লালচাঁদের সকল পুত্র-কন্যারা এই স্ত্রীর গর্ভজাত। কিন্তু তাঁর ব্যবহার পূর্ব পত্নীদের প্রতিও অনবদ্য রইল, তাঁরা নিজের নিজের মহলে সমান সমাদরে স্বামি-বিচ্ছিন্ন

জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে লাগলেন। তাঁর বড় ভাই মোহনলালেরও কিছুদিন পরে এক ব্রাহ্ম পরিবারের কন্যার সঙ্গে তৃতীয়বার বিবাহ হলে তিনিও পুত্রলাভ করলেন। জীবনে এই প্রথম হিন্দুর বহুপত্নীকতার সঙ্গে সাক্ষাৎ সংস্পর্শ হল। একজন মাত্র দ্বিপত্নীক হিন্দুকে দেখেছিলুম ইতিপূর্বে সাতারায়, তিনি সাব-জজ সুগায়ক সোহনি সাহেব। তাঁর স্ত্রীদ্বয়ের দর্শনলাভ করিনি কিন্তু, তাঁরা আড়ালেই থাকতেন। শুনেছিলুম দুজনের বনে না। সোহনি সাহেব পুত্রার্থে দ্বিতীয় দারগ্রহণ করলেও পুত্রমুখ-দর্শনে বঞ্চিত রইলেন। হিন্দুসমাজে বহু-বিবাহ আইনসঙ্গত হলেও কার্যতঃ শিক্ষিত লোকদের একপত্নীক হওয়াই নিয়ম, একাধিক পত্নী গ্রহণ সেই নিয়মের ব্যতিক্রম, বিশিষ্ট কতকগুলি কারণে ছাড়া তা হয় না। কারণগুলির মধ্যে প্রধান কারণ অপুত্রকতা। আর এক পরিবারের মা-বাপের কাছ থেকে শিশু ছিনিয়ে এনে দত্তক করার চেয়ে অনেকে পছন্দ করেন শিশুর মা নিজেরই পত্নীপদবাচ্যা হোক—যখন আইনে তার পথ খোলা আছে। হিন্দু-গৃহে সন্তানহীনা প্রথমা পত্নী অনেক সময় নিজেই স্বামীর ভবিষ্যৎ সন্তানের মাতাকে নিজে পছন্দ করে ঘরে তোলেন, স্বামি-প্রেমের ভাগীদার করেন। এই হল রক্ত-পরাম্পরাগত হিন্দু-সভ্যতা, হিন্দু নারীর কৃষ্টি, স্ত্রীর নিজের ব্যক্তিত্বকে স্বামীর বংশরক্ষা প্রয়োজনের সঙ্গে একীভূত করা। এই সহজ আত্মবিলীনতার ভিতর কত আত্মসম্মান আছে—এ হল স্বামীর অপর স্ত্রী আসক্তির ফণিনী দংশন থেকে আত্মবিলোপ মন্ত্রবলে আত্মরক্ষা। সকলে পারে না, কিন্তু যদি কেউ পারে, তবে কি সেটা দোষের? একটা সমগ্র জাতি যদি পারে তবে সে জাতি কি নিন্দনীয়? হিন্দুর সামাজিক নতুন আইন যে বিধিবদ্ধ হতে চলেছে, তাতে অনেকগুলি আবশ্যকীয় কু-রীতির সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি সু-রীতিরও অনাবশ্যকীয় কর্তন হতে চলেছে—একটা সাজান ফল-ফুলের বাগান যখন অযত্নে আগাছায় ভরে যায়, সেগুলো উপড়োতে গিয়ে যেমন ভাল ভাল দামী গাছও জড়সুদ্ধ ছাঁটা হয়ে যায়। বিবাহিত জীবনে বৈধ একপত্নীকতার নিয়মটি দেখতে অতি ভদ্রলোকের মত, কিন্তু তার আড়ালে অবৈধ বহুপত্নীকতা পাশ্চাত্য সমাজে কুৎসিতরূপে বিরাজমান। প্রাচ্যে বৈধ ভাবে পরিণীতা একাধিক স্ত্রী গৃহে সম্মাননীয়া—এমন কি রাজওয়াড়ার সপ্তপদের স্থলে ত্রিপদের ফেরে পরিণীতা সখীরাও স্বামি-গৃহে ভরণপোষণের অধিকারী। পাশ্চাত্যের অবৈধভাবে উপভোগ্যা স্ত্রী সম্মানহীনা এবং তার নিজের ও সন্তানদের ভরণপোষণ নির্ভর করে

পুরুষের ক্ষণিক মোহ ও মর্জির উপর। আমরা দেখতে পাই বিশেষ কারণ উপস্থিত না হলে, এককালে একাধিক বিবাহ আইন-সঙ্গত হলেও ভদ্রসমাজে তা অপ্রচলিত, তার দৃষ্টান্ত অতি বিরল। রাজা-রাজড়ার গৃহে এটা এখনও প্রচলিত থাকার একটা কারণ কন্যাবহুল রাজ-পিতামাতারা এ বিধি আইন-বিরুদ্ধ হলে বিপন্ন হবেন—তাঁরা বলেন, তাহলে "আমাদের কন্যারা যাবে কোন্ ঘরে?"

প্রথম প্রথম 'সমাজী' অর্থাৎ আর্যসমাজী যেসব মেয়েরা আমাকে দেখতে আসতেন তাঁদের পরিচয় পেতুম কেউবা 'চাচী' (কাকিমা), কেউবা 'তায়ী' (জ্যেঠাইমা), কেউবা 'ভাবি' (বৌদিদি), সুতরাং ধরতে পারতুম না সত্যিকারই সম্বন্ধ—না পাতান। ক্রমে ক্রমে শ্বশুরকুলের আত্মীয়াদের ও 'সমাজী' আত্মীয়াদের পার্থক্য পরিষ্কার হতে থাকল। শ্বশুরকুলেও আর এক নতুন জিনিস পঞ্জাবের—স্কটল্যাণ্ডের 'clan'-এর মত, বাঙলায় তা নেই। আমার স্বামী যে শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, জানলুম সেই শ্রেণীকে বলে মহিয়াল ব্রাহ্মণ, তাঁরা ৬টি অন্তঃশ্রেণীতে বিভক্ত—দত্ত, বালি, ছিব্বর, মোহল, লৌ ও ভীমবল। এ'দের পরস্পরের বৈবাহিক আদান-প্রদান হয়, অন্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণকে এ'রা কন্যাদান করেন না, তাঁদের ঘর থেকে কন্যা আনতে পারেন। এ'রা সবাই শস্ত্রধারী ব্রাহ্মণ, যখন শত্রু আসে দ্বারে তখন অস্ত্র দিয়ে তার প্রতিরোধ করেন, অন্যথা জমির চাষবাস নিয়ে থাকেন—agriculturist পর্যায়ভুক্ত, land alienation act-এর দ্বারা প্রশাসিত। ইংরেজ শাসনে ভারতের দ্বার-রক্ষক এরা, ভারত সীমান্তে "Kings own guides" নামে পল্টন শুধু এ'দেরই জাতভাইয়ের দ্বারা বিরচিত। আলেকজাণ্ডার যখন পঞ্জাবের দ্বারে সমুপস্থিত হন, এ'দেরই পূর্বপুরুষ রাজা জয়পাল ও অনঙ্গপাল তাঁকে যুদ্ধদান করেন।

লাহোরে আমার স্বামীর বাসাবাড়ি মাত্র, তাঁর পিতৃপিতামহাগত গৃহ ও জন্মভূমি 'কঞ্জরুর'এ। সে গ্রামখানি হিমালয়ের পাদতলে গুরুদাসপুর জেলায় অবস্থিত। তার পুরো নাম—'কঞ্জরুরএ দত্তা' অর্থাৎ দত্তদের কঞ্জরুর। কিম্বদন্তী এই, একবার লাহোরের এক নবাবের জন্য একটি সুন্দরী রাজপুত-কন্যা হরণের প্রচেষ্টায় এ'দের কোন পূর্বপুরুষ বাধা দিতে গিয়ে সবংশে নিহত হন। কিছুকাল পরে সেই নবাব কি এক প্রকার কর্ণপীড়াগ্রস্ত হন। অনেক হাকিম-বৈদ্য দেখান হল—কিন্তু কেউ কিছু করতে পারলে না। শেষে একজন জ্যোতিষী বললেন,—"অমুক যুদ্ধে আপনার দ্বারা অসংখ্য ব্রাহ্মণ-হত্যা হয়েছে—তার ফলে এই শাস্তি।

প্রায়শ্চিত্ত না করলে এ শাস্তির অপনোদন হবে না—আপনার কর্ণপীড়া সারবে না।"

"কি প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে?"

"সেই দত্ত-বংশের কোন সন্তান যদি আজও জীবিত থাকে খুঁজে বের করুন। তারই থুতুতে আপনার কানের ঘা সারবে, আর ওষুধ নেই।"

চারিদিকে খোঁজ খোঁজ পড়ে গেল। নবাবের চরেরা সন্ধান পেলে যুদ্ধকালে একটি গর্ভিণী দত্তকুলবধূ তাঁর পিত্রালয় শেয়ালকোটে ছিল। দত্তকুল নির্মূল হলে সেখানে তার দুটি যমজ পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়। মাতুল ভাগিনেয় দুটিকে অতি সঙ্গোপনে রক্ষা করছিলেন। নবাবের গুপ্তচর এসে তাদের লাহোরে ধরে নিয়ে গেল। সেখানে নবাবের শয়নকক্ষে নবাবের কাছে সমুপস্থিত করে হাকিম আদেশ দিলেন—"নবাব বাহাদুরের কানে থুতু ফেল।" শিশু দুইটি ভয়ে আড়ষ্ট। অনেক পীড়াপীড়ি, অনুনয়-বিনয়, ভয় দেখানর পর তারা অগত্যা তাই করলে। কিছুদিন পরে নবাব নীরোগ হয়ে উঠলেন। তখন দুই ছেলেকে দুই ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে নবাব স্বয়ং আদেশ দিলেন—"ঘোড়া ছুটিয়ে দুজনে দুদিকে বেরও। চব্বিশ ঘণ্টা ধরে ঘুরে প্রতি ঘোড়া যতটা ভূখণ্ড পরিভ্রমণ করবে ততটার নিষ্কর মালিক হবে তার আরোহী।"

এক ঘোড়া শিয়ালকোট জিলার ডাফরওয়ালের দিকে গেল, আর এক ঘোড়া গুরুদাসপুর জিলার কঞ্জরুরের দিকে। এই দুই ভূখণ্ডে দুই দত্তবংশ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল।

কঞ্জরুরে অবস্থিতির পরও অনেকানেক যুদ্ধে দত্তরা নিযুক্ত হয়েছেন, শান্তিময় জীবন অতিবাহিত করেননি। যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত হওয়াটা তাঁদের পক্ষে সাধারণ কথা—যেমন সচরাচর লোকের পক্ষে রোগাক্রান্ত হয়ে বিছানায় মৃত হওয়া। কিন্তু 'শহীদ'—martyr—উপাধি সেই পায় যে অসাধারণ বীরত্ব দেখাতে দেখাতে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণদান করে। এ কালের Victoria Cross-এর বীরত্ব তার সঙ্গে কতকটা তুলনীয়। কঞ্জরুরী দত্তদের এক পূর্বপুরুষ আততায়ীদের বিরুদ্ধে লড়তে লড়তে 'শহীদ' বা martyr হয়েছিলেন। তাঁর নাম বাবা অটল খাঁ। কঞ্জরুরে তাঁর সমাধি অবস্থিত, একটা মাটির ঢিবি, অনতিউচ্চ মাটির দেওয়ালে ঘেরা। সন্ধ্যা হলে আশপাশের গ্রাম থেকে হিন্দু-মুসলমান উভয় শ্রেণীর স্ত্রী-পুরুষেরা আসে সমাধির উপরে। নিজের নিজের দীপ জ্বালায়। দত্তদের সামাজিক প্রথা এই যে, মুণ্ডন, উপনয়ন, বিবাহাদি ক্রিয়াকর্মে কর্মকর্তা ও কর্ম-

কর্ত্রীরা এই সমাধিতে এসে শহীদের স্মরণে প্রণিপাত করে পুষ্পাঞ্জলি ও কড়াপ্রসাদ (মোহন ভোগ) নিবেদন করেন। এটি একটি অবশ্যকর্তব্য কর্ম, সব শেষে এইটি না হলে কোন সামাজিক কাজ সম্পূর্ণ হয় না। আমার স্বামী সসঙ্কোচে আমায় জিজ্ঞেস করলেন,—"আমাদের কুলের এই রীতি তুমি অনুসরণ করবে কি? নববিবাহিত বধূর সেখানে গিয়ে প্রণিপাত করার নিয়ম মানবে কি? এটা কুসংস্কার ভেবে যদি বর্জন করতে চাও আমি আপত্তি করব না।" আমি বললুম—"নিশ্চয়ই মানব। কুসংস্কার কিসের? এ ত গৌরবের কথা যে এমন ঘরে পড়েছি যাঁদের বংশে এতবড় বীরপুরুষ জন্মেছিলেন যিনি 'শহীদ' বলে আজও গণ্য ও পূজ্য, যাঁর স্মৃতি আজও উত্তরপুরুষদের গর্ব ও উৎসাহের কারণ।" আমার কঞ্জরুরে আদি শ্বশুরালয়ে যাওয়ার দিন ধার্য হল। লাহোর থেকে অমৃতসহরে গিয়ে সেখানে গুরুদাসপুরের ট্রেন ধরতে হয়। মধ্যপথে বাটালা শহর আসে। সেই পর্যন্ত রেলে যাত্রা। সেখানে নেমে টঙ্গা বা এক্কাযোগে ডেরা বাবানথনকে পৌঁছে রাবী নদী পার হতে হবে। নদীর উপর খুব চওড়া নৌকায় মানুষ, গরু, ঘোড়া সব পার হচ্ছে। অল্পক্ষণেই ওপারে পৌঁছন গেল। এখানে আর সকলের জন্যে ঘোড়া অপেক্ষা করছে, আমার জন্যে ডুলি—এদেশে পাল্কী পাওয়া যায় না। ডুলি চড়ে রীতিমত কনে বউয়ের মত আট-দশ মাইল গিয়ে আবার একটি ছোট্ট স্বল্পতোয়া নদীর ধারে পৌঁছলুম, নদীর নাম বসন্তর--তার ওপারেই কঞ্জরুর। বেহারারা ডুলিসমেত হেঁটে নদী পার হল, অশ্বারোহীরাও নদীর উপর দিয়ে ঘোড়া হাঁটিয়ে নিয়ে গেলেন। ওপারে গ্রাম্য লোকেরা ও অনেক আত্মীয়-আত্মীয়ারা সমবেত হয়েছেন। বেহারাদের কাঁধ থেকে ডুলি নামিয়ে তাঁদের যা যা মঙ্গলাচার করবার, তা করলেন। এদেশে শাঁখ বাজান বা উলু দেওয়া নেই; কিন্তু দীপ হাতে নিয়ে বরণ করা আছে। বাড়ি পৌঁছে আহারান্তে বিশ্রাম করলুম। বিশ্রামস্থল নিভৃত নয়, আত্মীয়স্বজন পূর্ণ। বিকেল হতে না হতে উঠে বসতে হল। আশপাশের পাঁচটি গ্রাম থেকে লোকস্রোত বয়ে আসছে—কলকাতা হতে আসা বি-এ পাশ-করা চৌধুরী সাহেবের নতুন বউকে দেখতে। সবাই আশ্চর্য যে এতটা লেখা-পড়া জানা মেয়ে শ্বশুরদের ক্ষুদ্র গ্রামে আসতে রাজী হল—আর সে নাকি 'বাবা ঠক্করের মহলে' গিয়ে মাথা টেকবে—অর্থাৎ প্রণত হবে।

এ বিষয়টা নিয়ে লাহোরেও পরে খুব চর্চা হয়েছিল। পঞ্জাব ব্রাহ্ম-সমাজের মেয়েদেরও তাদের সনাতনী আত্মীয়স্বজনেরা আমার দৃষ্টান্তের

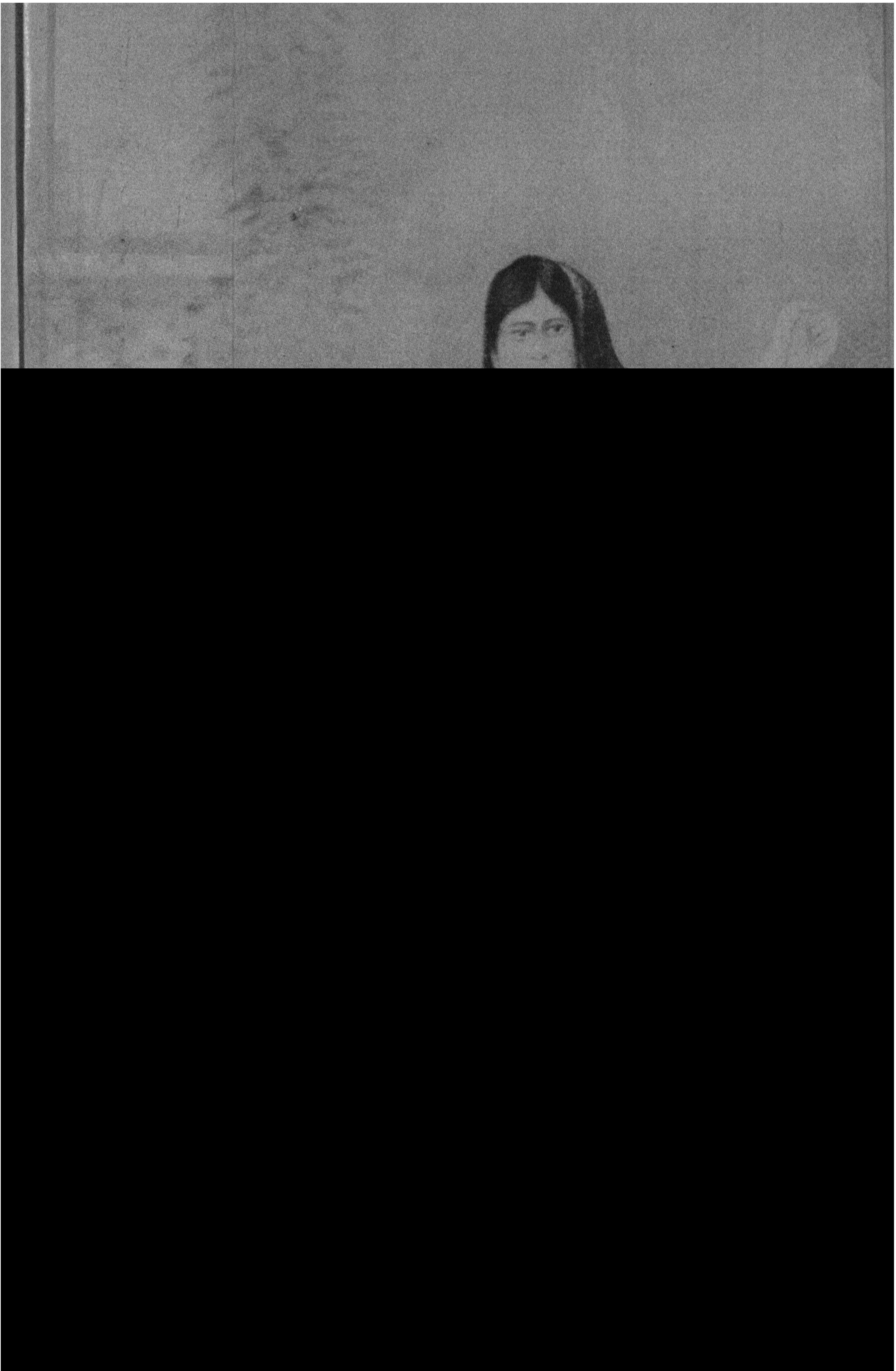

অনুসরণ করে চলতে অনুনয় করেছিলেন, ব্রাহ্মসমাজী হলেই সব স্বদেশী আচার ও কুলাচার বর্জন যে অত্যাবশ্যক নয় তা আমার ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বোঝান হয়েছিল। প্রায় মণখানেক মোহনভোগ সঙ্গে নিয়ে পরের দিন 'বাবা ঠক্কর মহলে' অর্থাৎ বাবাঠাকুরের —বাবা অটল খাঁর—সমাধি অভিমুখে সকলে মিলে যাত্রা করলেন। সেখানে কয়েকবার সমাধি প্রদক্ষিণ করে, প্রণাম করে, দীপদান করে প্রসাদ নিবেদন করা হল। সেই প্রসাদ গ্রামসুদ্ধ সকলের ঘরে ঘরে একটু করে বিতরণ করা হবে।

মাটির প্রাচীরটি প্রতি বছর বর্ষাকালে ধুয়ে ভেঙ্গে যায়। সেটি ইঁটের পাকা গাঁথুনি করে দেবার জন্যে সমাধিরক্ষক আমায় অনুরোধ জানালেন। আমি তাতে স্বীকৃত হয়ে যত খরচ হবে তার একটা এস্টিমেট আমায় পাঠাতে বললুম এবং কার্যারম্ভের জন্যে অগ্রিম দুই শত টাকা তাঁর হাতে দিয়ে এলুম। চার-পাঁচদিন কঞ্জরুরে থেকে, শ্বশুরবাড়ির সম্পর্কিত নিকট ও দূরের প্রত্যেক আত্মীয় ও আত্মীয়ার সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাঁদের আশীর্বাদ নিয়ে লাহোর ফিরলুম।

বলেছি পঞ্জাবের এক এক জাতি এক একটি 'clan'এর মত। তাঁদের পিতৃ-পিতামহাগত কুলপ্রথা, আচার ও সামাজিক বন্ধনে এক একটি বিশেষত্ব আছে। সে বিশেষত্ব আজ পর্যন্ত রক্ষিত হয়ে চলেছে। তাঁদের সামাজিক মিলনে ধনিদরিদ্রের ভেদ নেই। একজন হাইকোর্টের জজ ও ডাকপিয়নও সমান আসন লাভ করে সামাজিক মেলামেশায়। ছেলেমেয়ের বিবাহ উপলক্ষে খরচের নিয়ম বাঁধা আছে—বড়মানুষ বলে মেয়ের বিবাহে এতটা কিছু যৌতুক দিতে পারবে না বা ধূমধাম করতে পারবে না, যা একজন গরীবও নিজের মেয়ের বেলায় না পারবে। সব বাঁধাদস্তুর আছে—এতগুলো রেশমী জোড়, এতগুলো সুতির, বরযাত্রীদের এই এই খাওয়ান ইত্যাদি। বরেদের তরফ থেকে মেয়ের বাপের কাছে বরপণও চাওয়ার নিয়ম নেই, তাতে যেন মেয়েকে বিক্রয় করা হয়—অতি ঘৃণ্য কাজ।

বংশের কীর্তিগায়ক একটি জাতি আছে—তাদের বলে 'মিরাসি'—স্কচ 'Pipers'দের মতো। ভাট নয় তারা, ভাটও আছে, কিন্তু তারা ব্রাহ্মণ আর মিরাসিরা এককালে হিন্দু হলেও মুসলমান প্রভাবে মুসলমান-ধর্মী হয়ে গেছে। বিবাহাদি সংস্কারে মিরাসিদের পাওনা একটা বড় পাওনা—সেইটে প্রত্যেক ক্রিয়াকর্মের অঙ্গীভূত প্রধান খরচ।

প্রত্যেক পরিবারের সঙ্গে এক এক ঘর মিরাসিরা সংযুক্ত। সমাগত অতিথিরা যখন খেতে বসেন তখন মিরাসিরা তাঁদের পূর্বপুরুষদের কীর্তিকলাপ গাইতে থাকে। শুনতে শুনতে গর্বে শ্রোতাদের বুক ফুলে ওঠে। যজমানদের সেই 'অতীত গৌরব বাহিনী বাণী' মিরাসিদের বংশপরম্পরাগত খাতায় ভরা আছে, অপলাপ হবার যো নেই, ভোলবার যো নেই। এখন তাদের সন্তানসন্ততি এত বেড়ে গেছে যে তাদের প্রত্যেকের প্রতিপালন যজমানদের দানে সঙ্কুলান হওয়া সম্ভব নয়, তাই এখন তারা পঞ্জাবের সর্বত্র চাকরি খুঁজে ছড়িয়ে পড়ছে। এখনও অনেক ঘর কিন্তু কঞ্জরুরে বসবাস করে। আমি সেখানে পৌঁছলে—'গউহর' বলে শ্বশুরকুলের মিরাসি আমার অভ্যর্থনার জন্যে এসে সম্মুখে দাঁড়িয়ে দত্ত-বংশের কীর্তিগাথা গাইতে লাগল। কোন স্ত্রীলোকের জন্যে এটা করা দস্তুর নয়—আমার বেলা সে নিয়মের ব্যতিক্রম হল। এই প্রথম কঞ্জরুরের চৌধুরাণী সেখানকাব চৌধুরীদের সমতুল্য গণনীয় হল।

বিবাহোত্তর জীবন-কথা

সরলা দেবী আত্মজীবনীতে পঞ্জাব গমন পর্যন্ত বিবৃত করেন। রামভজ দত্তচৌধুরী পঞ্জাবের বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যৌবনে 'আর্যসমাজে' প্রবিষ্ট হন; এই সময় পিতৃকুলের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক প্রায় ছিন্ন হইয়াছিল। সময়ান্তরে এই সম্পর্ক পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। রামভজ দত্তচৌধুরী, দ্বিতীয়া পত্নীর বিয়োগের পর, তৃতীয় বার দারপরিগ্রহ করেন। পঞ্জাবের আর্যসমাজের সঙ্গে কলিকাতার আদি ব্রাহ্মসমাজের ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপিত হইয়াছিল। আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এক সময়ে আর্যসমাজের কর্তৃপক্ষের সহিত পত্র ব্যবহার দ্বারা উভয়ের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। সুতরাং আর্যসমাজী রামভজ দত্তচৌধুরীর সঙ্গে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দৌহিত্রী সরলা দেবীর পরিণয়ে সকলেরই আন্তরিক সমর্থন ছিল। সরলা দেবীও অভিভাবক-অভিভাবিকাদের অভিমতকে সসম্ভ্রমে মানিয়া লন।

রামভজ দত্তচৌধুরীর কর্মস্থল ছিল লাহোরে। তিনি ঐ সময়েই ব্যবহারাজীবরূপে বেশ নাম করিয়াছিলেন। উপরন্তু, তিনি আর্যসমাজী নেতা এবং বিবিধ সমাজকর্ম ও সমাজসেবায় উদ্যোগী; সরলা দেবীর সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়া তাঁহার কর্মৈষণা দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল; সরলা দেবীও পতির প্রতিটি কর্মে যোগ্য সহযোগী হইয়া উঠিলেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন শহরে আর্যসমাজের কেন্দ্র ছিল; এইসব কেন্দ্রে পুরুষ ও নারীদের বিবিধ অনুষ্ঠান-উৎসবে এই বিদগ্ধ দম্পতি যোগ দিতেন। সরলা দেবীর সময়োপযোগী ভাষণে আর্যসমাজী নরনারী চমৎকৃত হইতেন। এই-সকল সামাজিক মেলামেশা এবং নারীজাতির অনুন্নত অবস্থা প্রত্যক্ষ করার ফলেই সরলা দেবীর মনে একটি নিখিলভারতীয় মহিলা-সংঘ প্রতিষ্ঠার কল্পনা উদ্রিক্ত হইয়া থাকিবে। গার্হস্থ্যধর্ম পালনের সঙ্গে সঙ্গে সরলা দেবী বিবিধ সমাজকর্মেও লিপ্ত হইয়া পড়েন। ১৯০৭ সনের ৩রা জানুয়ারী তাঁহাদের একমাত্র পুত্র পণ্ডিত দীপক দত্তচৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন।

১৯০৫-১৯২৩, এই আঠার-উনিশ বৎসর কাল সরলা দেবী পঞ্জাবে প্রবাস-জীবন যাপন করেন। এই সময়ে তিনি বহু সমাজহিতকর কার্যে লিপ্ত হইয়াছিলেন। এসব কার্য শুধু আর্যসমাজীদের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল না; বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের গণ্ডী ছাড়িয়া সমগ্র ভারতীয় জনগণের উদ্দেশ্যেই ইহা প্রযুক্ত হইত। সরলা দেবীর সাহিত্যচর্চা বরাবর অব্যাহত ছিল। 'ভারতী' মাসিকে এ সময়ও প্রবন্ধ, কবিতা প্রভৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। সরলা দেবীর সমাজকর্ম নানা দিকে প্রসারিত হয়, এবং তাঁহার কার্যে স্বামী রামভজের সমর্থনও ছিল যথেষ্ট।

ভারত স্ত্রী-মহামণ্ডল : সরলা দেবীর সমাজসেবার প্রধান অভিব্যক্তি—ভারত স্ত্রী-মহামণ্ডল। তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে পর্যটন করিয়া নারীজাতির অবস্থা প্রত্যক্ষ করেন। ইতিপূর্বে বাংলায় যুবশক্তির উদ্বোধনকল্পে তিনি যাবতীয় শক্তি নিয়োজিত করিয়াছিলেন। কিন্তু এককভাবে নারীদের উন্নতিপ্রয়াস তাঁহার এই প্রথম। মাতা স্বর্ণকুমারীর 'সখি সমিতি' এবং দিদি হিরণ্ময়ীর 'মহিলা শিল্পাশ্রম' এই প্রতিষ্ঠান দুইটির আদর্শ তাঁহার সম্মুখে। এই প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের যে যে অভাব ছিল তাহা পূরণকল্পেই এই ভারত স্ত্রী-মহামণ্ডলের প্রতিষ্ঠা। ১৯১০ সনে এলাহাবাদে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। এই সময়ে সরলা দেবীর উদ্যোগে একটি নিখিল ভারতীয় মহিলা সম্মেলনের অধিবেশন হইল জাজিরার মহারাণীর সভানেত্রীত্বে। অধিবেশনে সরলা দেবী ভারত স্ত্রী-মহামণ্ডল স্থাপনকল্পে একটি ভাষণ দেন। এই ভাষণে তিনি উক্ত মহামণ্ডলের উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়া বলেন যে, ভারতের পর্দানশীন নারীদের শিক্ষার কোনরূপ ব্যবস্থা নাই। গৌরীদানের প্রথা তখনও বলবৎ থাকায় অন্তঃপুরে স্ত্রী-শিক্ষার ব্যবস্থা করা দরকার। কাজেই এ নিমিত্ত একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানের আবশ্যকতা সর্বত্র অনুভূত হইতেছে। বেতন দিয়া শিক্ষয়িত্রী নিয়োগ করিতে হইলে অর্থের খুবই প্রয়োজন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ভারত স্ত্রী-মহামণ্ডলের শাখা স্থাপন দ্বারা এই উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইবে। সরলা দেবীর এই সুচিন্তিত ভাষণটির প্রিয়ম্বদা দেবী কৃত অনুবাদ 'ভারতী'তে (চৈত্র, ১৩১৭) প্রকাশিত হইয়াছিল। সরলা দেবী ইহা পুস্তিকার আকারেও প্রকাশিত করেন।

এই সম্মেলনে বিজয়নগর, প্রতাপনগর, কপূরতলার রাণীগণ এবং ভূপাল ও ক্যাম্বের বেগম সাহেবারা উপস্থিত ছিলেন। সরলা দেবী তখন

লাহোরের বাসিন্দা। তাঁহার চেষ্টায় সেখানে ইহার একটি শাখা গঠিত হয়, এবং উক্ত উদ্দেশ্যে কার্য হইতে থাকে। ক্রমে অমৃতসর, দিল্লী, করাচী, হায়দরাবাদ, কানপুর, বাঁকীপুর, হাজারীবাগ, মেদিনীপুর, কলিকাতা এবং আরও কয়েকটি স্থানে ভারত স্ত্রী-মহামণ্ডলের শাখা সমিতি স্থাপিত হইল।

কলিকাতার ভারত স্ত্রী-মহামণ্ডলের শাখার কার্যকলাপ সম্বন্ধে এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করি। কৃষ্ণভাবিনী দাসের চেষ্টাযত্নে ইহা একটি প্রকৃত সমাজহিতৈষী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। অন্তঃপুরে বিধবা, কুমারী ও অনাথা নারীগণকে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পশিক্ষা দানেরও ব্যবস্থা হয়। তিনি ছিলেন বৌবাজারনিবাসী কলিকাতা হাই-কোর্টের বিখ্যাত ব্যবহারাজীব শ্রীনাথ দাসের পুত্র অধ্যাপক দেবেন্দ্রনাথ দাসের সহধর্মিণী। পতি এবং একমাত্র কন্যার প্রাণবিয়োগের পর কৃষ্ণভাবিনী বিধবা অবস্থায় ভারত স্ত্রী-মহামণ্ডলের কার্যে নিজেকে একেবারে সঁপিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার ত্যাগপূত জীবন সকলেরই আদর্শস্থল। ১৯১৯ সনের প্রারম্ভে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যু হইলে কবি প্রিয়ম্বদা দেবী ভারত স্ত্রী-মহামণ্ডলের সম্পাদিকা হইলেন। কয়েক বৎসর যাবৎ তিনিও ইহার কার্য সুচারুরূপে সম্পাদন করিয়াছিলেন। সরলা দেবী বঙ্গদেশে ফিরিয়া আসিলে ইহার পরিচালনাভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। এ সম্বন্ধে পরে বলিতেছি।

পত্রিকা সম্পাদন ও পরিচালন: 'ভারতী' সম্পাদনে প্রযত্নের কথা সরলা দেবী আত্মজীবনীতেই বিবৃত করিয়াছেন। সাময়িক পত্র সম্পাদনে তাঁহার সাফল্যপূর্ণ বহুমুখী প্রয়াস সম্বন্ধে পাঠক-পাঠিকামাত্রেই হয়ত অবগত হইয়াছেন। সরলা দেবী রাজনীতিতে ছিলেন উগ্রপন্থী; বিপ্লব-যুগের প্রথম দিকে বিপ্লবী ভাবধারার পরিপোষক কার্যেও নিজেকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। পণ্ডিত রামভজ দত্তচৌধুরীও উগ্রপন্থী রাজনীতিক ছিলেন। কাজেই এদিকেও উভয়ের যোগাযোগ পূর্ণমাত্রায় ঘটিয়াছিল। পণ্ডিত রামভজও গতানুগতিক রাজনৈতিক আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন না। রাজনীতি-ক্ষেত্রে নবভাব প্রচারের নিমিত্ত তিনি হিন্দুস্থান নামক উর্দু সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন। ইহার সম্পাদকও ছিলেন তিনি। এই সময় সরলা দেবীর পূর্ব অভিজ্ঞতা রামভজের বিশেষ কাজে আসে।

'হিন্দুস্থান' পত্রিকায় উগ্র রাজনৈতিক মতামত প্রকাশের নিমিত্ত

সরকার চটিয়া আগুন। লাহোরের চীফ কোর্ট আদেশ দিলেন যে, পত্রিকার সম্পাদক এবং স্বত্বাধিকারী হিসাবে রামভজের নাম প্রকাশিত হইলে তাঁহার ব্যবহারাজীবের 'লাইসেন্স' বা অনুমতিপত্র বাতিল করিয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু সহধর্মিণী সরলা দেবী এই সময়ে আসিয়া স্বামীর সম্মুখে দাঁড়াইলেন। পণ্ডিত রামভজের পরিবর্তে তাঁহারই নাম প্রকাশিত হইল হিন্দুস্থানের সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী রূপে। সরকারী অপচেষ্টা এইভাবে ব্যাহত হইল। সরলা দেবী প্রকাশ্যে পত্রিকার ভার লইয়া ইহার একটি ইংরেজী সংস্করণও বাহির করিলেন। বলা বাহুল্য, সরলা দেবী ইংরেজী রচনায় সুপটু ছিলেন। প্রাক্-বিবাহ যুগে 'ভারতী' সম্পাদনা-কালে তিনি 'হিন্দুস্থান রিভিয়ু'র মাধ্যমে কংগ্রেসী রাজনীতি এবং হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক বিষয়ক প্রবন্ধ লিখিয়া লালা লাজপৎ রায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দের নিকট হইতেও প্রশংসালাভ করিয়াছিলেন। এ কথা হয়ত অনেকে জানেন না যে, মহাবোধি সোসাইটির জর্ন্যালের দুই সংখ্যায় সরলা দেবী রচিত স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ক একটি পরিকল্পনা প্রকাশিত হয়। ইহা বিদগ্ধজনের এত সমর্থন লাভ করে যে, তিনি ইহা পরিবর্তিত করিয়া পুস্তিকাকারে ছাপাইয়াছিলেন ১৯০১ সনে। রাজনৈতিক মতবাদ প্রকাশে তাঁহার মৌলিকতা ও রচনাশৈলী ছিল অপূর্ব। বিলাতের বিখ্যাত উদারনৈতিক পত্রিকা 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান' হিন্দুস্থানের (ইংরেজী সংস্করণ) বিশেষ প্রশংসা করিতেন। 'হিন্দুস্থানে' প্রকাশিত কোন কোন রচনা র‍্যামজে ম্যাকডোনালড তাঁহার 'Awakening of India' পুস্তকে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

পঞ্জাবের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সামাজিক জীবন : ভারত স্ত্রী-মহা-মণ্ডলের আদিকল্পক এবং অধিনায়ক ছিলেন সরলা দেবী। লাহোরের বিভিন্ন পল্লীতে নারীদের শিক্ষার ব্যবস্থা তিনি করিয়াছিলেন। অন্ততঃ পঞ্চাশটি স্থলে এইরূপ আয়োজন করেন বলিয়া প্রকাশ। লাহোরের নারীসমাজে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রবর্তনে তিনি অগ্রণী হন। বাংলা সঙ্গীতের হিন্দী ও পঞ্জাবী অনুবাদ করাইয়া তাহাতে সুর সংযোগ করেন তিনি। পর্দানশীন নারীদেরও সমাজসেবায় তিনি উদ্বুদ্ধ করিতে থাকেন। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ও উৎসবে পুরুষের মত নারীরাও যাহাতে যোগদান করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা ও আয়োজন করিতেন। লাহোরে সরলা দেবীর কার্যকলাপ পঞ্জাবের অন্যান্য মফস্বল শহরেও অনুসৃত হয়। এইসব অঞ্চলের মহিলারা আত্মোন্নতির জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠেন।

আর্যসমাজীদের একটি প্রধান কার্য—অনুন্নতদের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার দ্বারা তাহাদের উন্নতিসাধনের প্রচেষ্টা। পণ্ডিত রামভজ এই কার্যটির ভার নিজে লইয়াছিলেন। সরলা দেবী নারীজাতির মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারে যেমন একদিকে লিপ্ত ছিলেন অন্যদিকে স্বামীর অনুন্নত জাতিদের উন্নতিপ্রচেষ্টারও বিশেষ সহায় হইলেন। সরলা দেবীর প্রগতিমূলক কার্যসমূহের দ্বারা বিশেষভাবে লাহোরে এবং সাধারণভাবে পঞ্জাবে এক নূতন পরিবেশের সৃষ্টি হয়। বিষয়টি এখনও অনেকের স্মৃতিপথে জাগরূক রহিয়াছে।

প্রথম মহাসমর ও বাঙালী সেনাদল : সৈন্য বিভাগে প্রবেশে বাঙালীদের পক্ষে লিখিত ও অলিখিত বহু বাধানিষেধ ছিল। প্রাক্-বিবাহ যুগে সরলা দেবী 'ভারতী'র মাধ্যমে এই বাধা বিদূরণের নিমিত্ত লেখনী পরিচালনা করেন। আবার, বঙ্গসন্তানদের শারীরিক শক্তি ও মানসিক বল উদ্বোধনের জন্য সভা-সমিতি এবং অনুষ্ঠান-উৎসবেব আয়োজনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। প্রথম মহাসমরের ঘোর সঙ্কট সময়ে, ১৯১৭ সনে, বাঙালী সন্তানদের সৈন্যবিভাগে প্রবেশের বাধা তিরোহিত হয়। তখন তাহারা দলে দলে যাহাতে সৈনাদলে ভর্তি হয় সেজন্য স্বদেশীয় নেতারা আন্দোলন উপস্থিত করেন। তাঁহারা নানা স্থানে সাধারণ সভার আয়োজন করিয়া যুবকগণকে সৈন্যবিভাগে প্রবেশ করিতে আবেগপূর্ণ ভাষায় উপদেশ দিতেন। আমাদের কৈশোরেও এই উপদেশ শুনিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল।

সরলা দেবী ১৯১৭ সনে লাহোর হইতে বাংলা দেশে আসিলেন এবং এখানে কিছুকাল থাকিয়া তাঁহার প্রচারিত পূর্বাদর্শ-মত বাঙালী যুবকদের সৈন্যদলে ভর্তি হইতে আবেদন জানাইলেন। তিনি কলিকাতা হইতে হুগলি, চুঁচুড়া, চন্দননগর, উত্তরপাড়া প্রভৃতি স্থানে উক্ত উদ্দেশ্যে গমন করেন। তিনি এই সময় প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, যুদ্ধকার্যে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য তিনি সঙ্গীতাদিও রচনা করেন। ইহাতে তৎকর্তৃক সুর সংযোজিত হইয়া এই-সকল সাধারণ সভায় গীতও হইতে লাগিল। তাঁহার 'যুদ্ধসঙ্গীত' ১৩২৪ সনের ফাল্গুন সংখ্যা 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয়। উক্ত সভাগুলিতে প্রদত্ত বক্তৃতাসমূহের সারাংশও এই সময়কার 'ভারতী'তে স্থান পাইয়াছিল। 'আহ্বান' (চৈত্র ১৩২৪), 'উদ্বোধন' (বৈশাখ ১৩২৫), 'অগ্নিপরীক্ষা' (জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫) প্রভৃতি রচনাগুলি এখানে উল্লেখযোগ্য। সরলা দেবী নিতান্ত কর্তব্য-

বোধেই প্রথম মহাসমরকালে বাঙালী যুবকদের রণবৃত্তি গ্রহণে অনুপ্রাণিত করেন।

পঞ্জাবের হাঙ্গামা—মহাত্মা গান্ধী—রাজনৈতিক কার্য ঃ যে আশা-ভরসায় সরলা দেবী ও অন্যান্য নেতারা বাঙালী যুবকদের সৈন্যদলে ভর্তি হইতে উদ্বুদ্ধ করেন তাহা অকস্মাৎ বিলুপ্ত হইয়া গেল। সর্বত্র বিপ্লবী সন্দেহে ভারতবাসিগণকে আটকবন্দী করিবার ব্যাপক ক্ষমতা লইয়া রৌলট আইন বিধিবদ্ধ হইল। ইহার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী বিক্ষোভকে মহাত্মা গান্ধী প্রকাশ্য রূপ দিলেন 'সত্যাগ্রহ' কথাটির মধ্যে। বিক্ষোভের ফলে নানা স্থানে হাঙ্গামা উপস্থিত হইল। বিক্ষুব্ধ জনতাকে দমন করিতে গিয়াই সরকারী ধুরন্ধরগণ এই হাঙ্গামা বাধাইল। পঞ্জাবে এই হাঙ্গামা চরমে উঠিল। ইহার পরিণতি হয় জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডে। দত্তচৌধুরী পরিবারের উপর সরকারের কোপ পড়িল বিশেষ করিয়া। 'হিন্দুস্থান' উর্দু ও ইংরেজী সংস্করণ দুই-ই সরকার বন্ধ করিয়া দিলেন। 'হিন্দুস্থান' প্রেসও বাজেয়াপ্ত হইল। পঞ্জাবের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের সঙ্গে পণ্ডিত রামভজও অনির্দিষ্ট কালের জন্য নির্বাসিত হইলেন। সরলা দেবীর এই সময়কার তেজস্বিতা সকলকেই চমক লাগাইয়া দেয়। তাঁহাকেও গ্রেপ্তার করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে কোন মহিলাকে আটক করার রীতি এদেশে তখনও চালু হয় নাই; একারণ কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইতে নিরস্ত হন। পঞ্জাবে ব্রিটিশের অকথ্য অত্যাচারের আভাস পাইয়া বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ সরকার-প্রদত্ত 'নাইট' উপাধি বর্জন করিলেন।

ভারতীয় নেতৃবৃন্দের পঞ্জাব প্রবেশে বাধা উঠিয়া গেলে তাঁহারা একে একে তথায় গমন করেন। সরলা দেবীর গৃহে মহাত্মা গান্ধীর আবাসস্থল স্থিরীকৃত হইল। সরলা দেবীর সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর পরিচয় কুড়ি বৎসরেরও পুরানো। তিনি স্বয়ং মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ ও কর্ম-পন্থায় বিশ্বাসী। পুত্র দীপক গান্ধীজীর সবরমতী আশ্রমে অধ্যয়নরত। সত্যাগ্রহ প্রচেষ্টায়ও তাঁহার সমর্থন ষোল আনা। মহাত্মা গান্ধীকে এই সময় বেশ কিছুকাল সরলা দেবীর গৃহে অবস্থান করিতে হয়। কারণ তখন কংগ্রেস তরফে যে কমিটি পঞ্জাবের অনাচার, মায় জালিয়ানওয়ালা-বাগের হত্যাকাণ্ডের তদন্তে লিপ্ত ছিল, তিনি ছিলেন তাহার একজন সদস্য। ব্রিটিশের অত্যাচার-অনাচারের গুরুত্ব ও ব্যাপকতা দেশ-বিদেশে জানাজানি হইতে বাকী রহিল না। ১৯১৯ সনে অমৃতসর কংগ্রেস;

কংগ্রেস অধিবেশনের পূর্বেই পঞ্জাবের নির্বাসিত নেতাদের মুক্তি দেওয়া হইল; রামভজও স্বগৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

ভারতীয় রাজনীতিতে নূতন কর্মধারার প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভূত হইল। মহাত্মা গান্ধী অহিংস অসহযোগের প্রস্তাব আনিলেন। ১৯২০ সনে কলিকাতার ন্যাশনাল কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন, সভাপতি—লালা লজপৎ রায়। ইতিমধ্যে ৩১শে জুলাই নিশীথে অকস্মাৎ লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। বাংলা ও মহারাষ্ট্রের মধ্যে রাজনৈতিক যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছে গত শতাব্দীর শেষ দশকেই। লোকমান্য তিলক এবং সরলা দেবীর ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের কথা আত্মস্মৃতিতে পাওয়া যাইবে। তিলকের মৃত্যুতে সরলা দেবী স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি ছুটিয়া গেলেন বোম্বাইয়ে তিলকের বিরাট শব-শোভাযাত্রায় যোগদানের জন্য। তিলকের স্মৃতিরক্ষায় একাধিকবার নিজের মনোবেদনা অনবদ্য ভাষায় তিনি ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

'শহীদ' কথাটির আজকাল খুবই চল। ইংরেজী 'martyr' শব্দের বাংলা 'শহীদ'। কিন্তু দৈহিক মৃত্যু না ঘটিলেও কোন বিশেষ আদর্শ বা মতবাদের জন্য যিনি আত্মবলি দেন তাঁহাকেও 'শহীদ' বলা যায়। ঠিক এই অর্থেই সরলা দেবী চৌধুরাণী মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত অহিংস আন্দোলনের প্রথম মহিলা 'শহীদ'। তিনি মনপ্রাণ দিয়া অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন। চরখা-খদ্দরের প্রবর্তনে তিনি মহাত্মা গান্ধীর দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। অসহযোগ প্রচেষ্টার প্রথম দিকে তিনি ছিলেন গান্ধীজীর একান্তই সমর্থক। পণ্ডিত রামভজ ছিলেন ক্ষাত্রতেজো-দীপ্ত। তিনি অহিংসা তথা অহিংস আন্দোলনের তেমন পক্ষপাতী ছিলেন না, হয়ত এই কারণে উভয়ের মধ্যে খানিক মতানৈক্য উপস্থিত হইয়াছিল।

হিমালয়-বাস—পণ্ডিত রামভজের মৃত্যু—লাহোর ত্যাগ : সরলা দেবী প্রাক্-বিবাহ যুগে স্বামী বিবেকানন্দ তথা রামকৃষ্ণ মিশনের ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসিয়াছিলেন। কিছুকাল হিমালয়ে মায়াবতী অদ্বৈতাশ্রমে গীতা, উপনিষদ্ প্রভৃতি শাস্ত্রচর্চায়ও তিনি মন দেন। বিবাহিত জীবনে তিনি সম্পূর্ণ গার্হস্থ্য জীবন যাপন করেন। কিন্তু এই সময়ে আবার হিমালয়ের আহ্বান আসিল। তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। শাস্ত্রে পুরুষের যেমন 'বানপ্রস্থ' অবলম্বনের বিধি আছে, তেমনি নারীর কেন থাকিবে না? আর্যসমাজ-কর্তৃপক্ষ এই প্রশ্নের সদুত্তর দিতে বিলম্ব

করেন নাই। পুরুষের মত নারীরও বানপ্রস্থ অবলম্বনে বাধা নাই— তাঁহারা এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিলেন। পণ্ডিত রামভজও ইহাতে বাদ সাধেন নাই। তাঁহার নিকট হইতেও সম্মতি পাইয়া সরলা দেবী সুস্থ চিত্তে হিমালয়ে হৃষিকেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

কিন্তু তাঁহার এবারকার হিমালয়-জীবন দীর্ঘায়ত হইল না। কারণ পণ্ডিত রামভজ দত্তচৌধুরী হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। সেবাপরায়ণা সরলা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। অসুস্থতার সংবাদে তিনি স্বামীর নিকট ছুটিলেন। চিকিৎসা, সেবা-শুশ্রূষার সুব্যবস্থা সত্ত্বেও পণ্ডিত রামভজ ১৯২৩ সনের ৬ই আগস্ট মুশৌরীতে মারা গেলেন। সরলা দেবীর পক্ষে হিমালয়ে ফিরিয়া যাওয়া আর সম্ভব হইল না। পুত্র দীপক ১৯১৮-১৯ সনে বোলপুর-শান্তিনিকেতনে অধ্যয়ন করেন। মার্শাল ল'র পরে তিনি লাহোরে ফিরিয়া গেলেন। মহাত্মা গান্ধী তাঁহাকে অতঃপর সঙ্গে করিয়া সবরমতী আশ্রমে যথোপযুক্ত শিক্ষাদানের জন্য লইয়া গেলেন। কলিকাতা পুনরায় সরলা দেবী চৌধুরাণীর কর্মস্থল হইল। এখানেই তিনি আমৃত্যু বাস করেন।

'ভারতী'-সম্পাদনা—সাহিত্যকর্ম—সাংস্কৃতিক সভা-সমিতি : পঞ্জাব-বাসকালে নানা রকমের কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যেও সরলা দেবীর বাংলা সাহিত্যচর্চা যে অব্যাহত ছিল তাহার উল্লেখ ইতিপূর্বে করিয়াছি। তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পুনরায় সাহিত্যসেবায় মনঃসংযোগ করিলেন। 'ভারতী'র সম্পাদনা-ভার স্বতঃই তাঁহার উপর পড়িল। তিনি ১৩৩১ সালের বৈশাখ মাস হইতে 'ভারতী'-সম্পাদনা শুরু করিলেন। তিনি আড়াই বৎসর পর্যন্ত একাদিক্রমে 'ভারতী'-সম্পাদনায় লিপ্ত ছিলেন। এই সময়ে তাঁহার সাহিত্যচর্চা পুনরায় পূর্ণোদ্যমে আরম্ভ হইল। গল্প, উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ সর্ববিধ রচনায়ই তিনি হস্তক্ষেপ করিলেন। এ সময়ে তাঁহার বড়মামা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং দিদি হিরণ্ময়ী দেবী পরলোকগমন করেন। তাঁহাদের উপরে লিখিত সরলা দেবীর প্রবন্ধ দুইটিতে অনেক নূতন কথা জানা যাইতেছে।

তাঁহার কৃতি শুধু 'ভারতী'র পৃষ্ঠায়ই নিবদ্ধ রহিল না। তিনি এই সময় কলিকাতা ও বিভিন্ন অঞ্চলে সাহিত্য-সংস্কৃতিমূলক সভা-সমিতিতে আহূত হইতে লাগিলেন। তাঁহার ভাষণসমূহ 'ভারতী'তে যথাসময়ে প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহার ভাবধারণা এই-সকল পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ায় আমাদের পক্ষে জানিয়া লওয়া আজও সম্ভব।

এই প্রসঙ্গে তাঁহার 'শ্রমিক' প্রবন্ধটি (ফাল্গুন ১৩৩২) এখনও শ্রমিক আন্দোলনের দিগ্‌দর্শন হইয়া আছে। প্রেস-কর্মচারীদের সভায় সভানেত্রীরূপে তিনি যে ভাষণ দেন, তাহাই 'শ্রমিক' নামে ভারতীতে প্রকাশিত হয়। ১৩৩২ সালের ২০-২১ চৈত্র বীরভূম-সিউড়ীতে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের সপ্তদশ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইল। এই অধিবেশনে সাহিত্য-শাখার সভাপতিরূপে সরলা দেবী একটি সুচিন্তিত ভাষণ প্রদান করেন। এই অভিভাষণে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন দিক, সমস্যা ও সুকৃতির কথা অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। ইহা 'ভাষার ডোর' শীর্ষে ১৩৩৩, বৈশাখ সংখ্যা 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয়।

ভারত স্ত্রী-মহামণ্ডল—ভারত স্ত্রী-শিক্ষাসদন : সরলা দেবী কলিকাতা ফিরিয়া ভারত স্ত্রী-মহামণ্ডলকে পুনরায় সক্রিয় করিতে প্রয়াসী হইলেন। কবি প্রিয়ম্বদা দেবীর হস্তে মহামণ্ডলের কার্য পরিচালনার ভার অর্পিত ছিল। তিনি 'ভারতী'তে (বৈশাখ ১৩৩২) ভারত স্ত্রী-মহামণ্ডলের উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলী পুনঃপ্রচার করিলেন। অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারকল্পে মহামণ্ডলের কৃতিত্বের কথা পূর্বে কতকটা বলা হইয়াছে। কয়েক বৎসরের মধ্যে শুধু কলিকাতায় পাঁচ শত গৃহে অন্ততঃ তিন হাজার অন্তঃপুরস্থ মহিলাকে শিক্ষাদানে এই মণ্ডল সমর্থ হন। বাংলা দেশে, বিশেষতঃ কলিকাতায়, পর্দাপ্রথা দ্রুত উঠিয়া যাইতে থাকে। বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইল, ছাত্রীরাও দলে দলে স্কুলে ভর্তি হইতে লাগিল। ভারত স্ত্রী-মহামণ্ডলের কার্য নূতনভাবে পরিচালিত করা আবশ্যক বোধ হয়।

মহামণ্ডল পূর্ব পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া সাধারণ এবং চারু-শিক্ষাদানের নিমিত্ত একটি প্রকাশ্য শিক্ষাসদন প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হইলেন। ইহার উদ্যোগে ১৯৩০ সনের ১লা জুন ভবানীপুরে এই শিক্ষাসদন প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রীর অধীনে প্রবেশিকা পরীক্ষার মান পর্যন্ত ছাত্রীগণকে পড়াইবার ব্যবস্থা করা হইল। সরলা দেবী ছাত্রীগণকে গীতার মর্ম বুঝাইয়া দিতেন। মহামণ্ডল শিক্ষাসদনের অন্তর্গত একটি শিশু-সংরক্ষণ-কেন্দ্র খুলেন। মহামণ্ডলের গাড়ি এইসব শিশুকে বাড়ি হইতে আনয়ন এবং ফেরত পাঠানোয় ব্যবহৃত হইত। বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার দুই মাসের মধ্যেই ইহার সুনাম ছড়াইয়া পড়িল। শিক্ষয়িত্রীগণ অনেকে স্ত্রীশিক্ষাসদন হইতে স্বতন্ত্র হইয়া নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গঠন করিলেন' ভারত স্ত্রী-মহামণ্ডল অতঃপর নিজ শিক্ষা-

সদনটি ১৯৩০ সনের ৭ই আগস্ট তারিখে কলেজ স্কোয়ারস্থিত এলবার্ট হলে স্থানান্তরিত করেন। এখানেও একদল ত্যাগী কর্মী ও শিক্ষাব্রতী পাওয়া গেল। সকল শ্রেণী ও ধর্মসম্প্রদায় হইতেই ছাত্রীরা এখানে ভর্তি হইতে পারিত। ছাত্রীসংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিল। শিক্ষাসদনের ছাত্রীদের লইয়া ভারত স্ত্রী-মহামণ্ডল একটি ছাত্রীনিবাসও খুলিলেন। শিক্ষাসদন এবং ছাত্রীনিবাস পরিচালনার জন্য মহামণ্ডল একটি স্বতন্ত্র অধ্যক্ষ-সভার উপরে ভার দিলেন। অধ্যক্ষ-সভা গঠিত হয় কলিকাতার বহু গণ্যমান্য সমাজকর্মী মহিলা ও পুরুষকে লইয়া। অধ্যক্ষ-সভার শীর্ষস্থানে রহিলেন ভারত স্ত্রী-মহামণ্ডলের প্রতিষ্ঠাত্রী সরলা দেবী চৌধুরাণী। ভারত স্ত্রী-মহামণ্ডল ক্রমে ভারত স্ত্রী-শিক্ষাসদনে রূপায়িত হইল। সরলা দেবীও ইহার সংস্রব ত্যাগ করিয়া অধ্যাত্ম-জীবনের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। নিজ ভবনে অধ্যাত্ম-সঙ্ঘ স্থাপন করিয়া নিয়মিত শাস্ত্র-চর্চারও ব্যবস্থা করিলেন তিনি। তাঁহার জীবনে এক অদ্ভুত পরিবর্তন আসিল ১৯৩৫ সনের মাঝামাঝি।

গোত্রান্তর : সরলা দেবী হাওড়ার আচার্য শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ দেবশর্মার সঙ্গে পরিচিত হন ১৯৩৫ সনে। তিনি আচার্যের সঙ্গে আলাপে এবং তাঁহার শাস্ত্রব্যাখ্যায় এতই মোহিত হন যে, তিনি তাঁহাকে গুরুপদে বরণ করিয়া লইলেন। শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ "দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর আমায় যেসব উপদেশ দিয়েছেন, যাতে করে আমার মনের অন্ধকার কেটে গিয়ে আমি আলোকের নিকটস্থ হচ্ছি বলে মনে করি"—সেই-সব উপদেশ যথাযথ লিপিবদ্ধ করিয়া সরলা দেবী পুস্তকাকারে গ্রথিত করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ১৩৫৪ সালের জ্যৈষ্ঠ মাস (১৯৪৭, মে-জুন) হইতে এই-সকল 'বেদবাণী' নামে প্রকাশিত হইতে থাকে। তাঁহার আধাত্ম-জীবনের কিরূপ আমূল পরিবর্তন (যাহা তিনি 'গোত্রান্তর' কবিতায় প্রকটিত করিয়াছেন) ঘটিল তাঁহার নিজের ভাষায়ই এখানে বলিতেছি :

"নকিপুরের বন্ধুবর যতীন রায় চৌধুরী আমার বাড়িতে অধ্যাত্ম-সঙ্ঘে কোন পণ্ডিতপ্রবরের উপনিষদ ব্যাখ্যানে তৃপ্তি না পেয়ে হাওড়ায় তাঁর ঠাকুরের কথামৃত শোনাতে আমায় একদিন নিয়ে যেতে চাইলেন। শনিবার, ২১শে জুন, ১৯৩৫ সনের সকালে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলাম।

"সেখানে বিজয়কৃষ্ণ নামধেয় পুরুষটির দেহমন্দিরে যে ঠাকুরের বাস, প্রথম দিনই তাঁর সমীপস্থ হওয়া মাত্র তিনি পোঁ করে তাঁর সানাইয়ে

একটি সুর ধরে শুনিয়ে দিলেন। বৈকু রাজার গল্পচ্ছলে গুরুকে শ্রদ্ধায় সর্বস্ব অর্পণ করার কথাটা কানে তুলে দিলেন।

"আমি গুরুবরণের জন্য যাইনি। শুধু যতীনবাবুর কথায় প্রখ্যাত বিজয় চাটুজ্যের উপনিষদের রসাত্মক ব্যাখ্যান শোনবার প্রলোভনে গিয়েছিলুম, যদি আমার বাড়ির স্বাধ্যায়মণ্ডলীতে উপনিষদতত্ত্ব শোনাতে মাসে এক-আধবার আমায় কৃপা করেন। একটা সিংহকে ধরতে গিয়েছিলাম—নিজে বাঁধা পড়ে গেলুম।...

"বাড়ি ফিরে একটা ভাব মনের ভিতর আলোড়ন করতে থাকল। সেটা দুদিন পরে কবিতাকারে ফুটলো। যাঁকে উপদেষ্টা বলে, জ্ঞানী বলে শরণ নিয়েছি, যাঁর উপদেশ শুনতে আনাগোনা করছি, তাঁকে একেবারে 'গুরু' বলে কবুল সম্বোধনের সঙ্কোচ ধূলিসাৎ করলুম এত দিনে। দৃঢ়ভূমি, বদ্ধভূমি, বদ্ধমূল সংস্কারের এক একটা প্রাচীর অতি কষ্টে, অতি অনিচ্ছায় যেন একে একে পড়ে যেতে লাগল।...সে কবিতাটি এইঃ

"গোত্রান্তর

গুরো!

চৈতন্যে কর সম্প্রদান!
গোত্রান্তর কর মোরে
হে মঙ্গলনিদান!

জন্ম যার ঘোর মৃত্যুগৃহে,
নিরানন্দের কূলে,
অমৃত-পাত্রস্থ কর তারে,
দাও আনন্দ-গোত্রে তুলে!
ভয়েতে বিমূঢ় যেই চমকায়
প্রতি বায়ুহিল্লোলে,
সঁপো তারে ভয়ানাং ভয়ে,
অন্তর গোত্রে যাক সেই চলে!

নাহি যার শক্তি সাধ্য লেশ,
অন্তর শক্তির সনে
বাঁধ তার দক্ষিণ পাণি,
শক্তি গোত্র হোক শুভখনে!

অহংনিলয়ে ভেদভাবে করে
আপন পর যে জান,
আত্মা-আবাসে নিবাসিয়ে
তারে, রাখ সব ভূতগত প্রাণ!

গুরো!

আমার আমিরে দেখাও দেখাও!
করাও অভিজ্ঞান!
আনন্দ, অভয়, শক্তি, প্রেম
হউক নিত্য তব অবদান!"

শেষ জীবন—মৃত্যু : ইহার পর মৃত্যুকাল পর্যন্ত, সরলা দেবী কায়মনে ধর্মচর্চায় মন দেন। তিনি ১৯৪১ সনে 'শ্রীগুরু বিজয়কৃষ্ণ দেবশর্মানুষ্ঠিত শিবরাত্রি পূজা' প্রকাশিত করেন। 'বেদবাণী' প্রথম খণ্ড হইতে এই মাত্র উদ্ধৃত করিয়াছি। তৎ-লিখিত গুরুর উপদেশাবলী একাদশ খণ্ড (পৌষ ১৩৫৭) পর্যন্ত বাহির হয়। ১৯৪৫ সনের ১৮ই আগস্ট এই বিরাট কর্মময় জীবনের অবসান ঘটে। এই কর্মময় জীবনের একটি বিশেষ দিকের প্রতি শিক্ষিত সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। 'সাহিত্যিক' সরলা দেবীর সাহিত্য-সাধনার নিদর্শন মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায়ই আত্মগোপন করিয়া আছে। বিবিধ বিষয়ের উপরে লিখিত তদীয় সারগর্ভ রচনাবলী পুস্তকাকারে গ্রথিত হইলে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হইবে, একথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়।

সরলা দেবীর একমাত্র পুত্র শ্রীদীপক দত্তচৌধুরী বর্তমানে আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন। বিভিন্ন সামাজিক কর্মেও তাঁহার সবিশেষ অনুরাগ পরিদৃষ্ট হয়।

গ্রন্থোক্ত ব্যক্তি ও বিষয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

[সরলা দেবীর 'জীবনের ঝরাপাতা' প্রায় চল্লিশ বৎসরব্যাপী ভারতের জাতীয় ইতিহাসের আকর-গ্রন্থ হিসাবে গণ্য হইবার যোগ্য। ইহাতে বহু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ রহিয়াছে। প্রসিদ্ধ ও বহুজনবিদিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে এখানে বিবৃত করিতে বিরত রহিলাম। আবার অনাবশ্যক-বোধেও কোন কোন বিষয় বলা হইল না সকল বিষয়ে বলিতে গেলে পরিশিষ্ট অংশই একখানি বিরাট গ্রন্থ হইয়া দাঁড়ায়।]

॥ এক ॥

সৌদামিনী দেবী (১৮৪৭—১৯২০) : মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠা কন্যা। জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারে স্ত্রীশিক্ষার রেওয়াজ ছিল। গোঁসাই মেয়েরা পরিবারের স্ত্রীকন্যাদের প্রাথমিক লেখাপড়া শিখাইতেন। ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন ১৮৪৯, ৭ই মে কলিকাতা বালিকা বিদ্যালয় (পরে 'বেথুন স্কুল') স্থাপন করেন। তখন প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে বালিকাদের প্রেরণের রীতি উচ্চ ও মধ্য-স্তরের হিন্দু পরিবারে প্রচলিত ছিল না। বেথুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর হইতে প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে মেয়েদের পড়াইবার রীতি সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৫১ সনের মাঝামাঝি দেবেন্দ্রনাথ জ্যেষ্ঠা কন্যা পঞ্চম বর্ষীয়া সৌদামিনীকে এই স্কুলে ভর্তি করিয়া দেন। এই ঘটনাটির কথা তখন সামাজিক পত্রের সংবাদ-স্তম্ভেও প্রকাশিত হইয়াছিল। জুলাই ১৮৫১ সংখ্যা 'দি ক্যালকাটা ক্রিশ্চিয়ান অবজার্ভার' লেখেন:

"One of the most influential natives in Calcutta, Debendranath Tagore, has added his own daughter to the long list of eighty female children already receiving instruction in the Institution, and the Raja Kali Krishna Bahadur, who occupies the prominent position in Hindu Society in the metropolis has accepted the office of its president."

দেবেন্দ্রনাথ ৮ই জুলাই ১৮৫১ তারিখে রাজনারায়ণ বসুকেও এই বিষয়টির কথা এক পত্রে এইরূপ লিখিলেন, "আমি বেথুন সাহেবের বালিকা বিদ্যালয়ে সৌদামিনীকে প্রেরণ করিয়াছি, দেখি ও দৃষ্টান্তে ফল কি হয়?" (পত্রাবলী, পৃ. ৪১) সৌদামিনী দেবীকে 'পিতৃস্মৃতি'তেও (প্রবাসী—ফাল্গুন ১৩১৮) বলিয়াছেন যে, তাঁহার পিতৃদেব তাঁহাকে এবং তাঁহার খুড়তুতো বোনকে বেথুন স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন।

সৌদামিনী দেবীর বিবাহ হয় বড়বাজারস্থ বিখ্যাত গঙ্গোপাধ্যায় বংশের অবিনাশ-চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র সারদাপ্রসাদের সঙ্গে (১৮৫৫?)। ঠাকুর বাড়ির রীতি অনুযায়ী সারদাপ্রসাদ ঘরজামাই ছিলেন। তিনি দেবেন্দ্রনাথের জমিদারী পরিচালনায় নিযুক্ত হন। দেবেন্দ্রনাথ-পরিচালিত বিভিন্ন সমাজ-কর্মের সঙ্গে তাঁহার যোগ ছিল। ব্রাহ্মবিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হইবার প্রাক্কালে আর্য্য-ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে, ভারত সরকারের নিকট লিখিত প্রতিবাদ জ্ঞাপনের জন্য নবগোপাল মিত্রের সঙ্গে সারদাপ্রসাদ সিমলায় যান। সৌদামিনী স্নেহবৎসল ও সেবাপরায়ণ ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের পত্নী-বিয়োগের

(১৮৭৫) পর তিনিই গৃহকর্ত্রীরূপে বিরাট পরিবারের সর্বকিছু আগলাইয়া রাখিতেন। তাঁহার উপর দেবেন্দ্রনাথের আস্থা ও নির্ভর ছিল যথেষ্ট।

সুকুমারী দেবী (১৮৫০—৬৪)ঃ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বিতীয়া কন্যা। ব্রাহ্মসমাজের 'অনুষ্ঠান-পদ্ধতি' রচিত হইলে, সর্বপ্রথম ব্রাহ্মমতে সুকুমারীর বিবাহ হইল (১৮৬১)। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে এই বিবাহটি একারণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং এই পদ্ধতি অনুসারে একটি বিবাহপ্রণালী রচনা করেন। এই প্রণালীটি সুকুমারী দেবীর বিবাহে পূর্ণরূপে অনুসৃত হয়। এই প্রণালীটি সমূহই 'তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা' ভাদ্র ১৭৮৩ সালে প্রকাশিত হয়। ইহা হইতে সংবাদ-অংশ এখানে প্রদত্ত হইল ঃ

"ব্রাহ্মবিবাহ। গত ১২ই শ্রাবণ শুক্রবার ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যবস্থানুসারে শ্রীযুক্ত রাজারাম মুখোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়ের সহিত শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কন্যার শুভ বিবাহ অতি সমারোহ পূর্ব্বক সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গলাদেশে ব্রাহ্মধর্ম্মানুযায়ী বিবাহের এই প্রথম সূত্রপাত হইল। বিবাহ-সভায় লোকের বিস্তর সমাগম হইয়াছিল। আহ্লাদের বিষয় এই যে প্রায় দুই শত ব্রাহ্ম সভাস্থ হইয়া যথাবিধানে কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাহা যেরূপ পদ্ধতি-ক্রমে নির্ব্বাহ হইয়াছে, অবিকল তাহা নিম্নে প্রকাশিত করা গেল...।"

জানকীনাথ ঘোষাল (১৮৪০—১৯১৩) ঃ জানকীনাথ ঘোষালের জ্যেষ্ঠা কন্যা হিরন্ময়ী দেবী শ্রাদ্ধবাসরে তাঁহার একটি সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত পাঠ করেন। ইহার মূল অংশ এখানে উদ্ধৃত হইল ঃ

"নদীয়ার জয়রামপুরের ঘোষালবংশে প্রায় ৭৩ বৎসর পূর্ব্বে পিতৃদেবের জন্ম হয়। আমাদের পিতামহ 'জয়চন্দ্র ঘোষালের দুই পুত্র ছিলেন; তন্মধ্যে পিতামহাশয় কনিষ্ঠ। এই ঘোষালবংশ অসাধারণ বলবীর্য্যের জন্য প্রসিদ্ধ। তাঁহাদের জয়রামপুরের পৈতৃক জমিদারী সম্বন্ধে এই প্রসিদ্ধি আছে যে, ঘোষালদিগের কোন পূর্ব্বপুরুষ উহা বীর্য্যবত্তার পুরস্কার স্বরূপ. কৃষ্ণনগরের রাজার নিকট হইতে প্রাপ্ত হন।...

"জানকীনাথের নিজ ইচ্ছামতই পিতামহ মহাশয় তাঁহাকে কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে বিদ্যাশিক্ষার্থ পাঠান। তদানীন্তন প্রিন্সিপ্যাল প্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের তিনি প্রিয় শিষ্য ছিলেন। এইখানেই তিনি 'রামতনু লাহিড়ী, 'রাধিকা-প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, 'কালীচরণ ঘোষ, 'রায় যদুনাথ রায় বাহাদুর (কৃষ্ণনগর রাজার দৌহিত্র) প্রভৃতি বন্ধুগণের সংস্পর্শে আসেন। রামতনু লাহিড়ী প্রমুখ মনীষিগণের উপদেশ ও উত্তেজনায় পিতামহাশয় ও আরও কতিপয় ছাত্র জাতিভেদে বিশ্বাসশূন্য হন, এবং যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করেন। আমাদের পিসেমহাশয় 'পরেশনাথ মুখোপাধ্যায়ও ইহাদের মধ্যে একজন। উপবীতত্যাগবার্ত্তা শুনিয়া পিতামহ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে ত্যাজ্যপুত্র করেন, কিন্তু শুনিতে পাই পিতামহী ইহাতে মোটেই রাগ করেন নাই, বলিয়াছিলেন ছেলের যাহা সত্য মনে হয় তাহাই করিয়াছে, তাহা করুক। কিন্তু ঠাকুরদাদা অনেকদিন পর্য্যন্ত তাঁহাকে ক্ষমা করিতে পারেন্ নাই। এমনকি জ্যেঠা-মহাশয়ের মৃত্যু হইলে পিতাকে বঞ্চিত করিবার জন্য অনেক বিষয়-সম্পত্তি তিনি বিক্রয় করিয়া ফেলেন; তথাপি পিতৃদেব স্বার্থের জন্য নিজের মত ও বিশ্বাস ত্যাগ করেন নাই, পিতার ক্রোধবজ্র মাথায় লইয়া এই সময় তিনি নানা সমাজসংস্কার কার্য্যে ব্রতী ছিলেন, এবং নিজ ব্যয়নির্ব্বাহার্থে পুলিশে কর্ম্ম গ্রহণ করেন, কিন্তু তাঁহার ন্যায় লোকের পুলিশের সব কার্য্য অনুমোদন করিয়া সদ্ভাবে চলা অধিকদিন সম্ভব নহে তাহা বলা বাহুল্য।

"এই সময় মাতামহ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কৃষ্ণনগরে যান ও এই সুদর্শন উৎসাহী সমাজ-সংস্কারক যুবককে দেখিয়া প্রীত ও আকৃষ্ট হয়েন এবং কয়েক বৎসর পরে

মাতৃদেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ স্থির হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, পিতা বিবাহ করিতেছেন শুনিয়া ঠাকুরদাদা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েন এবং এই সময় হইতে আবার তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া অন্তরের সহিত তাঁহাকে পুনর্গ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতায় আসিয়া মূল্যবান অলঙ্কার দ্বারা বধূর মুখদর্শন করেন এবং তখন হইতে মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় আমাদের বাটীতে আসিয়া বাস করিতেন ও আমাদের লইয়া আহারাদি করিতেন। সেকালের হিসাবে তাঁহারও প্রকৃতি উদার ছিল। ব্রাহ্মণত্বের চিহ্ন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করায় তাঁহার মনে আঘাত লাগিয়াছিল কিন্তু অনেকগুলি ছোট ছোট কুসংস্কার তিনি নিজেই মানিতেন না।

"বিবাহকালে পিতৃদেব মাতামহ পরিবারের ২টী রীতি গ্রহণ করেন নাইঃ— ১। ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ, ২। ঘরজামাই থাকা। এই সময় তিনি ডেপুটী কলেক্টর ছিলেন। মাতৃদেবীর যখন বিবাহ হয়, তখন তাঁহার বয়স ১২ বৎসর মাত্র। মাতামহ কন্যার যে শিক্ষা পত্তন করেন স্বামীর যত্নে তাহা পরিস্ফুট হইয়া উঠে। পিতা তাঁহার কন্যাদ্বয়কে পুত্রনির্ব্বিশেষে শিক্ষা দিয়া আসিয়াছেন, ইহা সকলেই জানেন। মাতৃদেবী ও আমরা যে কোন সৎকার্য্যের বা দেশহিতকর কার্য্যের প্রয়াস পাইয়াছি তাহার তিনি প্রধান সহায় ও উদ্যোগী ছিলেন। পূজনীয় মাতুল সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমাজসংস্কার-প্রযত্নে তিনিই সর্ব্বপ্রধান সহায় ছিলেন। তাঁহার বন্ধু-বাৎসল্য যে কি গভীর ছিল, তাহা প্রত্যক্ষ ফললাভ দ্বারা তাঁহার অনেক বন্ধুই বিশেষ ভাবে অবগত আছেন।...

"বিবাহের পরেই পিতার বিলাত যাইবার প্রস্তাব হওয়ায় তিনি ডেপুটী কলেক্টরের পদ ত্যাগ করেন। কিন্তু নানা অভাবিত কারণে সেই সময় বিলাত যাওয়ায় বাধা পড়ায় তিনি স্বাধীন জীবিকার জন্য ব্যবসা-বাণিজ্য আরম্ভ করেন। সেই সূত্রে বেরিণী কোম্পানীর হোমিওপ্যাথিক দোকান তিনি ক্রয় করেন। তাহা খুব লাভজনক ছিল। বিক্রয় করিবার অল্পদিন পরে—তাহার পূর্ব্ব মালিক তাহা পুনর্লাভে ইচ্ছুক হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শরণাপন্ন হন। বিদ্যাসাগর মহাশয় পিতৃদেবের একজন বিশেষ বন্ধু ছিলেন। বিদ্যাসাগরের অনুরোধে পিতা গভীর স্বার্থত্যাগ করিয়া দোকান ফিরাইয়া দিলেন।...

"রোগীর সেবা তাঁহার একটি প্রধান ব্রত ছিল। পরিবারের সকলেই এবিষয়ে সাক্ষ্য দিতে পারিবেন।...গরীব দুঃখীর সেবার জন্য তিনি ঘরে বসিয়া হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসা শিক্ষা করিয়া বিনা পয়সায় ডাক্তারী করিতেন। কাশিয়াবাগান বাগানবাড়ীতে আমরা যখন ছিলাম—তখন দেখিয়াছি, রোজ সকালে পাড়ার আর্ত্তলোকে বাড়ী ভাঙিয়া যাইত। ভোর হইতে রোগী দেখিয়া ঔষধ বিতরণ করিতে করিতে বেলা দশটা এগারটা বাজিয়া যাইত। তাহার পর তিনি স্নান আহার করিতেন।

"আইনে তাঁহার বিশেষরূপ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখিয়া তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে বিলাত যাইয়া ব্যারিষ্টার হইবার পরামর্শ দেন এবং তিনি আমাদের মাতুলালয়ে রাখিয়া বিলাত যাত্রা করেন। সেখানে অধিকাংশ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন কিন্তু শেষ পরীক্ষার পূর্ব্বেই ছয় বৎসর বয়স্কা কনিষ্ঠা কন্যার মৃত্যু সংবাদে তাঁহাকে দেশে ফিরিতে হয়। ইচ্ছা ছিল আবার যাইয়া শেষ পরীক্ষা দিবেন এবং তজ্জন্য বরাবর ফি দিয়া নাম বজায় রাখিয়াছিলেন, কিন্তু ঘটনাচক্রে আর যাওয়া হয় নাই।...

"কলিকাতায় প্রায় সব সাধারণ হিতকর কর্য্যেই তাঁহার যোগ ছিল। অনেক বৎসর তিনি মিউনিসিপ্যাল কমিশনার ছিলেন। মেকেঞ্জি বিলের প্রতিবাদে যে ২৮ জন কমিশনার পদত্যাগ করেন, তন্মধ্যে তিনি একজন। শিয়ালদহ ও লালবাজার দুই কোর্টেই তিনি অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। বৎসরাবধি তাঁহার শরীর অসুস্থ ছিল, মধ্যে মধ্যে এক একবার শয্যাগত থাকিতেন, কিন্তু একটু সুস্থবোধ করিলেই কোর্টে ও অন্যান্য কার্য্যে যাইতেন, আমাদের নিষেধ মানিতেন না। এরূপ কর্ত্তব্যনিষ্ঠা বিরল।

"ইঁহার সংকলিত 'Celebrated Trials in India' নামক পুস্তক সাধারণের একটি বিশেষ অভাব দূর করিয়াছে।

"পাবলিক কার্য্যের মধ্যে তাঁহার সবচেয়ে প্রিয় কার্য্য ছিল—ইন্ডিয়ান ন্যাসনাল কংগ্রেস। হিউমের উদ্বোধনে এটি জানকীনাথের স্বহস্তে রোপা, স্বহস্তে জল সেচন করা ও স্বহস্তে বাড়ান জাতীয়—মহীরুহ। কংগ্রেসের জীবন আজ ২৮ বৎসর, আজ অনেকেই ইহার বন্ধু, সহায় ও মুরুব্বী, কিন্তু যতদিন এ নাবালক ছিল, ততদিন জানকীনাথই ইহার প্রধান অভিভাবক ছিলেন।

"যে সময়ে অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন মাদাম ব্লাভাট্স্কি ভারতবর্ষে আসিয়া থিয়সফি প্রচার করেন সে সময় জানকীনাথ থিয়সফিস্ট সম্প্রদায়ভুক্ত হন। মিঃ হিউমও থিয়সফিস্ট ছিলেন। সেকালে বৎসরান্তে মাদ্রাজে একটি থিয়সফিক্যাল কনফারেন্স হইত, ভারতবর্ষের সকল অংশ হইতে থিয়সফিস্টগণ সেখানে আসিয়া সম্মিলিত হইতেন। এইরূপ সম্মিলনী হইতেই হিউম সাহেবের একটি ভাবের স্ফুরণ হইল যে, সমগ্র ভারতবাসীর এরূপ একটি পলিটিক্যাল সম্মিলনী গড়িয়া তুলিতে পারিলে ভারতবাসীর অশেষ মঙ্গল হইবে। এই ভাব হইতেই কংগ্রেসের উৎপত্তি এবং সেই ভাবটিকে কাজে পরিণত করার মূলে ছিলেন জানকীনাথ ঘোষাল। তিনি তখন কিছুকালের জন্য এলাহাবাদে থাকিয়া "Indian Union" নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন। কংগ্রেসের আরম্ভ হইতে তিনি যে কিরূপ ভাবে ইহার জন্য কাজ করিয়াছেন, ধন প্রাণ মন দিয়া সকলের তিরস্কার নিগ্রহ সহ্য করিয়া অম্লানচিত্তে কার্য্য করিয়া গিয়াছেন তাহা সর্ব্বজনবিদিত।..."

উমেশচন্দ্র গুপ্ত : পুরা নাম উমেশচন্দ্র দত্তগুপ্ত, সাধারণতঃ উমেশচন্দ্র দত্ত নামেই পরিচিত। উমেশচন্দ্র কৃষ্ণনগর কলেজের খ্যাতিমান্ ছাত্র ছিলেন। তিনি প্রথমে কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকতা করেন। পরে কৃষ্ণনগর কলেজে ইতিহাস ও সাহিত্যের অধ্যাপক হন। তিনি ১৮৭৫ সনে কলেজের অস্থায়ী অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। স্কুল-বিভাগে শিক্ষকতাকালে উমেশচন্দ্র কর্তৃক জানকীনাথ বিশেষ প্রভাবিত হইয়াছিলেন।

স্ত্রী : স্বর্ণকুমারী দেবী (? ১৮৫৫-১৯৩২) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্থী কন্যা। স্বর্ণকুমারী গৃহে বসিয়া শিক্ষালাভ করেন। জানকীনাথ ঘোষালের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয় ১৭ নবেম্বর ১৮৬৭ তারিখে। এই বিবাহের সংবাদ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় (পৌষ ১৭৮৯ শক) এইরূপ বাহির হয় :

"ব্রাহ্ম-বিবাহ। গত ২ অগ্রহায়ণ রবিবার ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য্য শ্রদ্ধাস্পদ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্থ কন্যার সহিত কৃষ্ণনগরের অন্তঃপাতী জয়রামপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু জানকীনাথ ঘোষালের ব্রাহ্মবিধানানুসারে বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বরের বয়ঃক্রম ২৭ বৎসর কন্যার বয়ঃক্রম ১৩ বৎসর। এই বিবাহ উপলক্ষে দেশ-বিদেশ হইতে বহুসংখ্যক ভদ্রলোক ও ব্রাহ্মণপণ্ডিত উপস্থিত হইয়াছিলেন।"

স্বর্ণকুমারী দেবী বাংলা, সংস্কৃত এবং ইংরেজী ভাষায় ব্যুৎপন্ন হন। অল্প বয়সেই তিনি সাহিত্য-চর্চা আরম্ভ করেন। তিনি 'ভারতী' সম্পাদনা করেন ১২৯১ হইতে ১৩০১ সাল এবং ১৩১৫ হইতে ১৩২১ সাল পর্যন্ত। গল্প, উপন্যাস, কবিতা, বৈজ্ঞানিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রবন্ধ প্রভৃতি রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। স্বর্ণকুমারীর সাহিত্য-সাধনার বিষয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'স্বর্ণকুমারী দেবী, মীর মশার্রফ হোসেন' পুস্তকখানি পঠিতব্য।

স্বামী জানকীনাথের সঙ্গে স্বর্ণকুমারীও থিয়সফিতে বিশ্বাসী হন। বঙ্গদেশীয় থিয়সফিক্যাল সোসাইটির মহিলা শাখার সভাপতি ছিলেন স্বর্ণকুমারী। এই সূত্রে তিনি বহু সম্ভ্রান্ত মহিলার সংস্পর্শে আসেন। সোসাইটির মহিলা শাখা উঠিয়া গেলে

এই সকল নারী সভ্যদের লইয়া তিনি 'সখি-সমিতি' গঠন করেন। এবিষয়ে যথাস্থানে বলা হইবে। তিনি আমৃত্যু কন্যা হিরন্ময়ী দেবীর 'বিধবা শিল্পাশ্রমে'র সভাপতি ছিলেন। তিনি ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে এই শিল্পাশ্রমকে তাঁহার রচিত যাবতীয় পুস্তকের স্বত্ব দান করেন।

কংগ্রেসের সহিত জানকীনাথের ঘনিষ্ঠ যোগের কথা বলা হইয়াছে। স্বর্ণকুমারী কংগ্রেসী রাজনীতির চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৮৯০ সনে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে তিনি প্রতিনিধিরূপে যোগ দিয়াছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় স্বর্ণকুমারী জাতীয় সঙ্গীত রচনা দ্বারা দেশবাসীকে স্বদেশীমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন।

স্বর্ণকুমারী বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনীর কলিকাতা অধিবেশনে (১৯২৮) সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। তিনি শ্রেষ্ঠ লেখিকারূপে ১৯২৭ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' লাভ করেন। ১৯৩২, ৩ জুলাই তিনি দেহত্যাগ করেন।

ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায় (১৮৬০—১৯২৭) : হিরণ্ময়ী দেবীর স্বামী। ফণিভূষণের পিতার নাম অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়। ১৮৬০, নবেম্বর মাসে যশোহরের জয়দিয়া গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। ফণিভূষণ পিতৃব্য পরেশনাথ মুখোপাধ্যায়ের ঢাকা বাসাবাটীতে থাকিয়া পড়াশুনা করেন। পরেশনাথ ছিলেন জানকীনাথ ঘোষালের ভগিনীপতি। পাঠ্যাবস্থাতেই ফণিভূষণ পিতৃব্যের সহিত কলিকাতাস্থ ঘোষাল-ভবনে যাইতেন। ক্রমে এই পরিবারের সঙ্গে ফণিভূষণের ঘনিষ্ঠতা জন্মে। ফণিভূষণ গিলক্রাইস্ট বৃত্তি লইযা ১৮৭৮ সনে বিলাত গমন করেন। তিনি ১৮৮১ সনে লণ্ডন ইউনিভার্সিটি হইতে বি-এস্‌সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। উদ্ভিদ-বিদ্যা এবং দর্শনে তিনি অনার্স পান, এবং রসায়নে স্বর্ণপদক লাভ করেন। ফণিভূষণ ১৮৮৩, জুলাই মাসে সরকারী শিক্ষা-বিভাগে কার্যে নিযুক্ত হন এবং রাজসাহী কলেজে অধ্যাপক হইয়া যান। হিরণ্ময়ী দেবীর সঙ্গে ফণিভূষণের এই সময়ে বিবাহ হয়। রাজসাহী কলেজ, হুগলী কলেজ এবং প্রেসিডেন্সী কলেজে পর পর অধ্যাপনা করিয়া পরে তিনি প্রেসিডেন্সী বিভাগের ইন্‌সপেক্টর পদে বৃত হন। তিনি এই পদে কার্য করিতে করিতে সরকারী কর্ম হইতে ১৯১৫ সনে অবসর গ্রহণ করেন। ইহার পর ফণিভূষণ ১৯১৭ সন হইতে তিন বৎসর যাবৎ ইন্দোর স্টেটে ডি-পি-আই বা 'শিক্ষা-অধিকর্তা'র কার্য করেন। ১৯২৭, ১৪ই ডিসেম্বর তিনি মারা যান। ফণিভূষণ বিজ্ঞানের অধ্যাপনা কালে সাহিত্য-সাধনাও করিয়া গিয়াছেন। 'ভারতী' মাসিকে বিজ্ঞানবিষয়ক তাঁহার বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। 'উচ্চশিক্ষা সুহৃদ' ও 'নিম্নশিক্ষা সুহৃদ' নামে দুইখানি শিক্ষাবিজ্ঞান-সংক্রান্ত পুস্তকও তিনি লিখিয়াছেন। পত্নী হিরণ্ময়ী দেবীর সর্ববিধ জনহিতকর কার্যে তিনি সহায় ছিলেন।

দিদি : হিরণ্ময়ী দেবী (১৮৬৮—১৯২৫)। হিরণ্ময়ী দেবী সম্বন্ধে পুস্তকে নানা স্থানে উল্লেখ আছে। 'হিরণ্ময়ী' শিরোনামার একটি অধ্যায়ও ইহাতে সংযোজিত হইয়াছে। হিরণ্ময়ীর মৃত্যুর পর সরলা দেবী তাঁহার সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লেখেন। এখানে তাঁহার জীবন-সংক্রান্ত কয়েকটি বিষয়ের মাত্র উল্লেখ করিব। হিরণ্ময়ী দেবী বেথুন কলেজের ছাত্রী ছিলেন এবং এখান হইতে ১৮৮২ সনে তিনি মাইনর পরীক্ষা পাস করেন। 'বামাবোধিনী পত্রিকা'র (পৌষ ১২৮৮) সংবাদ-স্তম্ভে সংবাদটি এইরূপ বাহির হয় :

"এবার মাইনর পরীক্ষায় বেথুন স্কুলের ছাত্রী কুমারী শৈলবালা দাস এবং হিরণ্ময়ী দেবী ২য় বিভাগে এবং কুমারী গিরিবালা মজুমদার ৩য় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।"

হিরণ্ময়ীর স্কুলের শিক্ষা হয়ত আর অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই, তবে তিনি যে প্রায় এই সময় হইতেই বাংলা গদ্যপদ্য রচনায় হস্তক্ষেপ করেন, 'সখা' পাঠে তাহা জানা যাইতেছে। 'সখা', 'বালক', 'ভারতী ও বালক' এবং 'ভারতী'তে ক্রমশঃ তাঁহার গদ্যপদ্য রচনা প্রকাশিত হইতে থাকে। তিনি সরলা দেবীর সঙ্গে একযোগে ১৩০২ হইতে ১৩০৪ সাল পর্যন্ত 'ভারতী' সম্পাদনা করেন। স্বদেশী আন্দোলন কালে নারীজাতিকে দেশসেবায় অনুপ্রাণিত করিবার উদ্দেশ্যে হিরণ্ময়ী লেখনী পরিচালনা করেন। এই সময় তাঁহার কতকগুলি দেশপ্রেমোদ্দীপক রচনা 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয়।

হিরণ্ময়ী দেবী ১৯০৬ সনে 'বিধবা শিল্পাশ্রম' প্রতিষ্ঠা করেন। এই শিল্পাশ্রমের কার্যে তিনি নিজেকে সঁপিয়া দিয়াছিলেন। যথাস্থানে এ বিষয়টি সম্বন্ধে উল্লিখিত হইবে।

১৯২৫, ১৩ই জুলাই হিরণ্ময়ী দেবীর দেহান্ত ঘটে। তাঁহার মাতাপিতার প্রতি ভক্তি ছিল অসামান্য।

দাদা : শ্রীজ্যোৎস্নানাথ ঘোষাল। জন্ম ১৮৭১ সন। তিনি আই-সি-এস হইয়া বোম্বাইয়ে স্থিত হন। ১৯৩০ সনে অবসর গ্রহণ করেন।

॥ দুই ॥

বিষ্ণু : বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তী (১৮০৪—১৯০০)। রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে বিষ্ণুচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের গায়ক ছিলেন। সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর একক্রমে গায়কের কার্য করিয়া ১৮৩৩ সনে বিষ্ণুচন্দ্র অবসর গ্রহণ করেন। অবসর-গ্রহণ কালে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (ফাল্গুন ১৮০৪ শক) লেখেনঃ

"পঞ্চাশ বৎসর অতীত হইল মহাত্মা রামমোহন রায়ের সময় হইতে শ্রীযুক্ত বিষ্ণুরাম চক্রবর্তী আদি ব্রাহ্মসমাজে অতি নিপুণতার সহিত সঙ্গীত করিয়া আসিযাছেন। তিনি এক্ষণে বার্দ্ধক্য নিবন্ধন অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। অতঃপর এইরূপ মধুব কণ্ঠে ব্রহ্মসঙ্গীত আর শুনিতে পাইবেন কিনা সন্দেহ। যাঁহারা শ্রদ্ধান্বিত হইয়া উপাসনায় যোগ দিয়া আসিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে প্রায় এমন কেহই নাই বিষ্ণুর মধুর সঙ্গীতে যাঁহার অশ্রুপাত না হইয়াছে। বহু দিনের পর ব্রাহ্মসমাজে আমাদের একটি অভাব উপস্থিত হইল। পূরণ হইবে কিনা ঈশ্বর জানেন।......"

বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ১৯০০ সনের ৫ই মে দেহত্যাগ করেন। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (জ্যৈষ্ঠ ১৮২২) তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ এইরূপ প্রকাশিত করেন ঃ

"সংবাদ। আমরা শোকসন্তপ্ত হৃদযে প্রকাশ করিতেছি আদি-ব্রাহ্মসমাজের সুপ্রসিদ্ধ গায়ক বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ২২ বৈশাখ ইহলোক পরিত্যাগ করিযাছেন। ইহার বয়ঃক্রম ৯৬ বৎসব হইয়াছিল। মহাত্মা রামমোহন রায়ের সময় হইতে ইনি ব্রাহ্মসমাজে সঙ্গীত করিতেন। ইহার সুকণ্ঠে তান মান রাগ রাগিণী রক্ষা করিয়া ব্রহ্মসঙ্গীত গাইতে আর কেহই রহিলেন না। ঈশ্বর ইঁহার অমর আত্মার কল্যাণ সাধন করুন।"

॥ তিন ॥

সেজ মামা : হেমেন্দ্রলাল ঠাকুর (১৮৪৫—১৮৮৪)। ঠাকুর-পরিবারের অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ উদ্যোগী। হেমেন্দ্রনাথ স্বয়ং পরিবারস্থ মহিলাদিগকে সাহিত্যাদি বিষয় সাগ্রহে পড়াইতেন। ঠাকুরবাড়ীর বধূ ও কন্যাদের স্মৃতিকথা হইতে এ বিষয় কিছু কিছু জানা যায়। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী বলেন ঃ

"বিয়ের পর সেজ দেয়র হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইচ্ছে করে আমাদের পড়াতেন।

আমরা মাথায় কাপড় দিয়ে তাঁর কাছে বসতুম আর এক এক বার ধমকে দিলে চমকে উঠতুম। আমার যা কিছু বাংলা শিক্ষা মেজঠাকুরপোর কাছে পড়ে। মাইকেল প্রভৃতি শক্ত বাংলা বই পড়াতেন, আমার খুব ভাল লাগত।"

স্বর্ণকুমারী দেবী লিখিয়াছেন :

"এক্ষণে সেজদাদা মহাশয় তাঁহার পত্নীকে ওস্তাদের নিকট গান শিক্ষা দিতে লাগিলেন। বাড়ীর ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা গানবাজনা লেখাপড়া সর্বরকমে বেশ ভাল করিয়া শিক্ষা পাইতে লাগিল। দিদিরা পর্য্যন্ত ঘরে থাকিয়া ইংরেজী শিখিতে আরম্ভ করিলেন।"

হেমেন্দ্রনাথের পুত্রকন্যাদের মধ্যে প্রতিভা দেবীর কথা পুস্তকে একাধিকবার উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহার সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট স্থলে বলা যাইবে।

॥ চার ॥

বেথুন স্কুল : জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন ১৮৪৯, ৭ই মে এদেশীয়দের সহায়তায় কলিকাতায় এই বালিকা বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিদ্যালয়টির সঙ্গে বালীগঞ্জের 'বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়' ১৮৭৮ সনে আগস্ট মাসে সম্মিলিত হয়। এ বৎসরে এই স্কুল হইতে কাদম্বিনী বসু (পরে, গাঙ্গুলী) সর্বপ্রথম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করেন। ইহার পর এখানে কলেজ বিভাগ খোলা হয়। ১৮৮৮ সনে ইহা একটি পুরাপুরি প্রথম শ্রেণীর কলেজে পরিণত হইল। নূতন নিয়ম প্রবর্তনের পূর্বাবধি এখান হইতে মহিলারা এম-এ পরীক্ষাও দিতেন। প্রথম এম-এ উত্তীর্ণা মহিলা—চন্দ্রমুখী বসু। এই স্কুল ও কলেজের আনুপূর্বিক ইতিহাস 'Bethune College School and College Centenary Volume' পুস্তকে শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল লিখিত ইতিহাস অধ্যায়ে পাওয়া যাইবে।

সরলা দেবীকে বেথুন স্কুলে ১৮৮০ সনে নিম্ন শ্রেণীতে ভর্তি করিয়া দেওয়া হয়। এখান হইতে ১৮৮৬ সনে তিনি দ্বিতীয় বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষা উত্তীর্ণ হন। তিনি বি-এ পাস করেন ১৮৯০ সনে। বি-এ পরীক্ষোত্তীর্ণা মহিলাদের মধ্যে সর্বাধিক নম্বর পাইয়া তিনি এই সনে সর্বপ্রথম 'পদ্মাবতী মেডাল' প্রাপ্ত হন। এই মেডাল বা পদকটি মাতা পদ্মাবতীর নামে দিবার জন্য ডক্টর রাসবিহারী ঘোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যায়কে থোকে টাকা দান করিয়াছিলেন। বেথুন কলেজের সঙ্গে সরলা দেবীর সামাজিক মেলামেশার কথা পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে।

লজ্জাবতী বসু (? ১৮৭০—১৯৪২) **:** রাজনারায়ণ বসুর কনিষ্ঠা কন্যা। আজীবন কুমারী ছিলেন। সাহিত্য-সেবা করিয়া তিনি সুনাম অর্জন করেন। তাঁহার কবিতা বিভিন্ন মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি ১৯৪২, ২১শে আগস্ট বাহাত্তর বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন।

দুর্গামোহন দাস : কনিষ্ঠা কন্যা **শৈল** বা **খুসী**। দুর্গামোহন দাস (১৮৪০ ?—১৮৯৭) সেযুগের অন্যতম প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মনেতা। তিনি প্রথমে বরিশালে এবং পরে হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন। উপার্জ্জিত অর্থের একটি প্রধান অংশ তিনি জনহিতে ব্যয় করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে তিনি ছিলেন বিশেষ উৎসাহী। ব্রাহ্মবিবাহ আইন বিধিবদ্ধ করার প্রয়াসে তিনি কেশবচন্দ্র সেনের প্রধান সহযোগী ছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার মূলে যাঁহারা অগ্রণী ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে দুর্গামোহন অন্যতম। স্ত্রীজাতির উন্নতি ও শিক্ষা বিষয়ে তাঁহার সহায়তা ও কৃতিত্ব অসাধারণ। কলিকাতার হিন্দু-মহিলা বিদ্যালয় এবং পরে বঙ্গ-মহিলা বিদ্যালয় স্থাপনে তিনি সবিশেষ উদ্যোগী হন। প্রধানতঃ তাঁহারই অর্থসাহায্যে

পর পর প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয় দুইটি পরিচালিত হইত। পরে বেথুন স্কুল ও কলেজ পরিচালনায়ও তিনি সহযোগিতা করেন।

দুর্গামোহনের তিন কন্যা—সরলা, অবলা এবং শৈলবালা। শৈলবালা হিরণ্ময়ী দেবীর সঙ্গে একই বৎসরে—১৮৮২ সনে বেথুন স্কুল হইতে মাইনর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কলিকাতার বিখ্যাত হোমিওপ্যাথ ডাঃ ডি. এন. রায়ের সঙ্গে শৈলবালার বিবাহ হয়।

শিবনাথ শাস্ত্রী : কন্যা হেমলতা। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীও (১৮৪৭—১৯১৮) অন্যতম ব্রাহ্ম নেতা। তিনি কবি, সাহিত্যিক, সংবাদপত্রসেবী এবং বিবিধ জনহিত-মূলক প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগী সদস্য।

তাঁহার জ্যেষ্ঠ কন্যা হেমলতা দেবী (১৮৬৮—১৯৪৩)। হেমলতা বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়ে এবং বেথুন স্কুলে শিক্ষালাভ করেন। বেথুন কলেজ হইতে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ডাঃ বিপিনবিহারী সরকারের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয় (১৮৯৩)। হেমলতা আজীবন শিক্ষাব্রতী ছিলেন। প্রধানতঃ তাঁহারই উদ্যোগে স্থাপিত দার্জিলিং মহারাণী বালিকা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা ছিলেন ত্রিশ বৎসর যাবৎ। তিনি কয়েকখানি স্কুলপাঠ্য ও শিশুপাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করেন। তাঁহার 'মিবার গৌরব কথা', 'নেপালে বঙ্গনারী', 'পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবনচরিত' উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। 'তিব্বতে তিন বৎসর' ধারাবাহিকভাবে 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়।

॥ পাঁচ ॥

কাশিয়াবাগান : সরলা দেবী এই পুস্তকে 'কাশিয়াবাগানে'র কথা বহু বার উল্লেখ করিয়াছেন। পিতামাতার সঙ্গে তিনি এখানকার বাগানবাড়ীতে কয়েক বৎসর বাস করেন। এখানকার কথা তাঁহার জীবনে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। 'কাশিয়াবাগান' অঞ্চল কলিকাতাস্থ বর্তমান রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট এবং উল্টাডিঙ্গি মেন রোডের মোড় বরাবর অনেকটা জায়গা জুড়িয়া ছিল। এই নামটির উৎপত্তি সম্বন্ধে এ অঞ্চলের প্রাচীন ব্যক্তিদের নিকট হইতে এইরূপ শুনিয়াছি :

'কাশিয়াবাগান' উল্টাডিঙ্গি খালের সন্নিকট। এই স্থানটি পূর্বে একটি ব্যবসায়-কেন্দ্র ছিল। পূর্ববঙ্গ হইতে বড় বড় নৌকাবোঝাই হইয়া 'বালাম' চাউল ও অন্যান্য কাঁচা মাল এখানে আমদানী হইত। আবার এখান হইতে ঐসব নৌকায় মালপত্র পূর্ববঙ্গে চালান যাইত। এসকল নৌকা নঙ্গর করিবার জন্য লম্বা মোটা দড়ি দরকার হইত। ইহাকে 'কাছি' বলে। উল্টাডিঙ্গির এই অঞ্চলে 'কাছি' তৈরী হইত প্রচুর। আর এ সমুদয় নানা দিকে চালান করা হইত। বিস্তর কাছি তৈরী হইত বলিয়া 'কাছিব বাগান' বলা হইত। এই 'কাছির বাগান' হইতেই 'কাশিয়াবাগান' নামটির উৎপত্তি।

মেজমামা : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪২—১৯২৩) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যম পুত্র। ভারতবর্ষের প্রথম আই-সি-এস্ বলিয়া তিনি পরবর্তী কালে প্রসিদ্ধি-লাভ করিয়াছেন। কিন্তু অন্য নানা গুণেও তিনি ভূষিত ছিলেন। মহর্ষির শিক্ষায় ও তত্ত্বাবধানে জোড়াসাঁকো ঠাকুর-পরিবারের ধর্মপ্রবণতা এবং সাজাত্যবোধ তাঁহার মধ্যেও বিশেষভাবে অনুপ্রবিষ্ট হয়। হিন্দু মেলার দ্বিতীয় অধিবেশনে (১৮৬৮) গীত "মিলে সবে ভারত সন্তান, এক মন এক প্রাণ, গাও ভারতের যশোগান" তাঁহারই রচনা। অন্যতম জাতীয় সঙ্গীত-রূপে ইহার খুবই প্রসিদ্ধি। সত্যেন্দ্রনাথ বোম্বাই প্রদেশে সিবিলিয়ানী কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। একারণ বোম্বাই ও গুজরাট অঞ্চলে ঠাকুর-পরিবার এবং ঠাকুর-পরিবারের নিকট আত্মীয়দের বারবার যাতায়াত ও ঐ অঞ্চলবাসীদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ ঘটে। রবীন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী দেবী, সরলা

দেবী—ইঁহারাও বহু বার ঐ প্রদেশে গিয়া সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে বসবাস করেন। সরলা দেবীর আত্মকথা এবং অন্যান্য রচনা হইতে ঐ অঞ্চল ও অঞ্চলবাসীদের সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়।

সত্যেন্দ্রনাথ স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতা এবং স্ত্রীজাতির সর্বপ্রকার উন্নতির পক্ষপাতী ছিলেন। পত্নী জ্ঞানদানন্দিনীকে যুগোপযোগী পূর্ব-সংস্কার বর্জিত উন্নতিমূলক কার্য সম্পাদনে এবং নূতন আচার-অনুষ্ঠান প্রবর্তনে বিশেষ উৎসাহ দান করিতেন। তিনি পুত্র ও কন্যাকে প্রচলিত রীতি না মানিয়া মেম ও পাদ্রীদের স্কুলে পড়িতে দেন। সত্যেন্দ্রনাথ ১৮৯৬ সনে সরকারী কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৯৭ সনে রাজশাহীর নাটোরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে তিনি সভাপতি হন। সত্যেন্দ্রনাথ সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি বাংলা সাহিত্যেরও সেবা করিয়া গিয়াছেন। সাময়িক পত্রাদিতেও তাঁহার বহু রচনা প্রকাশিত হয়। সত্যেন্দ্রনাথ লিখিত 'আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস' পুস্তকখানি বাংলা সাহিত্যের একটি উৎকৃষ্ট অবদান।

সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭২—১৯৪০): সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একমাত্র পুত্র। প্রথম দিক্‌কার বিপ্লব আন্দোলনের সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের নানাভাবে যোগসাধন হয়। তিনি কলিকাতার সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ হইতে ১৮৯৩ সনে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বঙ্গদেশে সমবায় জীবনবীমা ও ব্যাঙ্কিং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠরূপে যুক্ত ছিলেন। হিন্দুস্থান লাইফ এস্যুরেন্স কোম্পানীর তিনি ছিলেন অন্যতম কর্ণধার। রবীন্দ্র-সাহিত্যের সহিত তাঁহার পরিচয় অত্যন্ত নিবিড়।

বিবি: ইন্দিরা দেবী (১৮৭৩) সত্যেন্দ্রনাথের একমাত্র কন্যা। তিনিও উচ্চ-শিক্ষিত। 'লরেটো হাউস' হইতে তিনি এণ্ট্রান্স পরীক্ষা পাস করেন। পরে গৃহে বসিয়া শিক্ষালাভ করেন এবং বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রমথ চৌধুরীর ('বীরবল') সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয়। ইন্দিরা দেবী রবীন্দ্রসঙ্গীতে পারদর্শিনী। বাংলা সাহিত্যের সেবায়ও তিনি তৎপর। 'ভারতী' ও অন্যান্য পত্রপত্রিকায় তাঁহার বহু রচনা প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি সাময়িকভাবে বিশ্বভারতী ইউনিভার্সিটির 'উপাচার্য' পদে বৃত হইয়াছিলেন।

ইলবার্ট বিল: বড়লাট লর্ড রিপনের সময়ে তাঁহার পরিষদের আইন-সদস্য সর্ কোর্টনে. ইলবার্ট এই বিলটি ১৮৮৩ সনে ব্যবস্থা পরিষদের বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত করেন বলিয়া 'ইলবার্ট বিল' নামকরণ হইয়াছে। এই বিলটির মর্ম ছিল এই যে, ইউরোপীয় ও দেশীয় সিবিলিয়ান কর্মচারী ইউরোপীয় অপরাধীদের বিচারে সম-অধিকারসম্পন্ন হইবেন। বড়লাট লর্ড রিপন বিলটির সপক্ষে ছিলেন। এই বিলের ঘোর বিরোধিতা করেন ভারতবর্ষস্থিত ইউরোপীয় সম্প্রদায়। বলা বাহুল্য, ভারতবাসীরা সর্বান্তঃকরণে বিলটি সমর্থন করেন। এই সময় হইতে ভারতবাসীদের মধ্যে যে আন্দোলন উপস্থিত হয় তাহা ন্যাশনাল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার মূলে কম রসদ জোগায় নাই।

কামিনী দিদি: কবি কামিনী রায় (১৮৬৪—১৯৩৩) সে যুগের বিখ্যাত সাহিত্যিক চণ্ডীচরণ সেনের কন্যা এবং স্ট্যাটুটারি সিবিলিয়ান কেদারনাথ রায়ের পত্নী। সরলা দেবী ১৮৮০, জানুয়ারী মাসে বেথুন কলেজে ভর্তি হন। এই সনে কামিনী সেন এণ্ট্রান্স পরীক্ষা প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। সংস্কৃতে দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্সসহ এই স্কুলের কলেজ-বিভাগ হইতে বি-এ ডিগ্রী লাভ করেন। ইলবার্ট বিল আন্দোলন তথা সুরেন্দ্রনাথের কারাবরণের সময় কামিনী সেন স্বতঃই বেথুন

বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের নেতৃস্থানীয় হইয়াছিলেন। কলেজী শিক্ষা সমাপন করিয়া তিনি প্রথমে বেথুন স্কুল এবং পরে কলেজ-বিভাগে শিক্ষয়িত্রীর কর্মে বিবাহের (১৮৯৪) পূর্ব পর্যন্ত লিপ্ত ছিলেন। তিনি বহু কবিতা-পুস্তক রচনা করিয়াছেন। তাঁহার 'আলো ও ছায়া' একখানি প্রথম শ্রেণীর কাব্যগ্রন্থ।

অবলা দিদি : লেডী অবলা বসু (? ১৮৬৬—১৯৯৯) প্রথিতযশা আইন-ব্যবসায়ী ও ব্রাহ্মসমাজকর্মী দুর্গামোহন দাসের মধ্যমা কন্যা এবং আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর সহধর্মিণী। তিনি পূর্বে বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিলেন। বেথুন স্কুল হইতে ১৮৮২ সনে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তখন কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে ছাত্রী গ্রহণের রেওয়াজ না থাকায় তিনি মাদ্রাজে গিয়া তথাকার মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। বাংলা সরকার মাসিক কুড়ি টাকার একটি বিশেষ বৃত্তি তাঁহাকে দিয়াছিলেন। ১৮৮৫ সনে তিনি প্রথম এল-এম-এফ পরীক্ষা পাস করেন। কিন্তু অসুস্থ হইয়া পড়ায় তাঁহাকে মাদ্রাজ ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিতে হয়। ইহার পর আচার্য জগদীশচন্দ্রর বসুর সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হইল।

জগদীশচন্দ্রের জীবনসঙ্গিনীরূপে তাঁহার বিজ্ঞান-সাধনায় তিনি সর্বপ্রকারে সহায় হইয়াছিলেন। তিনি ভগিনী নিবেদিতার ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-সহধর্মিণী সারদামণি দেবীর নিকট হইতেও তিনি বিশেষ অনুপ্রেরণা লাভ করেন। লেডী বসু নারীজাতির উন্নতিমূলক কর্মে উদ্বুদ্ধ হইয়া ১৯১৯ সনে নারীশিক্ষা সমিতি স্থাপন করেন। শিল্পভবন ও বাণীভবন দুইটি বিভাগের মাধ্যমে তিনি বালবিধবা ও দুর্গতা নারীদের সাধারণ বিদ্যা ও শিল্পবিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আমৃত্যু তিনি ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ের সম্পাদিকার পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ইহাকে ক্রমোন্নতির পথে লইয়া যান। তিনি স্বামীর সঙ্গে বহুবার পাশ্চাত্য দেশসমূহ পরিভ্রমণ করেন। বেথুন স্কুলে ছাত্রী থাকাকালীন অবলা নিম্নশ্রেণীর ছাত্রীদের অন্যতম নেতারূপে গণ্য হইয়াছিলেন এবং তখনই জাতীয়তামূলক কার্যে তৎপর হইয়া অল্পবয়স্কদের আদর্শস্থল হইয়াছিলেন। লেডী বসু সুলেখিকা। তাঁহার কয়েকটি রচনা 'মুকুলে' দেখিয়াছি।

মোহিনী দেবী (?—১৯০৫) **:** গত শতাব্দীর অন্যতম বিখ্যাত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রামশংকর সেনের কন্যা। রামশংকর স্বদেশের বিবিধ জনহিতকর কার্যে, বিশেষতঃ স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে, অতিশয় তৎপর ছিলেন। মোহিনী দেবী স্বদেশসেবার প্রেরণা বাল্যে পিতার নিকট হইতেই প্রাপ্ত হন। তাঁহার স্বামী ছিলেন রায় বাহাদুর অরকচন্দ্র দাস। বৈধব্য-দশায়, প্রায় ষাট বৎসর বয়সে, মোহিনী দেবী অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯৩০ সনে সত্যাগ্রহ আন্দোলনেও তিনি যোগ দিয়াছিলেন। এই সময় তিনি নারী সত্যাগ্রহ সমিতির সহকারী সভাপতি হন এবং আইন অমান্য করিয়া কারাবরণ করেন। স্বাধীনতা লাভের পরেও তিনি স্বদেশের সর্ববিধ কল্যাণকর্মে উৎসাহ দান করিতেন।

ভারতী : শ্রাবণ ১২৮৪ (ইং ১৮৭৭) হইতে 'ভারতী' জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংকলন অনুযায়ী প্রকাশিত হয়। ইহার উদ্দেশ্য প্রথম সংখ্যায়ই এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে :

"ভারতীর উদ্দেশ্য যে কি তাহা তাঁহার নামেই সপ্রকাশ। ভারতীর এক অর্থ বাণী, আর এক অর্থ বিদ্যা, আর এক অর্থ ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। বাণীস্থলে স্বদেশীয় ভাষার আলোচনাই আমাদের উদ্দেশ্য। বিদ্যাস্থলে বক্তব্য এই যে, বিদ্যার দুই অঙ্গ, জ্ঞানোপার্জ্জন এবং ভাবস্ফূর্ত্তি। উভয়েরই সাধ্যানুসারে সহায়তা করা আমাদের উদ্দেশ্য। স্বদেশের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাস্থলে বক্তব্য এই যে, জ্ঞানালোচনার

সময় আমরা স্বদেশ-বিদেশ নিরপেক্ষ হইয়া যেখান হইতে যে জ্ঞান পাওয়া যায়, তাহাই নত মস্তকে গ্রহণ করিব। কিন্তু ভাবালোচনার সময় আমরা স্বদেশীয় ভাবকেই বিশেষ স্নেহ দৃষ্টিতে দেখিব।"

'ভারতী' দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল। শ্রেষ্ঠ লেখকগণের রচনা দ্বারা ইহা সমৃদ্ধ হয়। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহার প্রথম সম্পাদক। কার্যকালসহ বিভিন্ন সম্পাদকের নাম এখানে দেওয়া হইল :

সম্পাদক	কার্যকাল
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	শ্রাবণ ১২৮৪—১২৯০
স্বর্ণকুমারী দেবী	১২৯১—১৩০১
হিরন্ময়ী দেবী, সরলা দেবী	১৩০২—১৩০৪
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৩০৫
সরলা দেবী	১৩০৬—১৩১৪
স্বর্ণকুমারী দেবী	১৩১৫—১৩২১
মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	১৩২২—১৩৩০
সরলা দেবী	১৩৩১—আশ্বিন ১৩৩৩

॥ ছয় ॥

সুধীদাদা : সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬৯—১৯২৯) দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্থ পুত্র। তিনি সুশিক্ষিত ও সুসাহিত্যিক। অগ্রহায়ণ ১২৯৮ হইতে 'সাধনা' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সুধীন্দ্রনাথ প্রথম তিন বৎসর ইহা সম্পাদনা করেন। চতুর্থ বৎসরে রবীন্দ্রনাথ ইহার সম্পূর্ণ ভার লন। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন :

"সাধনা পত্রিকার অধিকাংশ লেখা আমাকে লিখিতে হইত এবং অন্য লেখকগণের রচনাতেও আমার হাত ভূরি পরিমাণ ছিল।"

সুধীন্দ্রনাথ আজীবন সাহিত্য-সাধনা করিয়া গিয়াছেন। অমায়িক ব্যবহারের জন্য তিনি সকলের প্রিয় হইয়াছিলেন।

বলু : বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭০—১৮৯৯) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের চতুর্থ পুত্র বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৪৫—১৯১৫) একমাত্র সন্তান। তিনি বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত। রবীন্দ্রনাথ বলেন্দ্রনাথকে লইয়া ১৮৯৯ সনে একটি স্বদেশী ভাণ্ডার খুলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ সম্প্রতি বলেন্দ্র-রচনাবলী প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার রচনার সাহিত্যিক মূল্য সর্বজনস্বীকৃত।

॥ আট ॥

মেজমামী : জ্ঞানদানন্দিনী দেবী (১৮৫২—১৯৪১)। মহর্ষির মধ্যম পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহধর্মিণী। যশোহর জেলার নরেন্দ্রপুর গ্রামে জ্ঞানদানন্দিনীর জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম অভয়াচরণ মুখোপাধ্যায়। ১৮৫৯ সনে সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয়। সত্যেন্দ্রনাথের শিক্ষা ও সহযোগিতায় জ্ঞানদানন্দিনী ক্রমে স্ত্রী-শিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী হইয়া উঠেন। ঠাকুরবাড়ির অন্তঃপুরে বসিয়া তিনি বাংলা ও ইংরেজী ভাষা আয়ত্ত করেন। তিনি বাংলাদেশে কতকগুলি নূতন প্রথার সূচনা করেন, তন্মধ্যে দুইটি প্রধান : ১। জন্মদিন পালন এবং ২। নূতন ধরনে শাড়ি পরা। শাড়ি পরার নূতন রীতি প্রবর্তন সম্পর্কে তিনি স্বামীর কর্মস্থল

আমেদাবাদ হইতে একখানি পত্রে 'বামাবোধিনী পত্রিকা'য় আলোচনা করেন। তিনি বাংলাসাহিত্যের সেবায়ও তৎপর ছিলেন। 'ভারতী'তে বিভিন্ন সময়ে তাঁহার কয়েকটি রচনা প্রকাশিত হয়। বৈশাখ ১২৯২ হইতে এক বৎসর কাল তিনি 'বালক' সম্পাদনা করেন। এখানি কিশোরপাঠ্য সচিত্র মাসিক পত্রিকা। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির ছেলে-মেয়েদের বাংলা রচনায় উৎসাহ দানের নিমিত্তই ইহা মুখ্যতঃ প্রকাশিত হয়। সুরেন্দ্র-নাথ, বলেন্দ্রনাথ, হিরণ্ময়ী দেবী, সরলা দেবী প্রমুখ বাড়ির বালক-বালিকাদের রচনা ইহাতে বিশেষভাবে স্থান পাইত। এক বৎসর চলিবার পর 'বালক' 'ভারতীর' সঙ্গে মিলিত হয়। জ্ঞানদানন্দিনীর শিশুপাঠ্য দুইখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল— ১। টাক ডুমা ডুম্ ডুম্ (নাটিকা)—১৯১০ এবং ২। সাত-ভাই চম্পা (নাটিকা)— ১৯১১।

হেমপ্রভা বসু : ভগবানচন্দ্র বসুর কনিষ্ঠা কন্যা এবং আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর কনিষ্ঠা ভগিনী। তিনি বেথুন হোস্টেলে থাকিতেন, এবং সরলা দেবীর বন্ধুরূপে ছুটির দিনে তাঁহাদের বাড়িতে আসিতেন। হেমপ্রভা সরলা দেবীর দুই শ্রেণী নিম্নে পড়িতেন। তিনি ১৮৮৮ সনে এণ্ট্রান্স, ১৮৯০ সনে এফ-এ, ১৮৯৪ সনে বি-এ এবং ১৮৯৮ সনে এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি প্রথমে বেথুন স্কুলের শিক্ষয়িত্রী এবং পরে বেথুন কলেজের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। তিনি আজীবন কৌমার্যব্রত অবলম্বন করেন।

ভগবানচন্দ্র বসু (? ১৮২৯—৯২) : ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে রাড়িখাল গ্রামে ভগবানচন্দ্রের জন্ম হয়। তিনি ছিলেন রামশংকর সেনের সতীর্থ এবং ঢাকা কলেজের উত্তীর্ণ ছাত্র। তিনি বেথুন সাহেবের দ্বারা স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ে বিশেষরূপে অনুপ্রাণিত হন। প্রথমে জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং পরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রূপে তিনি সরকারী কার্যে লিপ্ত ছিলেন। তিনি মানব-দরদী ছিলেন, এবং এক প্রসিদ্ধ ডাকাতকে কারাবাস-অন্তে নিজ গৃহে স্থান দিয়া এই মানবিকতার চরম দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন। ইহার মুখে অসম-সাহসিকতার নানা গল্প শুনিয়া জগদীশচন্দ্র শৈশবে মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। পরবর্তী কালের তাঁহার বেপরোয়া নির্ভীক মনোবৃত্তি কতকটা এই ডাকাত-ভৃত্যের সঙ্গলাভের ফল একথা তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। ভগবানচন্দ্র সরকারী কর্ম ব্যতিরেকে স্বদেশের শিল্পোন্নতিকল্পে প্রচুর অর্থ ঢালিয়াছিলেন, কিন্তু ইহা লাভজনক না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে প্রায় সর্বস্বান্ত হইতে হয়।

ভগবানচন্দ্রের পাঁচ কন্যা। জ্যেষ্ঠা কন্যা স্বর্ণপ্রভা বসু। তিনি গৃহে প্রথমে বাংলা ও পরে ইংরেজী ভাষা শিখিয়া উভয় সাহিত্যেই ব্যুৎপন্ন হন। ১৮৬৮ সনে আনন্দমোহন বসুর সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয়। ১৮৬৯ সনে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা দিবসে যে দুইজন নারী কেশবচন্দ্রের নিকট ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে স্বর্ণপ্রভা একজন। তিনি স্ত্রী-বিদ্যালয় পরিচালনা এবং অন্যান্য জনহিতকর কার্যে স্বামীর একান্ত সহায় ছিলেন। স্বর্ণপ্রভা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্গত বঙ্গ-মহিলাসমাজেরও প্রতিষ্ঠাতা।

ভগবানচন্দ্রের অপর চারি কন্যা—সুবর্ণপ্রভা বসু, লাবণ্যপ্রভা বসু, হেমপ্রভা বসু, চারুপ্রভা বসু। সুবর্ণপ্রভা ১৮৮০ সনে বেথুন স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করেন। তাঁহার বিবাহ হয় আনন্দমোহন বসুর অনুজ বিখ্যাত হোমিওপ্যাথ মোহিনী-মোহন বসুর সহিত। লাবণ্যপ্রভা দীর্ঘকাল সাহিত্যসেবা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পুস্তকগুলি সুপাঠ্য, এবং সাহিত্যপদবাচ্য। ১৯০৭ সনে ডাক্তার হেমচন্দ্র সরকারের সঙ্গে তিনি পরিণীতা হন। হেমপ্রভা চতুর্থ এবং চারুপ্রভা পঞ্চম কন্যা। উভয়েই উচ্চশিক্ষিতা, সেবাপরায়ণা এবং বিভিন্ন কর্মে রত ছিলেন।

কুমুদিনী খাস্তগির (১৮৬৫—?)ঃ ডাঃ অন্নদাচরণ খাস্তগিরির কন্যা। বেথুন কলেজের কৃতী ছাত্রী, বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণা। ১৮৯১—৯৩ সনে বেথুন স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষয়িত্রী, ১৮৯৪ সনে প্রথমা শিক্ষয়িত্রী এবং ১৮৯৫—৯৭ সনে বেথুন কলেজে তৃতীয় অধ্যাপকের কার্য করেন। ১৮৯৪ সনে কিছুকাল মহীশূরে মহারাণী গার্লস স্কুলে কর্মে লিপ্ত ছিলেন বলিয়া সরলা দেবী উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার স্থলে তিনি সেখানে নিযুক্ত হইয়া যান। ১৮৯৭ সনে বিবাহের পর তিনি কুমুদিনী দাস নামে পরিচিত হন। ক্রমে পদোন্নতি হইয়া ১৯০২ সনে তিনি কলেজের অধ্যক্ষ হন। এই পদে তিনি ১৯১২ সনের মার্চ পর্যন্ত অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইহার পর তিনি ঢাকা বিভাগের সহকারী ইন্সপেকট্রেস্ অব্ স্কুল্স হইয়া যান। এখান হইতে ১৯১৮ সনের এপ্রিল মাসে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

নতুন মামা ঃ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৯—১৯২৫) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পঞ্চম পুত্র। দেবেন্দ্রনাথ-কেশবচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা কলেজ হইতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ১৮৬৪ সনে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। সুবিখ্যাত রমেশচন্দ্র দত্ত এই বৎসর প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ খুল্লতাত পুত্র গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে কিছুকাল কলিকাতা গবর্নমেণ্ট আর্ট স্কুলে শিল্পবিদ্যা শিক্ষা করেন। ১৮৬৮ সনে কাদম্বরী দেবীর সঙ্গে তিনি পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হন। কাদম্বিনী দেবী এই পুস্তকে 'নূতন মামী' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভা বিভিন্ন কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক রূপে (১৮৬৯—১৮৮৪) তিনি ইহার পরিচালন ও প্রচারে মন দেন। তিনি সঙ্গীতবিদ্যা-চর্চার বিশেষ আয়োজন করেন। প্রথমে কেশবচন্দ্রের স্ত্রী-স্বাধীনতার বিপক্ষ হইলেও তিনি পরে ইহার একান্ত সমর্থক হইয়া উঠেন, এবং নিজের পত্নীকে লইয়া প্রকাশ্য রাজবর্ত্মে স্বামী-স্ত্রী পাশাপাশি দুইটি ঘোড়ায় বসিয়া ছুটাইয়া চলিতেও দ্বিধা বোধ করেন নাই। এই স্বাধীনতার মনোবৃত্তি তিনি রাজনীতি ও শিল্পোন্নতির মধ্যেও অনুপ্রবিষ্ট করান। তৎপ্রতিষ্ঠিত সঞ্জীবনী-সভা বাঙ্গালী যুবকদের মধ্যে বৈপ্লবিক মনোভাবের একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন। শিল্পোন্নয়ন প্রয়াসে তিনি নিজে বিস্তর ক্ষতি স্বীকার করিয়াও শিল্প-বাণিজ্য পরিচালনে অগ্রসর হইয়াছিলেন। 'বরিশাল স্টীমার কোম্পানী' জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এক অপূর্ব কীর্তি।

বাংলা সাহিত্যের অনলস সাধনা, নাটক-অভিনয়ে উদ্যোগ-আয়োজন, 'ভারতী' পরিচালনে ঐকান্তিকতা, মারাঠী ও ফরাসী গ্রন্থসমূহ অনুবাদ দ্বারা বাংলা-সাহিত্যের পুষ্টিসাধন, ভারত-সঙ্গীত-সমাজ প্রতিষ্ঠা (১৮৯৭) এবং সঙ্গীত-বিষয়ক 'বীণাবাদিনী' ও 'সঙ্গীত-প্রকাশিকা' সম্পাদন প্রভৃতি তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে।

॥ নয় ॥

মাদাম ব্লাভাট্স্কি (১৮৩১—৯১)। বিখ্যাত থিয়সফিস্ট্ এবং থিয়সফিক্যাল সোসাইটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ব্লাভাট্স্কির পুরা নাম—হেলেনা পেট্রোভ্না ব্লাভাট্স্কি। ব্লাভাট্স্কি জাতিতে জার্মান; কিন্তু তাঁহার পূর্বপুরুষেরা রাশিয়ায় বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। ষাট বৎসরের এক বৃদ্ধের সঙ্গে সতর বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়। অল্পদিন পরে উভয়ের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে। ব্লাভাট্স্কি সাহসী ও তেজস্বিনী মহিলা। ইউরোপ, আমেরিকা এবং এসিয়ার বিভিন্ন দেশে বহু বৎসর পরিভ্রমণ করেন এবং নানা বিপদ-আপদের সম্মুখীন হন। তিনি বহু কষ্টে কাশ্মীরের পথে তিব্বত যান। কথিত আছে, তিনি এক তিব্বতী সাধুর নিকট দীক্ষা

গ্রহণ করেন। সমগ্র ভারতবর্ষ পরিক্রমার পর ব্লাভাট্‌স্কি ১৮৭৩ সনে আমেরিকা গমন করেন। সেখানে অধ্যাত্মতত্ত্ববিদ্‌ কর্নেল অলকটের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয়। মার্কিন জাতিভুক্ত হইয়া ব্লাভাট্‌স্কি একক্রমে ছয় বৎসর নিউ ইয়র্কে অবস্থান করেন। ব্লাভাট্‌স্কি ও অলকট উভয়ে মিলিয়া ১৮৭৫ সনে থিয়সফিক্যাল সোসাইটি স্থাপন করেন। এই সোসাইটি কোন বিশেষ ধর্ম প্রচার না করিয়া সদস্যগণকে নিজ নিজ ধর্মে আস্থাবান্‌ হইবার জন্য উপদেশ দিতেন। সোসাইটি বিশ্বের বিভিন্ন জাতির মধ্যে ভ্রাতৃভাবের উদ্রেকের নিমিত্ত যত্নপর হইলেন। এতাদৃশ আদর্শের প্রতি বিভিন্ন দেশের সুধীগণ স্বতঃই আকৃষ্ট হন। মাদাম ব্লাভাট্‌স্কির অলৌকিক শক্তি ও অবিশ্বাস্য কার্যকলাপের প্রচারে এদেশবাসীরাও তাঁহার প্রতি সবিশেষ আকৃষ্ট হন। তিনি কর্নেল অলকটসহ ভারতবর্ষে আসিবার পর শিক্ষিত সাধারণ কর্তৃক সম্বর্ধিত হন। শুনা যায়, তিব্বতী গুরু সূক্ষ্মদেহে আসিয়া ব্লাভাট্‌স্কির সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করিতেন। ভারতবর্ষে সোসাইটির কেন্দ্রস্থল প্রতিষ্ঠার জন্যও তিনি গুরু-কর্তৃক আদিষ্ট হইয়াছিলেন। মাদ্রাজের আডিয়ারে তখন থিয়সফিক্যাল সোসাইটির কেন্দ্র স্থাপিত হয়। সমগ্র জগতে সোসাইটির কেন্দ্রস্থল এই আডিয়ার। ব্লাভাট্‌স্কির অলৌকিক ক্রিয়াকলাপে অনেকেই ক্রমে সন্দিহান হইয়া উঠেন। সংবাদপত্রেও তখন ইহার সমালোচনা হয়। এই পুস্তকে থিয়সফিক্যাল সোসাইটি ভাঙনের কথা যে বলা হইয়াছে তাহা এই সময়কারই ঘটনা। স্বর্ণকুমারী দেবী প্রমুখ সম্ভ্রান্ত মহিলারা থিয়সফিক্যাল সোসাইটির সংস্রব ত্যাগ করেন। তিনি সোসাইটির সদস্যা মহিলাদের লইয়া সখি-সমিতি স্থাপন করেন (১৮৮৬)। মাদাম ব্লাভাট্‌স্কি ১৮৮৭ সনে ইংলণ্ড গমন করেন। সেখান হইতে তিনি অধ্যাত্মবিদ্যা সম্পর্কীয় একখানি পত্রিকা সম্পাদনা করিতে থাকেন। অধ্যাত্মবিদ্যা সম্বন্ধে তাঁহার কয়েকখানি পুস্তকও রহিয়াছে। বিলাতে অবস্থানকালে তাঁহার নিকট এনি বেসান্ট থিয়সফি-মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ভারতবর্ষের ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি, ঐতিহ্যের প্রতি বিশ্ববাসীর আগ্রহের মূলে থিয়সফিক্যাল সোসাইটির কৃতিত্ব অসামান্য।

কর্নেল অলকট ঃ পুরা নাম কর্নেল এইচ. এস. অলকট। অলকট ছিলেন আমেরিকার অধিবাসী। তিনি মাদাম ব্লাভাট্‌স্কির সঙ্গে ভারতবর্ষে আগমনান্তর বরাবর এদেশেই বাস করেন। তিনি থিয়সফিস্ট সোসাইটি দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপনমানসে সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন। অলকট সোসাইটি-কর্তৃক প্রকাশিত 'থিয়সফিস্ট' পত্রিকা যোগ্যতার সহিত সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। তিনি নিজে ছিলেন বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী, তথাপি হিন্দুধর্মের মূল তত্ত্ব যাহাতে সর্বসাধারণের হৃদয়ঙ্গম হয় সেজন্য নানাভাবে যত্ন লইয়াছিলেন। থিয়সফিক্যাল সোসাইটির গ্রন্থন-বিভাগ ভারতীয় ধর্ম, সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রচারে সবিশেষ তৎপর হয়। কর্নেল অলকটও অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ দেখাইতে পারিতেন। অলকট কিছুকাল পর্যন্ত থিয়সফিক্যাল সোসাইটির সভাপতি ছিলেন। ১৯০৭ সনে তাঁহার মৃত্যু হয়।

সখিসমিতি ঃ মহিলা থিয়সফিস্ট সভা ভাঙিয়া গেলে সভানেত্রী স্বর্ণকুমারী দেবী ইহার সম্ভ্রান্ত মহিলা সদস্যদের লইয়া ১৮৮৬ সনে 'সখিসমিতি' স্থাপন করেন। এই নামটি রবীন্দ্রনাথের দেওয়া। প্রতিষ্ঠার দুই বৎসর পরে প্রকাশিত সখিসমিতির একটি বিবরণীতে ইহার উদ্দেশ্য এইরূপ বিবৃত হইয়াছে ঃ

"অসহায় বঙ্গবিধবা ও অনাথা বঙ্গকন্যাগণকে সাহায্য করা এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য।

"আবশ্যক অনুসারে দুই উপায়ে এই সাহায্য দান হইবে। বিধবাই হউন আর কুমারীই হউন যিনি নিরাশ্রিত, যাহার কেহ নাই, বা যাহার অভিভাবকেরা নিতান্ত সঙ্গতিহীন, তাহাদের অভিভাবকদের সম্মতিক্রমে সখিসমিতি কোন কোন স্থলে

তাহাদের ভার লইতে প্রস্তুত, কোন কোন স্থলে সাধ্যানুসারে অর্থ সাহায্য করিতে প্রস্তুত।

"যে সকল অল্পবয়স্ক অনাথা বিধবা বা কুমারীগণের ভার সখিসমিতি গ্রহণ করিবে, তাঁহাদিগকে সুশিক্ষিত করিয়া তাঁহাদের দ্বারা স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার করা সখি-সমিতির দ্বিতীয় উদ্দেশ্য। শিক্ষিত হইয়া যখন এই বালিকাগণ অন্তঃপুরের শিক্ষা-দান কার্যে নিযুক্ত হইবেন, তখন সমিতি ইঁহাদিগকে বেতন দান করিবে। ইহা দ্বারা দুইটি কাজ একসঙ্গে সাধিত হইবে। অনাথা ও বিধবা বঙ্গকন্যাগণ হিন্দু ধর্মানু-মোদিত পরোপকার কার্যে জীবন দিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন, আর দেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের একটি প্রকৃত পথ মুক্ত হইবে।"

('ভারতী ও বালক',—পৌষ, ১২৯৫)।

সখিসমিতির উদ্যোগে একাধিকবার মহিলা শিল্পমেলা অনুষ্ঠিত হয়। সখি-সমিতি বহু বৎসর জীবিত থাকিয়া সমাজ-সেবায়, বিশেষতঃ নারীজাতির হিতকর্মে রত থাকে।

মহিলা শিল্পমেলা : সরলা দেবী যে শিল্প সংগ্রহপূর্বক মেলানুষ্ঠানের কথা বলিয়াছেন তাহাই এই 'মহিলা শিল্পমেলা'। এই ধরনের মেলার একটির কথা উক্ত বিবরণীতে আছে। ইহার কিয়দংশ এই :

"গত ১৫ই পৌষ, কলিকাতার বেথুন স্কুল বাটীতে লেডী বেলী কর্তৃক বেলা দ্বিপ্রহরের সময় হইতে এই মেলা খোলা হয়, মেলা খুলিবার পরই লেডী ল্যান্সডাউন আগমন করেন।...কলিকাতার অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত বংশীয় মহিলাগণ এই মেলায় আগমন করিয়াছিলেন। মেলা তিন দিন খোলা ছিল এবং ১২টা হইতে ৩টা অবধি মেলার দোকান খোলা থাকিত। বিক্রেতা, ক্রেতা ও দর্শক সকলেই এই মেলায় মহিলা। মেলা উপলক্ষ্যে বেথুন স্কুলের বাড়ীটি লতাপাতাফুল প্রভৃতি দ্বারা সুন্দর করিয়া সাজান হইয়াছিল। বাটীর মধ্যস্থলের খোলা উঠান চাঁদোয়ার দ্বারা ঢাকিয়া উঠানের মধ্যভাগে লতাপাতা রচিত কুটীর নির্ম্মিত হইয়াছিল। কুটীরের মধ্যে ফুলের দোকান। উঠানের চারিপার্শ্বে বারান্দায় ও ঘরে মহিলাদের ক্রয়োপযোগী নানারূপ দ্রব্যাদি সজ্জিত হইয়াছিল এবং এক এক জন মহিলার উপর বা দুই তিন জনের উপর দ্রব্যবিশেষ বিক্রয়ের ভার ছিল।...এখানে অনেক প্রকার মহিলাশিল্প সংগ্রহ করা হইয়াছিল।..."

সরলা দেবী 'মায়ার খেলা'র অভিনয়ের কথা বলিয়াছেন। উক্ত বিবরণীতে আছে :

"মেলার পর বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত মায়ার খেলা নামে একখানি গীতি-নাটক বালিকাগণকর্তৃক অভিনীত হইয়াছিল, দর্শক মহিলাগণ অনেকেই অভিনয় দর্শনে বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন।" ('ভারতী ও বালক', পৌষ ১২৯৫)।

শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪০—১৯২৪?) : অপূর্ব ও অনন্যতুল্য সেবা-পরায়ণতার নিমিত্ত তিনি 'সেবাব্রত' শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে অভিহিত হন। শশিপদ ব্রাহ্মধর্মে একান্ত নিষ্ঠাবান্ ছিলেন। সর্বজনীন ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তক রামমোহন রায়ের আদর্শে তিনি 'সাধারণ ধর্মসভা' স্থাপন করেন। ইহারই পরিণতি হয় 'দেবালয়ে'। ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন, হিন্দু বালবিধবার শিক্ষা ও বিবাহ প্রভৃতি কার্যে তিনি আত্মনিয়োগ করেন। শ্রমজীবীদের নিমিত্ত শ্রমজীবী ক্লাস স্থাপন এবং 'ভারত শ্রমজীবী' শীর্ষক মাসিকপত্র (১৮৭৪, বৈশাখ) প্রকাশ দ্বারা তিনি শ্রমজীবীদের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক উন্নতিসাধনে তৎপর হন। স্ত্রীশিক্ষার প্রসার ও উন্নতিকল্পে তাঁহার জীবনব্যাপী প্রযত্ন সর্বজনবিদিত। তাঁহার স্থাপিত বরাহনগর হিন্দু বিধবা আশ্রমে বহুসংখ্যক বিধবা শিক্ষা পাইয়া স্বাধীনভাবে

সদ্‌পায়ে উপার্জনক্ষম হন। সেবাব্রতের এই আশ্রমটি চল্লিশ বৎসর জীবিত ছিল। এই সময়ের মধ্যে তিনি চল্লিশটি বিধবার বিবাহ দিতে সক্ষম হন। তাঁহার যাবতীয় সম্পত্তি তিনি দান করিয়া যান।

বিধবা-শিল্পাশ্রম : সরলা দেবী এই আশ্রমের উদ্ভব সম্বন্ধে গ্রন্থে বলিয়াছেন। আশ্রমটি সখিসমিতির অনুক্রম। সখিসমিতির উদ্দেশ্য সঞ্জীবিত রাখিবার জন্য স্বর্ণকুমারী দেবীর জ্যেষ্ঠা কন্যা হিরণ্ময়ী দেবী ১৯০৬ সনে রূপান্তরিত আকারে বিধবা-শিল্পাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। মৃত্যুকাল (১৯২৫) পর্যন্ত তিনি ইহা পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ইহা 'হিরণ্ময়ী বিধবা-শিল্পাশ্রম' নাম পরিগ্রহ করে। অতঃপর স্বর্ণকুমারী দেবীর অধ্যক্ষতায় ইহা পরিচালিত হয়। আশ্রমের অধ্যক্ষ-সভার নাম সখি-শিল্পসমিতি। স্বর্ণকুমারী দেবী ১৯৩১ সনে তাঁহার রচিত যাবতীয় পুস্তকের স্বত্ব এই সমিতিকে দান করেন।

॥ দশ ॥

বড়মামা : দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯৪০—১৯২৬)। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। শৈশবে কিছুকাল হিন্দু কলেজে ও প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষালাভ করেন। কাব্য, দর্শন, গণিত ও সঙ্গীতে তাঁহার অসামান্য প্রতিভা ছিল। দেবেন্দ্রনাথের ধর্মনিষ্ঠতা ও স্বাদেশিকতা তাঁহার মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত ছিল। তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। বহু স্বাদেশিক প্রতিষ্ঠানেরও তিনি মূলে ছিলেন। নবগোপাল মিত্রের হিন্দু মেলা (১৮৬৭), বেঙ্গল থিয়সফিক্যাল সোসাইটি (১৮৮২), বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্‌ (১৮৯৪) প্রভৃতির সঙ্গে প্রতিষ্ঠাবধি যুক্ত ছিলেন। তিনি বেঙ্গল থিয়সফিক্যাল সোসাইটির সহকারী সভাপতি হইয়াছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সভাপতির পদ অলংকৃত করেন তিন বৎসর যাবৎ (১৮৯৭—১৯০০)। ১৩২০ সনে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের কলিকাতা অধিবেশনে সভাপতি-পদে বৃত হন। তিনি বাংলা শর্টহ্যান্ডেরও উদ্ভাবক। দ্বিজেন্দ্রনাথ 'ভারতী'র প্রথম সম্পাদক (শ্রাবণ ১২৮৪—১২৯০)। ইহার পর দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর যাবৎ (তিনি 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' সম্পাদনায় ব্যাপৃত ছিলেন। 'হিতবাদী' প্রতিষ্ঠায় দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রযত্ন উল্লেখযোগ্য। তিনিই উহার এই নামকরণ করেন। "হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ"—হিতবাদীর মটোটি তাঁহারই প্রদত্ত। বাংলা সাহিত্য সাধনায় দ্বিজেন্দ্রনাথ আজীবন রত ছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথের আট পুত্র এবং দুই কন্যা। চতুর্থ পুত্র সুধীন্দ্রনাথ এবং দুই কন্যা সরোজা দেবী ও উষা দেবীর কথা পুস্তকে উল্লিখিত হইয়াছে। সরোজা দেবীর ও উষা দেবীর বিবাহ হয় যথাক্রমে মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় ও রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে।

মেজ মাসীমা : শরৎকুমারী (১৮৫৫—১৯২০)

ছোট মাসীমা : বর্ণকুমারী (১৮৫৮—?)

॥ এগার ॥

আশু চৌধুরী : সর্‌ আশুতোষ চৌধুরী (১৮৫৯—১৯২৪)। পাবনা জেলার হরিপুরে বিখ্যাত জমিদার বংশে তাঁহার জন্ম। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইংলন্ডে গমন করেন। তিনি ব্যারিস্টার হইয়া কলিকাতায়

ফিরিয়া আসেন এবং হাইকোর্টে আইন-ব্যবসায় শুরু করিয়া দেন। এই ব্যবসায়ে তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। তিনি ইংরেজী সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন। ইংরেজ কবিদের জীবন ও কাব্য সম্বন্ধে তাঁহার কয়েকটি প্রবন্ধ 'ভারতী' মাসিকে প্রকাশিত হয়। আশুতোষ স্বদেশের হিতের জন্য বিবিধ আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিলেন। ১৯০৪ সনে বর্ধমানে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতি হইয়াছিলেন। অভিভাষণে তিনি বলেন যে, "পরাধীন জাতির রাজনীতি নাই" ("A subject nation has no politics")। এই উক্তিটি লইয়া রাজনীতিক মহলে বিশেষ আলোচনার সৃষ্টি হয়। তিনি সমকালীন রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টায় সক্রিয়ভাবে যোগদান করেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তনে অগ্রণীদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা রূপেও ইহার নাম স্মরণীয়। তিনি বহু বৎসর ইহার অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন। তিনি জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সভাপতি ছিলেন তিন বৎসর (১৯২০—১৯২৩)। বেঙ্গল ল্যান্ডহোল্ডার্স এসোসিয়েসন প্রতিষ্ঠার মূলেও ছিলেন আশুতোষ। এই প্রতিষ্ঠানটি স্বদেশী আন্দোলনের কালে গঠনমূলক কার্যে বিশেষ সহায়তা করে। আশুতোষ ১৯১২ সনে উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে (দিনাজপুর) সভাপতি হন। হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠা কন্যা প্রতিভা দেবীর সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয়। পত্নীর সঙ্গীতানুশীলন এবং সঙ্গীত শিক্ষাদানে তিনি বিশেষ উৎসাহ দান করিতেন।

"চৌধুরী মহাশয় সদালাপী, মিষ্টভাষী, বিনয়নম্র ও অমায়িক লোক ছিলেন। যেমন কাজের লোক ছাড়া সংসার চলে না, তেমনি কেবল কাজের লোকই পৃথিবীতে থাকিলে লোকালয়ের আনন্দ ও শ্রীসৌন্দর্য্য থাকে না, তজ্জন্য সামাজিকতার প্রয়োজন আছে। চৌধুরী মহাশয় যে কাজের লোক ছিলেন না, তাহা নহে; কিন্তু তিনি সামাজিকতার জন্য লোকপ্রিয় ছিলেন। এইজন্য তাঁহার অভাবে কলিকাতার বাঙ্গালী সমাজের এই অংশ অন্যতম ভূষণ হারাইল।"—'প্রবাসী', আষাঢ় ১৩৩১, পৃঃ ৪৭৫।

সর্ রাজেন ও লেডী মুখার্জী : সর্ রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং পত্নী লেডী যাদুমণি মুখোপাধ্যায়। ১৮৮৪, জুন মাসে রাজেন্দ্রনাথ চব্বিশ পরগনা জেলার অন্তর্গত বসিরহাট মহকুমার ভাবলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ছয় বৎসর বয়সে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। শৈশব ও কৈশোরে তিনি অতি কষ্টে বিদ্যাভ্যাস করেন। বিপদে-আপদে মাতা ছিলেন একমাত্র সহায়। কোনরূপে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া রাজেন্দ্রনাথ কলিকাতায় ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে প্রবেশ করেন। তখন এই কলেজ প্রেসিডেন্সী কলেজের অঙ্গরূপে উহারই হাতার মধ্যে অবস্থিত ছিল। কলেজের ত্রিবার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি অপরের সঙ্গে অংশীদাররূপে ঠিকাদারী কার্য আরম্ভ করেন। কঠোর পরিশ্রম, অপূর্ব অধ্যবসায়, আশ্চর্য সততা এবং নিয়মানুবর্তিতার গুণে রাজেন্দ্রনাথ ক্রমে ব্যবসায়ে উন্নতি করিতে থাকেন। তিনি কলিকাতা, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, বারাণসী, পাটনা প্রভৃতি অঞ্চলে জলের কলের ঠিকাদারী করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। মার্টিন কোম্পানীর সমান অংশী রূপে তিনি ইহাতে যোগ দেন। পরে তিনিই ইহার সম্পূর্ণ মালিক হন। রাজেন্দ্রনাথ বার্ন কোম্পানীর লৌহ-কারখানা ক্রয় করিয়া যান। ইহা এখন একটি বিরাট প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। ব্যবসাক্ষেত্রে রাজেন্দ্রনাথ স্বদেশে ও বিদেশে বিশেষ মর্যাদা লাভ করিয়াছিলেন। ১৯১১ সনের দিল্লী দরবারে তিনি 'নাইট' উপাধি প্রাপ্ত হন। রাজেন্দ্রনাথের দেশহিতৈষণার বিষয় উল্লেখযোগ্য। তিনি নিজ গ্রামে স্কুল ও হাসপাতাল স্থাপন করেন। কলিকাতা শ্যামবাজারস্থ অনাথ আশ্রম তাহারই অর্থ-সাহায্যে এবং প্রত্যক্ষ পরিচালনায় একটি বিশিষ্ট সমাজহিতকর প্রতিষ্ঠানে দাঁড়াইয়াছিল। 'সোসাইটি ফর্ ইম্প্রুভমেণ্ট অফ্ ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস্'-এর সঙ্গে তাঁহার যোগ

ছিল ঘনিষ্ঠ। শেষ দিকে কয়েক বৎসর তিনি ইহার সভাপতিত্ব করেন। বঙ্গের অনুন্নত সমাজের সর্বপ্রকার শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেন এই সোসাইটি।

॥ বার ॥

মিসেস পি. কে. রায় : সরলা রায় (? ১৮৬... —১৯৪৬)। দুর্গামোহন দাসের জ্যেষ্ঠা কন্যা। হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় এবং বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়ে সরলা অধ্যয়ন করেন। বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়ে ১৮৭৬ সনে সরলা চতুর্থ শ্রেণীর পরীক্ষা দিয়া কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। কাদম্বিনী বসু (গাঙ্গুলী) ছিলেন তাঁহার সহপাঠিনী। ১৮৭৮ সনে বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয় বেথুন স্কুলের সহিত মিলিত হইলে, প্রবেশিকার টেস্ট পরীক্ষায় সরলা ও কাদম্বিনী উভয়েই উত্তীর্ণ হন। এই সময় ডক্টর প্রসন্নকুমার রায়ের সঙ্গে সরলার বিবাহ হওয়ায় তিনি আর বিশ্ববিদ্যালয়ের এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিতে সক্ষম হন নাই। উপযুক্ত শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীর তত্ত্বাবধানে সরলা ইংরেজী, বাংলা ও অন্যান্য বিষয় ভাল করিয়া অধিগত করেন। শিক্ষার প্রতি তাঁহার অনুরাগ আজীবন প্রবল ছিল। স্বামীর সঙ্গে ঢাকায় গমনান্তর তিনি নারী-শিক্ষা-মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। কলিকাতায় আগমনান্তর সরলা ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ের সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। এই শিক্ষালয়ের প্রথম মহিলা সম্পাদক তিনি। কিন্তু তাঁহার প্রধান কীর্তি গোখলে মেমোরিয়াল স্কুল ও কলেজ। এই বিদ্যালয়টি উন্নত ধরনের নারী-শিক্ষা-কেন্দ্র। ঐকান্তিক শিক্ষানুরাগ এবং শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় নৈপুণ্য প্রদর্শনের পুরস্কারস্বরূপ তাঁহাকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সদস্য পদে বৃত করা হইয়াছিল। তিনিই সেনেটের প্রথম মহিলা সদস্যা। সরলা রায় ১৯৪৬, ২৯শে জুন ছিয়াশী বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন।

প্রতিভা দিদি : প্রতিভা দেবী (১৮৬০—১৯২২)। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তৃতীয় পুত্র হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠা কন্যা। হেমেন্দ্রনাথেব তত্ত্বাবধানে গৃহে বসিযাই তিনি শিক্ষালাভ করেন। সঙ্গীত-বিদ্যায়ও কৈশোর হইতে তিনি পারদর্শিনী হন। 'ভারতী ও বালক' এবং 'ভারতী'তে সে যুগে তাঁহার বিস্তর 'স্বরলিপি' প্রকাশিত হয। রবীন্দ্রসঙ্গীতের তিনি অন্যতম ধারক ছিলেন। বিখ্যাত ব্যারিস্টার, দেশকর্মী ও সমাজহিতৈষী আশুতোষ চৌধুরীর সঙ্গে তিনি পরিণীতা হন। তিনি কয়েকটি ভাষা জানিতেন, এছাড়া সাধারণ শিক্ষায়ও তিনি সুশিক্ষিতা ছিলেন। তিনি স্বামীর সকল কাজে উৎসাহী সঙ্গিনী ছিলেন। আবার তাঁহার বিবিধ প্রয়াসেও স্বামী যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন। প্রতিভা দেবী সঙ্গীত শিক্ষা দিবার জন্য 'সঙ্গীত সংঘ' স্থাপন করেন। ঐ বিষয়ে ছাত্রছাত্রীবা যাহাতে সুশিক্ষা লাভ করে তজ্জন্য বিশেষ যত্ন লইতেন। তিনি 'আনন্দ-সঙ্গীত' পত্রিকা নামক সঙ্গীত-বিষয়ক একখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন। ইন্দিরা দেবীর সহযোগে তিনি ইহা সম্পাদন কবিতেন।

চন্দ্রমাধব ঘোষ : (১৮৩৮—১৯২৮)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় (১৮৫৭) চন্দ্রমাধব প্রেসিডেন্সী কলেজেব ল বিভাগ হইতে উত্তীর্ণ হন। ১৮৫৯ সনে আইন পরীক্ষা পাশ করেন। কলিকাতা হাইকোর্টে তিনি আইন ব্যবসা আরম্ভ করিয়া খ্যাতিলাভ করেন। ১৮৮৫ সনে হাইকোর্টের বিচারপতি পদে তিনি অধিষ্ঠিত হন। এই পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন ১৯০৭ সনের জানুয়ারী মাসে। মধ্যে তিনি অস্থায়ী প্রধান বিচারপতির আসনও গ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো এবং ফ্যাকালটি অফ্ ল-এর ডীন বা অধ্যক্ষ হন। ১৯২৮ সনের জানুযারী মাসে তিনি দেহত্যাগ করেন। চন্দ্রমাধব ঘোষের পরিবারের সঙ্গে সরলা দেবীর ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের কথা পুস্তকে বিবৃত হইয়াছে।

॥ তের ॥

সখা : এই নামে বালক-বালিকাদের পাঠোপযোগী একখানি সচিত্র মাসিক পত্রিকা জানুয়ারী ১৮৮৩ হইতে প্রমদাচরণ সেনের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। ১৮৮৫ সনের ২১শে জুন প্রমদাচরণের মৃত্যু হইলে, পরবর্তী জুলাই মাস হইতে ১৮৮৬ সন পর্যন্ত 'সখা' সম্পাদনা করেন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী। 'সখা'র আনুকূল্যে বালক-বালিকাদের মধ্যে রচনা-প্রতিযোগিতা হইত, এবং যাহার রচনা উৎকৃষ্টতম বিবেচিত হইত তিনি পুরস্কৃত হইতেন। সরলা দেবী লিখিয়াছেন যে, তিনি বার বৎসর বয়সে এইরূপ একটি প্রতিযোগিতায় কবিতা লিখিয়া প্রথম পুরস্কার পাইয়াছিলেন। 'সখা'য় দেখিতেছি, তাঁহার একটি পুরস্কৃত রচনা প্রকাশিত হয়, তবে এটি কিন্তু গদ্য রচনা; ইহা ১৮৮৫ সনের নবেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। রচনাটির নাম 'পিতামাতার প্রতি কর্তব্য'। প্রবন্ধশেষে সরলা দেবীর বয়স লিখিত হইয়াছে "১২ বৎসর ১১ মাস"।

দ্বিজু রায় : দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩—১৯১৩)। কৃষ্ণনগরের মহারাজার দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্রের পুত্র। তিনি কৃষ্ণনগর স্কুল ও কলেজ এবং প্রেসিডেন্সী কলেজে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। শেষোক্ত কলেজ হইতে এম-এ পাস করিয়া স্টেট স্কলারশিপ পান এবং কৃষিবিদ্যা অধ্যয়নের নিমিত্ত বিলাত গমন করেন। স্বদেশে ফিরিয়া তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ লাভ করেন (১৮৮৬)। ১৯০৯ সনে এই পদ হইতে অবসর লন। বিলাতে অবস্থান কালেই তিনি সাহিত্যচর্চায় মন দেন। তাঁহার প্রথম পুস্তক ইংরেজীতে—'Lyrics of Ind' (১৮৮৭)। দ্বিজেন্দ্রলাল বাংলা সাহিত্যে কবিতা ও নাটক লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন। তাঁহার হাসির গান বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। সরলা দেবী 'বাঙ্গালার হাসির গান ও তার কবি' প্রবন্ধে ইহার সবিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন।

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী : (১৮৫৮—১৯২৪)। 'অশ্রুকণা'র কবি গিরীন্দ্রমোহিনী নামে তিনি খ্যাত হইয়াছিলেন। চব্বিশ পরগনার অন্তর্গত মজিলপুর গ্রামে মাতুলালয়ে তাঁহার জন্ম হয়। পিতা হারানচন্দ্র মিত্রের আদি নিবাস পানিহাটিতে। কলিকাতা বৌবাজারে দুর্গাচরণ দত্তের কনিষ্ঠ পুত্র নরেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে দশ বৎসর বয়সে গিরীন্দ্রমোহিনীর বিবাহ হয়। বিবাহের পরে প্রথম প্রথম অসুবিধা হইলেও তিনি বিদ্যাচর্চা বরাবর অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। গিরীন্দ্রমোহিনীর কাব্যগ্রন্থসমূহ সাহিত্যরসিক-সমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল। 'জাহ্নবী' (১৩১১, আষাঢ়) সম্পাদনেও তিনি বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় গিরীন্দ্রমোহিনী দেশসেবায় রত হন। মজিলপুরে এই সময় যে স্বদেশী প্রদর্শনী হয় তাঁহার অন্যতম সহকারী সম্পাদিকা ছিলেন গিরীন্দ্রমোহিনী। তাঁহার 'রাখীবন্ধন' কবিতাটি স্বদেশবাসীদের মনে বিশেষ প্রেরণা জোগায়।

এন্. ঘোষ, ব্যারিস্টার : নগেন্দ্রনাথ ঘোষ (১৮৫৪—১৯০৮)। ব্যারিস্টার ও শিক্ষাব্রতী। প্রথমে কলিকাতায় এবং পরে বিলাতে অধ্যয়ন করেন। ১৮৭৬ সনে ব্যারিস্টার হইয়া এদেশে আসেন। আইন-ব্যবসার বদলে অধ্যাপনা এবং সংবাদপত্র-সেবাকে জীবিকার অবলম্বন করিয়া লন। তিনি মেট্রোপলিটন কলেজের প্রথমে অধ্যাপক এবং পরে অধ্যক্ষ হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ যোগস্থাপন হয়। *England's Work in India*—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রচারিত তাঁহার বিখ্যাত পাঠ্যপুস্তক। নগেন্দ্রনাথ *Indian Nation* নামক সাপ্তাহিকের সম্পাদক এবং পরিচালক ছিলেন। 'কৃষ্ণদাস পালের জীবনী' এবং 'মহারাজা নবকৃষ্ণ' তাঁহার দুইখানি প্রসিদ্ধ ইংরেজী গ্রন্থ।

লোকেন পালিত : (? ১৮৬৫—?)। সর্ তারকনাথ পালিতের পুত্র। সাহিত্য-রসিক, রবীন্দ্রনাথের বিশেষ বন্ধু। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৮৬ সনে কর্মে লিপ্ত হন। ১৯১২ সনে পদত্যাগ করেন, মনে হইতেছে। ইহার পর তিনি কিছুকাল ব্যারিস্টারী করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ 'জীবন-স্মৃতি'তে (বিশ্বভারতী সং ১৩৬৩, পৃ. ৯৮) অন্যান্য কথার মধ্যে লিখিয়াছেন: "সাহিত্যে লোকেনের প্রবল আনন্দ আমার রচনার বেগকে পালের হাওয়ার মতো অগ্রসর করিয়াছে। আমার পূর্ণ যৌবনের দিনে 'সাধনা'র সম্পাদক হইয়া অবিশ্রামগতিতে যখন গদ্যপদ্যের জুড়ি হাঁকাইয়া চলিয়াছি তখন লোকেনের অজস্র উৎসাহ আমার উদ্যমকে একটুও ক্লান্ত হইতে দেয় নাই। তখনকার কত পঞ্চভূতের ডায়ারি এবং কত কবিতা মফঃস্বলে তাঁহারই বাংলাঘরে বসিয়া লেখা। আমাদের কাব্যালোচনা ও সঙ্গীতের সভা কতদিন সন্ধ্যাতারার আমলে সুরু হইয়া শুকতারার আমলে ভোরের হাওয়ার মধ্যে রাত্রের দীপশিখার সঙ্গে সঙ্গেই অবসান হইয়াছে।" লোকেন পালিতের বহু প্রবন্ধ 'ভারতী'র পৃষ্ঠায় স্থান পাইয়াছে।

॥ চৌদ্দ ॥

মোহিনীবাবু : মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় (১৮৫৮—১৯৩৬)। মোহিনীমোহন ১৮৭৯ সনে এম-এ, ১৮৮০ সনে বি-এল্ এবং ১৮৮৩ সনে এটর্নীশিপ পরীক্ষা পাস করেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠা কন্যা সরোজা দেবীর সঙ্গে ১৮৭৬ সনে মোহিনীমোহনের বিবাহ হয়। ১৮৮৩ সনের মাঝামাঝি মোহিনীমোহন বিখ্যাত থিয়সফিস্ট মাদাম ব্লাভাট্স্কির সেক্রেটারী হইয়া ইউরোপ যাত্রা করেন। ইংলণ্ডে অবস্থান-কালে বহু ইংরেজ মনীষীর সঙ্গে তিনি পরিচিত হন। থিয়সফির সঙ্গে ক্রমে তাঁহার বিচ্ছেদ ঘটে। মোহিনীমোহন আমেরিকায় গমন করেন। ১৮৮৯ সনে স্বদেশে ফিরিয়া তিনি এটর্নীর ব্যবসায়ে মন দেন। বহু সামাজিক এবং জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁহার যোগ ছিল। তিনি পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ইংরেজী-বাংলা বহু পুস্তক ও প্রবন্ধ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত কয়েকখানি পুস্তক: ব্যাখ্যাসহ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা: ইংরেজী অনুবাদ, Indian Spirituality, History as a Science, ভিক্ষার ঝুলি, জীবন-প্রবাহ (কবিতা), অবলা জীবনের আঁধার কোণ এবং প্রণবাদির ব্যাখ্যা। ইহা ছাড়া পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামীর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, উপদেশাবলীর সংগ্রহ, পরমকল্যাণ গীতা, প্রভৃতি পুস্তকও উল্লেখযোগ্য।

রমণীবাবু : রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায় (১৮৬০—১৯১৯)। মোহিনীমোহনের মধ্যম ভ্রাতা। তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে এম-এ পাস করিয়া পুরাতন মেট্রো-পলিটন (বিদ্যাসাগর) কলেজে অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। পরে জানকীনাথ ঘোষালের সহায়তায় কলিকাতা কর্পোরেশনের লাইসেন্স অফিসারের পদ লইয়াছিলেন। তিনি পরে ইহার ভাইস-চেয়ারম্যান হন। মধ্যে দুবৎসর তিনি ত্রিপুরারাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর কার্য করেন। রমণীমোহন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠা কন্যা ঊষা দেবীর পাণিগ্রহণ করেন।

যোগিনী ও রজনী : যথাক্রমে যোগিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় (১৮৬৩—১৯৩২) এবং রজনীমোহন চট্টোপাধ্যায় (১৮৬৫—১৯৩৪)। রজনীমোহন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠা ভগিনী সুনয়নী দেবীকে বিবাহ করেন।

॥ পনর ॥

গগনদাদা : গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬৭—১৯৩৮)। শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। গগনেন্দ্রনাথ বিখ্যাত ব্যঙ্গচিত্র-শিল্পী। তাঁহার বিখ্যাত ব্যঙ্গচিত্র-গ্রন্থ Roform Screams ('নব হুল্লোড়') ১৯২২ সনে প্রকাশিত হয়। নিজে বিদ্যোৎসাহী এবং সাহিত্যসেবীদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

॥ ষোল ॥

মহারাণী গার্লস্ স্কুল, মহীশুর : সরলা দেবী এই বিদ্যালয়ে এক বৎসর কাল কর্মে লিপ্ত ছিলেন। সমসাময়িক পত্রিকাদিতে এই সময়কার কিছু কিছু সংবাদ বাহির হয়। ইহাতে সরলা দেবীর কার্যকলাপের উপর আলোকপাত হইতেছে:

(১) "ভারতীর ভূতপূর্ব সম্পাদিকা শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা শ্রীমতী সরলা দেবী মহীশূর মহারাণীর কলেজে অধ্যাপিকা ছিলেন। তিনি সম্প্রতি ৪৫০ টাকা বেতনে বরদার মহারাণীর প্রাইভেট সেক্রেটারী হইয়াছেন।"—'বামাবোধিনী পত্রিকা', অগ্রহায়ণ ১৩০২।

(২) "কুমারী সরলাদেবী—ইনি বরদার মহারাণীর প্রাইভেট সেক্রেটারীর পদ ত্যাগ করিয়া পুনরায় মহীশূরের কর্মে ফিরিয়া গিয়াছেন।"—ঐ, ফাল্গুন ১৩০২।

॥ সতর ॥

ডন সোসাইটির সতীশ মুখুয্যে : সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল (১৮৬৫—১৯৪৮)। সতীশচন্দ্র হিন্দুশাস্ত্র চর্চা ও সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন-কল্পে ভবানীপুরে একটি সংস্কৃত চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। ইহার মুখপত্র-স্বরূপ ১৮৯৭ সনে 'ডন পত্রিকা' প্রকাশিত করিলেন। এই পত্রিকার নাম হইতে ১৯০২ সনে 'ডন সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয়। বঙ্গের বহু শ্রেষ্ঠ মনীষীর প্রবন্ধাবলী এই পত্রিকায় স্থান পাইতে থাকে। ডন-সোসাইটিতে সে যুগের উৎকৃষ্ট যুবক ছাত্রগণ যোগ দিয়াছিলেন। সোসাইটির যুবক সদস্যদের মধ্যে অনেকে পরবর্তী কালে বিভিন্ন বিভাগে খ্যাতিলাভ করেন। সতীশচন্দ্রের যুবক শিষ্য এবং ডন সোসাইটির যুবক সদস্যদের মধ্যে বিনয়কুমার সরকার, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, হারানচন্দ্র চাকলাদার, রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, প্রফুল্লকুমার সরকার প্রভৃতি প্রধান ছিলেন। সতীশচন্দ্র স্বদেশী আন্দোলনের সময় বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ ও স্কুলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হন। অরবিন্দ ঘোষ (শ্রীঅরবিন্দ) পদত্যাগ করিলে সতীশচন্দ্র ইহার অধ্যক্ষ হন।

বঙ্গের বীর সিরিজের দুখানি বই : এই সিরিজের একখানি বই দেখিয়াছি, নাম —'পিতৃধন', 'ভারতী'তে প্রকাশিত প্রবন্ধ সংশোধিত ও পরিবর্ধিত আকারে মুদ্রিত হয়।

নরেন্দ্রনাথ সেন : (১৮৪৩—১৯১১)। রামকমল সেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিমোহন সেন, তদীয় চতুর্থ পুত্র নরেন্দ্রনাথ। প্রথমে হিন্দু কলেজ ও পরে নিজ গৃহে বিদ্যাভ্যাস করেন। তিনি অল্পবয়স হইতেই সংবাদপত্র সেবায় মনঃসংযোগ করেন। কিশোরীচাঁদ মিত্রের 'ইণ্ডিয়ান ফিল্ডে' প্রথম প্রথম তাঁহার রচনা প্রকাশিত হইত। ১৮৬১ সনে 'ইণ্ডিয়ান মিরর' প্রকাশিত হইলে তিনি ইহার নিয়মিত লেখক হইলেন। সম্পাদক মনোমোহন ঘোষ ১৮৬৩ সনে বিলাত যান। তদবধি ১৮৮৬ সন পর্যন্ত নরেন্দ্রনাথ এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। কেশবচন্দ্র সেনের তত্ত্বাবধানে ১৮৭১ সন হইতে

এখানি দৈনিকে পরিণত হয়; এই সময় নরেন্দ্রনাথ পুনরায় ইহার সঙ্গে যোগ দেন। কিছুকাল পরে তিনি ক্রমে ইহার সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী হইলেন এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি রাজনীতিজ্ঞ, সমাজসেবী এবং থিয়সফিস্ট মতাবলম্বী ছিলেন। কংগ্রেসের পরিকল্পনা ও প্রতিষ্ঠা অবধি দীর্ঘকাল তিনি ইহার সঙ্গে যুক্ত থাকেন। প্রথম কংগ্রেসের (বোম্বাই) অধিবেশনে বঙ্গের তিনজন প্রতিনিধির মধ্যে তিনি ছিলেন একজন। স্বদেশী আন্দোলনেও তাঁহার সক্রিয় সহযোগিতা লক্ষণীয়। তবে তিনি ছিলেন ধীরপন্থী, অগ্রগামী রাজনীতিক দল বা মতবাদের তিনি সমর্থক ছিলেন না। ১৯১১ সনে সরকারী আনুকূল্যে তাঁহারই সম্পাদনায় 'সুলভ-সমাচার' পুনঃপ্রকাশিত হয়। বিভিন্ন সাহিত্য-সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠানের সভাপতিপদে বৃত হইয়াছিলেন।

॥ আঠার ॥

বীরাষ্টমীর ব্রত সম্বন্ধে পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এ বিষয়ক সঙ্গীত 'বীরাষ্টমীর গান' নিম্নে দিলাম :

জান কী মানব কোথাকার তুমি সোনা হতে মূল্যবান,
কোথা বহে বায়ু সদা সুশীতল জুড়াইতে মন প্রাণ।
কোথা ফুটে ফুল সুবাসে অতুল পারিজাত যার নহে সমতুল,
কোথাকার নীর সদা সুধা ঝরে, কারে হেরে হয় পুলকিত মন।
পিতামাতা দারাসুত পরিজন, সবা হতে বল কেবা প্রিয়তম,
সাধিবারে কায লভিলে মরণ, মানব হইবে দেবতা সমান।
স্বর্গ হ'তে শ্রেষ্ঠ বল কে বৈভবে, সুধা হ'তে স্বাদু কার নাম ভবে,
শোন রে মানব শোন মন দিয়ে,
সে যে জন্মভূমি মহা মহীয়ান্।
স্বদেশানুরাগে যে জন জাগে, অতি মহাপাপী হোক না কেন
তবুও সে জন অতি মহাজন সার্থক জনম তাহার জেনো।
দেশহিতব্রত এ পরশমণি, পরশিবে যারে বারেক যখনি,
রাজভয় আর কারাভয় তার ঘুচিবে তাহার তখনি জেনো।
মাতৃভূমি তরে যেই অকাতরে নিজ প্রাণ দিতে কভু নাহি ডরে
অপঘাত ভয় আশু তার যায় মরণে গোলোক যায় সেই জন।

॥ উনিশ ॥

জাপানী চিত্রকর : ইয়োকোয়ামা : ইহার কৃত 'কালী' চিত্রের ফোটো 'প্রবাসী', আশ্বিন ১৩১০-এ প্রকাশিত হয়। "By the courtesy of Miss Ghosal"—চিত্রের নিম্নে চিত্র ও চিত্রকরের নামের সঙ্গে এইরূপ লিপিবদ্ধ আছে।

—যুন্সো হিষিডা, টোকিও কৃত 'সরস্বতী'—'প্রবাসী', কার্তিক ১৩১০। উক্ত প্রকার ইহার নিম্নেও মিস্ ঘোষালের সৌজন্যে লিখিত হইয়াছিল।

ওকাকুরা : ওকাকুরা, ইহার বিখ্যাত পুস্তক 'The Ideal of the East, with special reference to the art of Japan'—১৯০৩ সনে লণ্ডন হইতে প্রকাশিত হয়।

সত্যসুন্দর দেব : জন্ম ২৯শে ডিসেম্বর ১৮৮১। পিতা—ত্রৈলোক্যনাথ দেব। সত্যসুন্দর ১৯০৩ সনের মে মাসে 'Society of Theist' নামক এক সমিতির

বৃত্তিলাভ করিয়া শিল্প ও কারিগরি বিদ্যা শিক্ষার জন্য জাপানে গমন করেন। জাপান হইতে ফিরিয়া তিনি 'Calcutta Pottery Works' স্থাপন করেন। সত্যসুন্দর দেবের পুত্র সরল দেবের কথাও পুস্তকে উল্লিখিত হইয়াছে।

॥ কুড়ি ॥

'ভারতী' পত্রিকার গৌরব বৃদ্ধির জন্য সরলা দেবী বাঙ্গালী ছাড়াও অবাঙ্গালী কয়েকজন বিখ্যাত মনীষীর ইংরেজী রচনা বাংলায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশিত করেন। এইরূপ কয়েকটি রচনা ঃ

আর্য্যা নিবেদিতা ঃ 'প্রত্যেক মা ছেলের জন্য কি করিতে পারে'—'ভারতী', জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬, 'বঙ্গমাতার কর্ত্তব্য'—'ভারতী', শ্রাবণ ১৩০৬

মহাদেব গোবিন্দ রানাড়ে ঃ 'পূর্ব্বকালের সমাজশাসন'—'ভারতী', শ্রাবণ ১৩০৭

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ঃ 'দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতোপনিবেশ'—'ভারতী', বৈশাখ ১৩০৯

শিতোবু হোরী ঃ 'জাপানের সনাতন আদর্শ'—'ভারতী', বৈশাখ ১৩১০

॥ একুশ ॥

স্বামী স্বরূপানন্দ (? ১৮৭২—১৯০৬) ঃ পূর্বাশ্রমে স্বামিজীর নাম ছিল অজয়হরি বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ভবানীপুরে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহযোগে হিন্দুশাস্ত্র চর্চা এবং হিন্দু-সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের উদ্দেশ্যেও একটি চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা করেন। 'ডন' পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশেও তিনি সতীশচন্দ্রের সহযোগী হন। স্বামী বিবেকানন্দের সংস্রবে আসিয়া তিনি ১৮৯৮ সনে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন। তিনি মায়াবতী অদ্বৈতাশ্রমের প্রথম অধ্যক্ষ। 'প্রবুদ্ধ ভারত' মাদ্রাজ হইতে মায়াবতীতে নীত হইলে তিনি ইহার সম্পাদনায় ব্রতী হন। আট বৎসর কাল তিনি যোগ্যতার সহিত 'প্রবুদ্ধ ভারত' সম্পাদনা করেন। তিনি সেবাপরায়ণ ছিলেন এবং যুবকগণকে সেবাধর্মে উদ্বুদ্ধ করেন। স্বরূপানন্দ হিন্দুশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাঁহার বেদান্তব্যাখ্যা শ্রবণে শ্রোতৃগণ মুগ্ধ হইতেন। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার তৎকৃত শঙ্করভাষ্য-ভিত্তিক ইংরেজী অনুবাদ শিক্ষিত-সমাজে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। সরলা দেবী হিমালয়ে অবস্থানকালে স্বামী স্বরূপানন্দের নিকট শাস্ত্র-ব্যাখ্যা শুনিয়া সবিশেষ মুগ্ধ হন।

॥ বাইশ ॥

আনন্দ রায় ঃ আনন্দচন্দ্র রায় (? ১৮৪৪—১৯৩৫)। কবি গোবিন্দচন্দ্র রায়ের মধ্যম ভ্রাতা, স্বদেশী আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট নেতা। আনন্দচন্দ্রের কর্মক্ষেত্র ছিল ঢাকায়। এখানে তিনি ওকালতি ব্যবসা করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন। আলিপুর বোমার মামলা, কুমিল্লা শুটিং কেস্‌ প্রভৃতি রাজনৈতিক মোকদ্দমায় তিনি অন্যতম কৌঁসুলী ছিলেন। রাজনীতিজ্ঞ এবং সমাজকর্মী হিসাবে তাঁহার প্রসিদ্ধি। শিক্ষা, শিল্প-প্রতিষ্ঠানাদির সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। ঢাকায় মিউনিসিপ্যালিটির প্রথম বেসরকারী চেয়ারম্যান, বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতি, ঢাকেশ্বরী কটন মিলস্‌, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের অন্যতম উদ্যোক্তা। ৯১ বৎসর বয়সে তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন।

॥ তেইশ ॥

যতীন বাড়ুয্যে : যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (? ১৮৭৭—১৯৩০)। যতীন্দ্রনাথ আদি যুগের বিখ্যাত বিপ্লবী। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি এলাহাবাদের কায়স্থ পাঠশালায় (কলেজ) ভর্তি হন। তখন 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন-রিভিয়ু'র প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক কায়স্থ পাঠশালার প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। যতীন্দ্রনাথের এলাহাবাদ গমনের আসল উদ্দেশ্য ছিল 'দেহাতী হিন্দী' শেখা, যাহাতে সৈন্যদলে সহজে ভর্তি হইতে পারেন। তখনকার দিনে বাঙ্গালীর পক্ষে সৈন্যবিভাগে ভর্তি হওয়া নিষিদ্ধ ছিল। তিনি বরদার সৈন্যদলে ছদ্মনামে প্রবেশ করেন। এখানে অরবিন্দ ঘোষের (শ্রীঅরবিন্দ) সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয়। যতীন্দ্রনাথ ও অরবিন্দের ভিতরে বৈপ্লবিক উপায়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা চলিয়াছিল। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "কথিত আছে, শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ যতীন্দ্রনাথের নিকট হইতে স্বাধীনতার মন্ত্র লাভ করেন।" প্রসিদ্ধ বিপ্লবী ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় ও ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত যতীন্দ্রনাথ প্রমুখাৎ শ্রবণান্তর অনুরূপ উক্তিই করিয়াছেন। বাঙ্গালী বলিয়া পরিচিত হইবার উপক্রম হইলে যতীন্দ্রনাথ সৈন্যবিভাগ ত্যাগ করেন এবং অরবিন্দের পত্র লইয়া ১৯০২ সনে কলিকাতায় আসিয়া সরলা দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। অতঃপর কলিকাতাস্থ ১০৮নং আপার সারকুলার রোডে যতীন্দ্রনাথ একটি ক্লাব স্থাপন করেন। শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ ১৯০৩ সনের প্রারম্ভে যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগদান করিলেন। কিন্তু ১৯০৪ সন নাগাদ এই বিপ্লবী সংঘটি নানা কারণে ভাঙ্গিয়া যায়। যতীন্দ্রনাথ দক্ষ ঘোড়সওয়ার ছিলেন। তিনি সংঘের সভ্যদের ডনকুস্তি, অশ্বারোহণ, অসিচালনা প্রভৃতি শিক্ষা দিতেন, আবার তাহাদের বৈপ্লবিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত যোগ্য ব্যক্তিদের দ্বারা বিভিন্ন দেশের বৈপ্লবিক ইতিহাস শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যতীন্দ্রনাথ অশ্বারোহণে বালীগঞ্জ সারকুলার রোড অঞ্চলে গিয়া বিলাতফেরত ব্যারিস্টার এবং বিত্তশালী ব্যক্তিদের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিতেন। ব্যারিস্টার পি. মিত্র ছিলেন এই বিপ্লবী সংঘের সভাপতি। যতীন্দ্রনাথ সরলা দেবী সম্পাদিত 'ভারতী'তে ইটালীর স্বাধীনতা আন্দোলনের নায়ক ম্যাটসিনি ও গ্যারিবল্ডীর জীবনবৃত্ত লিখিয়াছিলেন। বিপ্লবী সংঘ ভাঙ্গিয়া যাইবার কিছুকাল পরে যতীন্দ্রনাথ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তাঁহার সন্ন্যাসাশ্রমের নাম—স্বামী নিরালম্ব। আলিপুর বোমার মামলায় তিনি ধৃত হন, কিন্তু প্রাথমিক প্রমাণাভাবে চারিমাস হাজতবাসের পরই তিনি মুক্তিলাভ করেন।

সরলা দেবী চৌধুরানী

১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ৯ই সেপ্টেম্বর জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ীতে মাতুলালয়ে সরলা দেবীর জন্ম হয়। সরলা দেবীর পিতা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সংগঠক, কৃষ্ণনগর জমিদার বংশের সন্তান জানকীনাথ ঘোষাল ও মাতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা স্বর্ণকুমারী দেবী। সরলা দেবীর শৈশবকাল কেটেছিল—সাহিত্য-সংস্কৃতি ও সঙ্গীতের পীঠস্থান এই ঠাকুরবাড়ীতে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তখনও জীবিত। সরলা দেবীর জন্মকালে ভবিষ্যতের বিশ্বকবি অন্যতম মাতুল রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রায় একাদশ বর্ষের বালক।

সাড়ে সাত বছর বয়সে সরলা দেবী বেথুন ইস্কুলে ভর্তি হয়ে যথা সময়ে কৃতিত্বের সঙ্গে এন্ট্রান্স পাশ করেন। তারপর বেথুন কলেজে ভর্তি হয়ে এফ-এ পাশ করেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে এই কলেজ থেকেই ইংরাজী অনার্স নিয়ে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক হন। এই সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৭ বৎসর। ইতিমধ্যেই তিনি গৃহশিক্ষকের সহায়তায় সংস্কৃত, ফরাসী ও ফার্সী ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। বি-এ পাশ করার পর তিনি সংস্কৃতে এম-এ পরীক্ষা দেবার জন্য প্রস্তুত হন, কিন্তু পরীক্ষা দেওয়া হয়ে ওঠেনি।

প্রায় শৈশবেই সাহিত্য ও সঙ্গীত সাধনায় সরলা দেবীর দীক্ষা হয়। তিনি যখন ইস্কুলের ছাত্রী তখনই তাঁর রচনা 'সখা' ও 'বালক' কাগজে প্রকাশিত হত। এর কিছু পরেই 'ভারতী'তে তাঁর রচনা প্রকাশিত হতে থাকে। মাতা স্বর্ণকুমারী দেবী ছিলেন তখন 'ভারতী'র সম্পাদিকা। পরবর্তীকালে এই বালিকা লেখিকা ১৩০২ থেকে ১৩০৪ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত অগ্রজা হিরন্ময়ী দেবীর সঙ্গে যুগ্মভাবে 'ভারতী' সম্পাদনায় ব্রতী ছিলেন। এর পর ১৩০৬ থেকে ১৩১৪ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত তিনি বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে এককভাবে 'ভারতী' সম্পাদন করেন। 'ভারতী'র সম্পাদিকারূপে সরলা দেবীর লক্ষ্য ছিল জাতির মধ্যে আত্ম-চেতনা সঞ্চার ও স্বাবলম্বন প্রবৃত্তির উদ্বোধন, জাতির মানসিক ও শারীরিক উন্নতি সাধন। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে তিনি কুস্তিগীর নিযুক্ত করে যুবকদের শরীর চর্চার জন্য কয়েকটি কেন্দ্র স্থাপন করেন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে সরলা দেবী বাংলার নানাস্থানে 'বীরাষ্টমী ব্রত' প্রবর্তন করেন। এই উৎসবগুলিতে যুবকগণ পত্রপুষ্প শোভিত তরবারি প্রদক্ষিণ করে রামচন্দ্র প্রভৃতি বীরপুরুষদের ন্যায় দুষ্ট দমনের সঙ্কল্প গ্রহণ করত। সহিংস বিপ্লবের মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য স্বদেশী-যুগে যে প্রচেষ্টার সূত্রপাত হয় তার অন্যতম প্রেরণাস্থল ছিল সরলা

দেবী প্রবর্তিত বীরাষ্টমী উৎসব। এই সময়ে সরলা দেবী যুবকগণকে সম্মিলিত করে জাতীয় গৌরবের স্মারকরূপে প্রতাপাদিত্য উৎসব, উদয়াদিত্য উৎসব প্রভৃতি পালনের ব্যবস্থা করেন। সরলা দেবী তদানীন্তন বাংলার বহু বিপ্লবী বীরের প্রেরণা ও সাহায্যদাত্রী ছিলেন। সরলা দেবীর নির্দেশে সর্বপ্রথম দেশ সেবায় ব্রতী যুবকদের পরস্পরের হাতে পারস্পরিক সাহায্য ও একতার নিদর্শন স্বরূপ 'রাখী' বেঁধে দেওয়ার প্রথাটি স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে বহুলভাবে প্রচলিত ও অনুসৃত হয়েছিল। স্বদেশী দ্রব্যের উৎপাদন ও ব্যবহার প্রচার উদ্দেশ্যে এই সময় তিনি 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' নামে একটি প্রতিষ্ঠানও স্থাপন করেছিলেন।

যে সহজাত সংগীত প্রতিভা নিয়ে সরলা দেবীর জন্ম হয়, ঠাকুর-বাড়ীর বাতাবরণে সহজেই তা পরিপুষ্ট হয়েছিল। বালিকা সরলার স্বভাব ছিল নতুন নতুন গান ও গানের সুর কুড়িয়ে বেড়ানো। বালিকার হৃদয়ে যে সুরদেবতা অধিষ্ঠিত ছিলেন তাঁকে নিত্য হবিঃদানে তাঁর পুষ্টি সাধন করে তার দ্বারা বালিকারও পুষ্টি বিধানের হোতা হলেন মাতুল রবীন্দ্রনাথ। "বন্দেমাতরম্" সংগীতের প্রথম দুটি পদে সুর সংযোজন করেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর আদেশে তাঁর স্নেহের শিষ্যা বাকী কথাগুলিতে সুর বসিয়েছিলেন। 'বন্দেমাতরম্'এর মন্ত্রের মর্যাদা ও লোকপ্রিয়তার পিছনে সংগীত-সাধিকা সরলা দেবীর দান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি এই গানটি বহুজনকে গাইতেও শিখিয়েছিলেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বারাণসীতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশনে সর্বপ্রথম সরলা দেবী স্বয়ং এই গানটি গেয়ে শ্রোতাদের প্রাণ আলোড়িত করে তোলেন। অতঃপর সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যেও 'বন্দেমাতরম্' একটি জাতীয় ধ্বনি বা রণহুঙ্কারে পরিণত হয়েছিল। সরলা দেবী স্বয়ং কতকগুলি জাতীয় ভাবোদ্দীপক গান রচনা করেন, এগুলি এক সময়ে বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। এর মধ্যে 'অতীত গৌরব কাহিনী মম বাণী গাও আজি হিন্দুস্থান..... নমো হিন্দুস্থান' ও 'নমো ভারত জননী' গান দুটির কথাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এঁর অনন্য সাধারণ সংগীতগুলি শতগান (১৯০০) ও গীতি-ত্রিংশতি (১৯৪৫) নামের পুস্তকদ্বয়ে বিধৃত হয়ে আছে।

সরলা দেবী স্বল্পকালের জন্য মহীশূরের মহারানী ইস্কুলের শিক্ষিকার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। এই সময়ের মধ্যেই দেশ ও সমাজসেবিকা, নারী-জাগরণ আন্দোলনের পুরোধা এবং অসামান্যা বিদুষীরূপে সমগ্র দক্ষিণ ও উত্তর ভারতেও তাঁর খ্যাতি সবিশেষ ছড়িয়ে পড়েছিল।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে পাঞ্জাবের বিখ্যাত আইনজীবী জাতীয়তাবাদী নেতা ও সমাজ সংস্কারক পণ্ডিত রামভুজ দত্ত চৌধুরীর সঙ্গে সরলা দেবীর বিবাহ হয়। অতঃপর সরলা দেবীর কর্মকেন্দ্র হয় পাঞ্জাব। পাঞ্জাবে দেশভক্ত স্বামীর সহযোগিতায় সরলা দেবী বিপ্লবী ও জাতীয়তাবাদী যুবক কর্মীদের সংগঠিত করেন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে স্বামীর সহযোগিতায় সরলা দেবী 'হিন্দুস্থান' নামে একটি উর্দু সাপ্তাহিক পত্রিকা

প্রকাশ করেন। এই পত্রিকাটির ব্রিটিশ-বিরোধিতা শাসককুলকে ভীত ও বিচলিত করে তুলেছিল। এই উপলক্ষ্যে চৌধুরী দম্পতিকে নানা উৎপীড়ন সহ্য করতে হয়েছিল। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত রামভুজ রাজদ্রোহের অভিযোগে ধৃত হয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। কিছুকাল পর এই দণ্ডাদেশ প্রত্যাহার করা হলে পণ্ডিতজী মুক্তি পান। কারাবাসের কালে পণ্ডিত রামভুজের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়, এরপর ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে সমগ্র পাঞ্জাবে সামরিক আইন বলবৎ হয়, এই সময় মহাত্মা গান্ধী লাহোরে আসেন। লাহোরে গান্ধীজী ছিলেন সরলা দেবীর অতিথি ; তাঁর বাড়ীই ছিল গান্ধীজীর কর্মকেন্দ্র। এই দুঃসময়ে তিনিই ছিলেন গান্ধীজীর পরামর্শদাত্রী। গান্ধীজীর খাদি আন্দোলনের সহায়তার জন্য সরলা দেবীরও আপ্রাণ চেষ্টা ছিল।

পণ্ডিত রাজভুজের মৃত্যুর পর সরলা দেবী কলকাতায় ফিরে আসেন। এর কিছু পূর্ব থেকেই সরলা দেবীর মনে আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি একটি তীব্র আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল, দীর্ঘদিন তিনি হিমালয়ের নিভৃত অঞ্চলে 'বাণপ্রস্থ' অবলম্বন করে বাস করেছিলেন। স্বামীর অসুস্থতার সংবাদে তাঁর শুশ্রূষার প্রয়োজনে তিনি মুসৌরিতে স্বামীর শয্যাপার্শ্বে ফিরে এসেছিলেন।

বিবাহের পর পাঞ্জাবে বাসকালে সমাজসেবা ও স্বাদেশিকতা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে অন্তঃপুরিকা নারীদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারকার্যেও সরলা দেবী লিপ্ত ছিলেন। লাহোরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিতে তিনি প্রথম এ কাজ আরম্ভ করেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে এলাহাবাদে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনকালে সরলা দেবী একটি নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলন আহ্বান করেন। এই সম্মেলনের উদ্যোগেই 'ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডল' নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল বিবিধ উপায়ে অন্তঃপুরিকাদের শিক্ষা ও জ্ঞানদান। সরলা দেবীর উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন স্থানে এর শাখাও প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের বঙ্গীয় শাখাটির পরিচালিকা ছিলেন কৃষ্ণভাবিনী দাসী। এঁর মৃত্যুর পর কবি প্রিয়ম্বদা দেবী এর সম্পাদিকা ছিলেন। কলিকাতা প্রত্যাবর্তনের কিছুদিন পর স্বয়ং সরলা দেবী এই প্রতিষ্ঠানের ভার গ্রহণ করেন। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে বয়স্কা মহিলাদের প্রবেশিকা পর্যন্ত শিক্ষাদানের নিমিত্ত 'ভারত-স্ত্রী-শিক্ষা-সদন' নামে একটি শিক্ষায়তনও তিনি প্রতিষ্ঠা করেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দৌহিত্রী সরলা দেবীর পক্ষে অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসা ছিল সহজাত। বাল্যকালে শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের ভাবধারার প্রতিও তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। বিবেকানন্দের স্নেহ ও সান্নিধ্যলাভও তাঁর জীবনে ঘটেছিল। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে কর্মজীবন থেকে অবসর নিয়ে

সরলা দেবী সম্পূর্ণভাবে গীতা-উপনিষদের আলোকে অধ্যাত্ম-সাধনায় নিমগ্ন হন।

১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের ১৮ই আগষ্ট কলকাতায় সরলা দেবী প্রায় ৭৩ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। সাহিত্য, সঙ্গীত, রাজনীতি ও সমাজ সেবার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, ভগিনী নিবেদিতা, বালগঙ্গাধর তিলক, গোপালকৃষ্ণ গোখলে, লালা লাজপত রায়, গান্ধীজী প্রভৃতির স্নেহ ও প্রীতিধন্যা এই মহীয়সী মহিলার কীর্তি ভারতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হয়ে থাকবে সন্দেহ নেই।